আমাদের সবার আপন

ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন

আমাদের সবার আপন
ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

অরুণা প্রকাশনী : ৭ যুগলকিশোর দাস লেন : কলকাতা ৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ
৫ শ্রাবণ ১৩৭০

প্রকাশিকা
অরুণা বাগচী
অরুণা প্রকাশনী
৭ যুগলকিশোর দাস লেন
কলকাতা ৭০০০০৬
প্রচ্ছদপট
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রাকর
আর. রায়
সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৫১ ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

বেরোচ্ছে তো ঢোলগোবিন্দ-র আত্মদর্শন। আমি তার শুঁড়হীন গোবরগণেশ। শুনে লেখা ছাড়া আমার তো কিছু করার ছিল না। সঙ্গে 'প্রহারেণ' কথাটা না থাকলে রিপোর্টার ভেবে নিয়ে নিজেকে সঞ্জয়ও বলতে পারতাম। লেখায় যা ভুলচুক হয়েছে, তার সবটাই যে আমার খাটো কানের শোনার ভুল—এটা ঢোলগোবিন্দ বললেও বিশ্বাস করবেন না। ইদানিং লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, ওর কিছু মনে থাকে না। কেবলি ভুলে ভুলে যায়। আর উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপায়। মাঝের থেকে পাঠকদের কাছে আমাকে হতে হয় অপদস্থের একশেষ। নামের ভুল, সময়ের ভুল : এই নেই, সেই নেই ; ছি-ছি-ছি ! রাম-রাম !

চালাকি থাক। কিছু কথা না বললেই নয়।

ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকম।

আমি যতই খোকা সাজি না কেন, আমার বয়সের যে গাছপাথর থাকছে না—এটা নিশ্চয়ই কেউ কেউ লক্ষ্য করছিলেন।

যেমন, সাগরময় ঘোষ। থাকতে না পেরে সাগরবাবু একদিন দুম ক'রে বলেই বসলেন—আমার আত্মস্মৃতিমূলক একটা বড় লেখা ওঁর চাই।

লোকে উপরোধে ঢেঁকি গেলে। আর এ তো তাও নিজেকে নিয়ে লেখা। সুতরাং রাজী না হয়ে পারি ?

কিন্তু হলে হবে কি, কিছুতেই মন মানছে না। লিখব কী, নিজেকে কেবলি এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছি।

এই সময় রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত 'চতুরঙ্গে'র ভার নিয়েছেন। একদিন ফোনে বললেন, আত্মজীবনামূলক একটা ধারাবাহিক লেখা চাই। ওঁকে বললাম এক জায়গায় আগে কথা দিয়ে ফেলেছি। ততদিনে হঠাৎ মাথায় এসেছে 'চিঠির দর্পণ'। ব'লে দেখলাম তাতে উনি অরাজী নন।

পরে অবশ্য রবিবাবুর কথাই থাকল। 'চিঠির দর্পণ' চালান গেল 'দেশে'। 'চতুরঙ্গ' চাপ না দিলে এ লেখায় কোনোদিনই হয়ত হাত দেওয়া হত না।

নওগাঁয় শুরু নওগাঁতেই শেষ। কলকাতায় আসব আসব করছি।

একটু ফাঁক পেলেই এর পরের আবার খেই ধরব।

এখানেও একটা কথা আছে।

'ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন'-এর যে ছিল সবচেয়ে মনোযোগী পাঠক, পুত্রপ্রতিম আমার পুন্‌পুন্‌, সেই ভাইপো ঠিক এক বছর আগে আমাকে চিরদিনের মতো ছেড়ে চলে গেছে। পুন্‌পুন্‌ থাকলে ও হয়ত ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে আমাকে আরও লেখাত।

এ বইটা পুন্‌পুনের একমাত্র ছেলে বাবি-কে দিচ্ছি। ও এ-বাড়ির তৃতীয় পুরুষ।

ও বড় হতে হতে আমি যদি টেঁসে না যাই, তাহলে হয়ত ওর ঠেলাতেই পরের পর্বে আমার হাত পড়বে।

এখন এই পর্যন্ত।

১

কিছুটা তুলনামূলক

সোহেল এসেছিল। সোহেল চলে গেছে।

তার সঙ্গে 'ঢোলগোবিন্দ-র আত্মদর্শনে'র কী সম্পর্ক? রসুন, এখুনি তা জানতে পারবেন।

একই দেশে বাড়ি। ওর কুষ্টিয়ায়। আমার নদীয়ায়। মানে, নদীয়ার যেদিকটা কাটা পড়ে গিয়ে এখন কুষ্টিয়া হয়ে গেছে—তার দোরগোড়ায়। জাতে ও মুসলমান। না, সৈয়দ-টৈয়দ নয়। আমি হিঁদুর ছেলে। ভঙ্গ কুলীন বংশ।

ওর পাসপোর্ট বাংলাদেশের। আমারটা ভারতীয়। ও থাকে বাগদাদে। আমি কলকাতায়। ও আমার হাঁটুর বয়সী।

সোহেল ঝড়ের মতো এসে ঝড়ের মতো চলে গেছে।

ও যে এখন ঠিক কোথায় আছে তা জানা যাচ্ছে না। গীতা ওর শেষ চিঠি পেয়েছিল ব্যাঙ্কক থেকে। সেখানে কোনোও মেয়ের পাল্লায় কিংবা কোনো মেয়ে ওর পাল্লায় পড়ে থাকতে পারে।

এখানে যারা ওর এক-গেলাসের ইয়ার, তারা টেলেক্স টেলিগ্রাম চিঠি দিয়েও ওর কোনো হদিশ এখনও পায় নি।

এক উঠতি তরুণী ওর দেওয়া পোস্টবক্স নম্বরে চিঠি পাঠিয়েছিল। কী লিখেছিল ভগবান জানেন। তবে এক সমব্যবসায়ীর কাছ থেকে ভারি মিষ্টি একটা উত্তর এসেছে।

তিনি লিখেছেন, মাস কয়েক হল ঐ পোস্টবক্স নম্বরের মালিকানা তাঁর। নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে লেখা আরও কয়েকটা নীল খাম তাঁর হস্তগত হয়েছে। অন্য একজনকে লেখা হলেও, চিঠিগুলোতে যে আবেগ-অনুভূতি

প্রকাশ পেয়েছে, তা পড়ে, তিনি সমবেদনা না জানিয়ে পারেন নি। তার চেয়েও বড় কথা, চিঠিগুলোতে এমন হিম্মত ছিল যে, তাঁর মতো লোকের পাষাণহৃদয়ও গলাতে পেরেছে।

অথচ এই লেখার জন্যেই সোহেলকে আমার দরকার ছিল।

এটা হল 'তুলনামূলক'-এর যুগ।

ইতিহাসে, ধর্মতত্ত্বে, ভাষাতত্ত্বে তো বটেই, সাহিত্যেও 'তুলনামূলক' এখন খুব চলছে।

আত্মজীবনীতেও আমি এর প্রবর্তন করতে চেয়েছিলাম।

আমার দরকার ছিল এমন একজনকে যার ফেব্রুয়ারিতে জন্ম। না হলেও যে চলত না এমন নয়।

এমন সময় বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতোই কলকাতায় হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল সোহেল।

যেদিন জানতে পারলাম ফেব্রুয়ারিতে ওর জন্ম, সেদিন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। তার আরেকটা কারণ, 'ঢোলগোবিন্দ-র আত্মদর্শন' লিখব বলে ইতিমধ্যেই আমি বরাত নিয়ে ফেলেছি। পেছোবার তেমন উপায় থাকছিল না। লিখে দিন-আনি দিন-খাই করে যাদের চালাতে হয় তাদের এ যে কী ঝকমারি অন্য কাউকে তা বলে বোঝানো যাবে না।

ওকে দেখি, আর নিজের সঙ্গে তুলনা করতে থাকি।

শুনলাম একসময়ে ও নাকি কবিতা লিখত। খুবই সম্ভব। প্রথমত বাঙালি। দ্বিতীয়ত কলকাতায় এসেই ও প্রথম খুঁজে বার করে শক্তির বাড়ি। সেখানে গিয়ে পড়ার ফলেই ওর সঙ্গে আমার আলাপ।

পড়াশুনো করেছে কষ্ট করে। চানাচুর চিনেবাদাম ফেরি করা থেকে শুরু করে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে হেয়ার-ডাই বিক্রি—সব রকমই তাকে করতে হয়েছে। তাতে লাভ হয়েছে এই যে, ওর জিভের আড় ভেঙেছে। কিন্তু হলে হবে কী, বানানে খুব কাঁচা থেকে গেছে।

ওর ফেব্রুয়ারিতে জন্মের ব্যাপারটাতে গোড়ায় আমার একটু সন্দেহ দেখা দেয়, যখন শুনলাম ও কবিতা লিখত। মনে হয়েছিল, ফেব্রুয়ারির কথাটা আমাকে ও খুশি করার জন্যে বলে নি তো? পরে যখন শুনলাম সোহেল এখন আর কবিতা লেখে না তখন আমার ধড়ে প্রাণ এল।

ওর কবিতা লেখা ছাড়ার কারণটাও আমার খুব বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। ও বলেছিল, 'কবিতা লিখে পেট ভরে না। তাই ওসব ছেড়ে টাকা করার লাইনে চলে গেলাম।'

তখন থেকেই আমার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে আমি ওকে দেখতে শুরু করে দিলাম।

কিন্তু এমনি আমার কপাল, ও আমাকে তার সময়ই দিল না। একদিন হুট করে চলে গেল সিঙ্গাপুর।

যাবার সময় যার যার জন্যে যা যা জিনিস ও রেখে গেল, তার মধ্যে ছিল আমার জন্যে একটা দামি সিল্কের পাঞ্জাবি। আরও একটা জিনিস আমার জন্যে সোহেল রেখে গিয়েছিল। গীতা ক'দিন পরে আমার হাতে দেয়।

ডেল্-এর একটা ছোট্ট ইংরিজি পার্স্‌বুক—'অ্যাকোয়ারিয়াস: রাশিফল'।

বইটার জন্যে সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ। কেননা সবার চোখের সামনে এই বই দোকান থেকে আমার নিজের জন্যে কেনার কোনোদিন দুঃসাহস হত না।

তাও কী? শুধু এপ্রিল থেকে জুন—এই ক-মাসের প্রাত্যহিক ভবিষ্যৎবাণী।

বইটার মলাটে যেন ড্যাব-ড্যাব করে তাকিয়ে আছে দুটি শব্দ: 'আপনার বসন্ত'। এই বয়েসে? মরণ আর কী বলে না!

ওর নামের নিচে তারিখ দেখে বুঝলাম কলকাতায় আসার আগেই নিজের জন্যে কোনো এয়ারপোর্টে বইটা ও কিনেছিল। ওরও অ্যাকো-

য়ারিয়াস। কুম্ভরাশি। ফেব্রুয়ারিতে জন্ম। না, সোহেল ঠকায় নি।

সোহেল আমার হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় এবং হাতের কাছে আর কাউকে না পাওয়ায়, ওর পরিত্যক্ত বইটা দিয়েই আমার আত্ম দর্শনের সূত্রপাত করে অগত্যা দুধের স্বাদ আমাকে ঘোলে মেটাতে হবে।

রাশিফলে জাতকের যেসব সদ্‌গুণ দেখছি, তাতে যে-কারো চোখ ট্যারা হওয়ার কথা। মগজ খুব উর্বর। সেটা বোঝাই যায়। অমায়িক, দিলদরাজ, আত্মবিশ্বাসী এবং আর কারো মতন নয়। যেটা মনে করে সেটা করে ছাড়ে। বুদ্ধি ধারালো। অনেক কিছু কল্পনা করে নিতে পারে। খুব একটা আবেগবশে চলে না। কারো দিকে টেনে কথা বলে না। কাছের লোকদের তাতে অস্বস্তি হয়। হৃদয়ের বদলে ওর মনটাই বেশি কাজ করে। রুচি মার্জিত। কিন্তু নিজের ওপর বেশি ভরসা করতে গিয়ে এবং একগুঁয়েমির জন্যে মুশকিলেও পড়ে। অবশ্য এর লাভের দিকও আছে—সাফল্য, ক্ষমতা আর সিদ্ধিলাভ হয়। আদর্শের তাড়নায় পরের ভালো করে বেড়ানো, নিঃস্বার্থভাবে সবাইকে ভালোবাসা, শিল্পের দিকে টান, সৃষ্টির ক্ষমতা, পৃথিবীর ওপর মমতা। কোন্ সদ্‌গুণটা ওর নেই?

পঞ্চভূতের মধ্যে কুম্ভজাতকের ভাগে পড়েছে মরুৎ। ফলে, মানস-জগতে বিচরণ। জীবনে ভাবের আদানপ্রদান, তালিম আর এলেম আহরণের দিকটাই বড়। মরুৎচিহ্নের দরুন মানুষজনদের সঙ্গে ও বড় বেশি জড়িয়ে পড়ে। সামাজিক আর ব্যস্ততার জগৎ ওর। ওর মতো লোক জীবনে কেষ্টবিষ্টু হয়। ওর মধ্যে কোনো ধোঁয়াটে ভাব নেই। বাজে কথা বলে না, ফলে অনেক সময় ওর মুখ দিয়ে অপ্রিয় সত্য বেরিয়ে যায়।

যা নেই তা বার করার, সামনের দিকে চাইবার ওর মানসিক ক্ষমতা আছে। বাধা ভাঙতে, পিছুটান কাটাতে এবং নতুন স্রোতে গা ভাসাতে ভালোবাসে। নতুন কথা ভাবতে ওর ভয় নেই, দুম করে বলতেও ছাড়ে না। লোকে সেটা ঠিক নিতে পারে না। কথা শুনে মনে করে, ওর

একটু দেমাক বেশি। পেশাগত কাজের দিকে টান। ভালোমন্দ খাওয়া, ভালো থাকা, মাঞ্জা দিয়ে চলার দিকে ঝোঁক। চিন্তায় সবার আগে; সামাজিকভাবে, যেদিকে স্রোত সেইদিকে। একটু ভাসাভাসা ওপরসা ভাব; মনঃসংযোগের একটু অভাব। ধারণাশক্তি চমৎকার, তবে লক্ষ্য-ভ্রষ্টের মাত্রাটা বেশি। ভেতরটা এই-ফাটে এই-ফাটে, সামলাতে না পারলেই বিপদ।

বাড়ন্ত কোম্পানির লাগসই এগজিকিউটিভ হতে পারে। অন্যদের সঙ্গে নিয়ে চলা, বলা-কওয়া, পটানোর ক্ষমতা—সবই আছে। দরকার পড়া-লেখা-করা লোকদের সঙ্গ। নইলে সারাদিন যদি চেয়ারে বসে কেবল চার্ট, সংখ্যা আর যোগবিয়োগের খুঁটিনাটিতে ফেঁসে থাকতে হয় তাহলেই তো চিত্তির!

দশজনের মধ্যে একজন হওয়া, হাতে মাথা কাটার ক্ষমতা থাকা—এসব সে চায় এবং চেষ্টা করলে পায়। অনেকগুলো নিশানা মেধার স্তরে থাকলেও, হাতেনাতেও অল্পবিস্তর চাই। গাড়িবাড়ি এইসব। লোকে যাতে তাকিয়ে দেখে। সেটা হস্তগত করার ওর জারিজুরিও আছে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে ও কত বড় না মানবপ্রেমিক। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, পরের বেলায়ও দাঁতকপাটি, তবে নিজের বেলায় অবশ্যই আঁটিশুঁটি আপ্‌ভালা তো জগৎ ভালা—কথাটা ও এই অর্থেই বুঝে নিয়েছে।

ওর গোপন সম্বল বলতে একটা আছে খুঁটিয়ে দেখে ভালোমন্দ বাছার ক্ষমতা। এর জোরে অন্যদের ও মেরে দিতে পারে। যত শক্তই হোক আদাজল খেয়ে লেগে সে কার্যোদ্ধার করতে পারে। সেইসঙ্গে পারে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে। আর পারে মনটাকে সজাগ রেখে দিলদরাজ হতে।

লাল আর নীলে মেশানো বেগুনি হল ওর যথোপযুক্ত রঙ। একই সঙ্গে চনমনে আর ভাবুক। উষ্ণ আর শীতল। নীল দিকটা মাথা ঠাণ্ডা রাখবে, লালের দিকে রক্ত টগবগ করে ফুটবে।

•

ওর দরকার অ্যামেথিস্ট। জামীরা বা রাজাবর্ত মণি। তাতে কপাল খুলবে। ধ্যানস্থ হতে পারবে। সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখবে।

চারপাশে অনেক লেখাপড়াজানা লোক থাকবে, তবে ওর ভালো লাগবে। গতানুগতিকে ওর মন ওঠে না। ভুতুড়ে বাড়ির ওপর ওর টান। ভবঘুরে হয়ে দুনিয়া দেখে-বেড়ানোর ওর খুব শখ।

মুখেন মারিতং জগৎ। সদর্থে ওর সম্পর্কে একথাটা খাটে। ধারালো কথার জন্যে বন্ধুমহলে ওর খুব খাতির। অবসর সময়েও বড় কিছু তাল করে ঘোরে। কিছুটা অসম্ভবের পেছনে।

মাথায় আইডিয়া গজগজ করছে। কুম্ভরাশির জাতকেরা পৃথিবী আর মানুষকে ভালোবাসে। হরবখত বলে, মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। সজ্ঞানে কাউকে কষ্ট দেয় না। যারা সবার-নিচে সবার-পিছে —তাদের সঙ্গে থাকতে চায়। বিপদ এলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, নিজের কথা ভাবে না। তালগোল পাকালে ভালোই লাগে যদি তার কাটান থাকে।

যাবার জন্যে এক পা বাড়িয়েই আছে, অথচ বেরোবার কথা উঠলে সব সময় পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ। সঙ্গে কী নেবে না নেবে সাব্যস্ত করতে পারে না। আর ঠিক যেটা দরকার সেটাই নিয়ে যেতে ভুলে যাবে। অবচেতনায় ইচ্ছে করেই ভোলে। যাতে বিদেশ-বিভুঁইতে জিনিস কেনার ছুতোয় বাজারহাট চষে ফেলতে পারে। আর পরে ফিরে এসে যাতে লোকজনের কাছে গল্পগাছা করতে পারে—এই দেখেছি সেই দেখেছি। দূরপাল্লার ভ্রমণটা হয়ে ওঠে ফিরে এসে ওর আড্ডা জমানোর একটা ভালো ফিকির।

ওর আছে ফটো-তোলার শখ। আর নিসর্গপ্রেম। দুটোকে এক করতে পারলে বাড়তি দু পয়সা ঘরে আসতে পারে। মজা করে কথা বলতে পারা, যখনকারটা ঠিক তক্ষুনি বলা আর কথা বেচে খাওয়ার ব্যাপার—এসবে ওর জুড়ি নেই। একটা ফলপ্রদ কিছু ভেবে বার করা, তারপর বিষয়টা নিয়ে একটু তত্ত্বতালাশ করা—ব্যস, তারপর দুর্গা বলে ঝুলে পড়া। তাহলে কেউ আর ঠেকাতে পারবে না।

যা সুন্দর, যা মামুলি নয়—সেইসব জিনিসে ওর ঝোঁক। টাকার ওপর ওর অত টান নেই। টাকা যেসব জিনিস পাইয়ে দেয় তার প্রতিই ওর সমস্ত নজর। আর কিভাবে কিভাবে যেন টাকা ওর হাতে ঠিক এসে যায়। লোকজনদের খাওয়াতে ও ভালোবাসে। জীবনের সেরা জিনিস-গুলোই ওর প্রিয়। দরকার হলে অন্য দিকের অনেক খরচ বাঁচাতে কসুর করে না।

কুম্ভরাশির জাতক রুজিরোজগার করে নিজের মনের মতো কাজ করে। স্বাধীনতার পোকা মাথায় নড়ার দরুন সে ফ্রী-লান্স বা ঠিকেয় লেখার কাজ নেয়। অন্যদিকে আদর্শের ভূত ঘাড়ে চেপে থাকে বলে রাজনীতি, সমাজসেবা, লোকশিক্ষা—এসব দিকেও ঝোঁকে। অনেকে বিজ্ঞান, কারিগরি, ইলেকট্রনিক, ইনজিনিয়ারিং, উদ্ভাবনা—এসব লাইনেও যায়। কুম্ভরাশির জাতকদের সবচেয়ে বড় মুশকিল এই যে, এরা প্রচণ্ড রকমের পরমত-অসহিষ্ণু। এদের একটু সরে বসো বলার জো নেই।

বইটাতে এ ছাড়াও আত্মীয়বন্ধু স্ত্রীপুত্রপরিবার নিয়েও অনেক কথা আছে। জ্যোতিষবিদ্যায় গণ্ডমূর্খ হওয়ায় তাতে আমার দন্তস্ফুট করার ক্ষমতা হয় নি।

আর যে গুরুত্বপূর্ণ একটা পরিচ্ছেদ আছে, তাতে রয়েছে এ বছরের বসন্ত ঋতুতে কুম্ভরাশির জাতকের এক রোজের-রোজ ভবিষ্যদ্বাণী।

যখন বইটা হাতে পেলাম তখন বসন্ত বিগত।

ফলে, আমার ভাগ্যে বিলম্বে হতাশ হওয়ার ব্যাপার। তাই ঐ পৃষ্ঠাগুলো চোখ বুলিয়ে দেখারও আমার ইচ্ছে হয় নি।

'ঢোলগোবিন্দ-র আত্মদর্শন' এই বলে শুরু করে দিলাম। তারপর সোহেল এলে—আমি নই, ওই বরং আমার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেখে নিয়ে আমার অসমাপ্ত তুলনামূলক আত্মজীবনী লেখার কাজটা ও নিজের ঘাড়ে তুলে নেবে।

২

একটি দেঁতো কাহিনী

স্পষ্ট মনে আছে। স্থান : কৃষ্ণনগর। মা-র পেট থেকে আমি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এসেছিলাম।

ভাগ্যিস !

নইলে জীবনভর এমন একটানা হাসা যেত না। ওঁরা আর আমি একই দিনে জন্মালেও—লিঙ্কনের কথা জানতেন লিঙ্কন, ডারউইনের কথা ডারউইন। ক্ষ্যামা দিন। আর আমি তুলনামূলক-এর লাইনে নেই। সোহেল আমাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে গেছে।

গোবিন্দ আমার ঠাকুরর্দার দেওয়া নাম। ঢোল জুড়ে ওটাকে আমি টেনে বড় করে আরেকটু নিজস্ব করে নিয়েছি।

গোড়ায় সবিনয়ে একটা কথা জানিয়ে রাখি। বেশি জেরা করবেন না। টাকা নিয়ে সজ্ঞানে মিথ্যে সাক্ষী দেব, তেমন লোক আমি নই। মনে রাখবেন, আমার কুম্ভরাশি।

তবে উলটোপালটা, তা একটু হবেই।

তার কারণ আছে। বছর বারো বয়সে আমি একবার যাই-যাই হয়েছিলাম। টাইফয়েডে। সেই এক ধাক্কায় তিনটে জিনিস আমি হারাই। গানের গলা। চোখের নজর। আর স্মৃতিশক্তি।

একটা দাঁত নেই। একটা কান গেছে। সেসব তো অনেক পরে।

এই দেখুন, পরের কথা আগে এসে গেল। এসেছেই যখন সেরে নেওয়া ভালো। নইলে পরে আবার মনে পড়বে কি না পড়বে।

আমার এক বন্ধুর বোন। না, তার সঙ্গে আমার কোনোরকম লটঘট ছিল না। একেবারে খাঁটি নির্জলা বন্ধুর বোন। আমরা তখন মার্কসবাদ

পড়ছি। বেবী আমি দেবী গীতা। মাথার ওপর তখন সারা দুনিয়া বদলাবার ভার। প্রাণ হাতে করে নিয়ে চলতে হবে। হৃদয় যতই কাঁদুক। হাত জোড়া।

তা ছাড়া আমার এমন শখ হয় নি যে, বামন হয়ে চাঁদে হাত দেব। যাদের সঙ্গে ওঠাবসা করি তারা ফ্যালনা লোক নয়। কলকাতায় তাদের অনেকেরই বাড়ি আছে, গাড়ি আছে। নিদেনপক্ষে আছে টাকা। হগ-মার্কেটে বাজার করে। চাঙ-ওয়া কোন্ ছার। ব্রিস্টল তো বটেই, গ্র্যাণ্ডও তাদের মুঠোর মধ্যে।

তো একদিন আমরা হাওয়া খেতে গিয়েছি বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের ময়দানে। বন্ধুর সেই বোন গেছে আমাদের ল্যাজ হয়ে। এক ডেঁপো ছোকরা সাইকেলে করে এসে মেয়েটির গা ঘেঁষে বার দুই চক্কর দিয়ে গেল। তৃতীয়বার আসতেই মেয়েটির দাদা খপ করে ধরে ফেলল তার সাইকেলের হ্যাণ্ডেল। সেইসঙ্গে একটা হ্যাঁচকা টান। ছেলেটা ছিটকে পড়তেই শিস দিতে দিতে ময়দান থেকে উঠে এল একদল তেএঁটে ছোঁড়া। ওদেরই একজনের পেল্লায় রকমের ঘুষিতে আমার ঠোঁট ফুটো করে বেরিয়ে এল একটা দাঁত। সেই দাঁতটার কথাই বলছিলাম।

ব্যাপারটা এমন গুরুতর হবে কেউ ভাবে নি।

খেলাধুলো করলেও, এমনকি বক্সিং শিখলেও—মারপিট করার কখনই আমার খুব একটা অভ্যেস ছিল না।

এই প্রসঙ্গে আরও ছোটবেলার কয়েকটা কথা মনে পড়ে গেল। আমার তো মনে হয়, আমার স্মৃতিশক্তির যা হাল—তাতে যখন যেটা মনে পড়বে তখন তখন সেটা বলে দেওয়াই ভালো। ফেলে রাখলে হয়ত আর কাগজে কলমে তুলতে মনে থাকবে না।

হুমায়ুন কবিরের বাবা তখন নওগাঁয়। আমার জ্ঞান হওয়ার বয়সটা নওগাঁতেই কেটেছে। যতদূর মনে পড়ে, উনি খুব একটা ভয় পাওয়ার মতো লোক ছিলেন না। একতলায় সামনের ঘরে বসত ওঁর দরবার।

উনি তখন ছিলেন বোধহয় কো-অপারেটিভ রেজিস্ট্রার। চারদিকে বিরাট বাগানসুদ্ধ ছিল ওঁদের লাল ইটের বাড়ি।

শাজাহানদা ছিলেন কম-কথার মানুষ। পেছনদিকে একতলায় একপাশে ছিল তাঁর ঘর। জাহাঙ্গীরদা দিতেন ছোটদের পড়বার মতো বাংলা বই। ফিরোজ ছিল আমার ছেলেবেলার হলায়-গলায় বন্ধু। হুমায়ুনদাকে কম দেখেছি। ইস্কুল থেকে পাশ করে কলকাতায় পড়তে চলে গিয়েছিলেন।

একবারের কথা মনে আছে। হুমায়ুনদা এসেছিলেন বোধহয় কোনো ছুটিতে। একটা সরকারি পুকুর ঘিরে ছিল আমাদের চত্বর। পুকুরের পুবে একসাইজ সুপারিনটেনডেন্টের পুকুরঅলা দোতলা লাল ইটের বাড়ি। একসময়ে সেখানে ছিলেন মবিনউদ্দিন সাহেব। বাবার হিন্দু বন্ধুমহলে অনেকেই সাম্প্রদায়িক বলে তাঁকে দেখতে পারতেন না। বাবাও তাঁর ওপর চটা ছিলেন। বলতেন, পাতি নেড়ে কিন্তু অসম্ভব সৎ; ফলে, সে আঁচ আমাদের গায়েও কিছুটা লেগেছিল।

নওগাঁ ছেড়ে আসার পঁচিশ-তিরিশ বছর পর—ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বসে হঠাৎ একদিন মবিনউদ্দিন সাহেবের ওপর শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে উঠল। পড়তে পড়তে হঠাৎ জানলাম উনি নাকি বাংলা ভাষায় কোরান অনুবাদ করেছিলেন। ছেলেবেলায় সে কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি নি। আমার মনে হয়, বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে কোনোরকম ধর্মীয় ভাব বাঙালি হিন্দুদের বরদাস্ত হত না। হয়তো সেইজন্যেই সাম্প্রদায়িক বলে মবিনউদ্দিন সাহেবের তারা বদনাম করত। কিংবা তাঁরও হয়ত পরধর্মের ব্যাপারে অসহিষ্ণুতা ছিল।

কবির সাহেবদের বাড়িটা ছিল পুকুরের দক্ষিণে। আমাদেরটা পশ্চিমে। তিন-কামরাওয়ালা একতলা কোয়ার্টার। বাইরের ঘরের বারান্দা থেকে কবির সাহেবদের বাড়ির উত্তরের গেট, পুকুরের ঘাট—সব দেখা যেত।

কে-ডি ইস্কুলের হেডমাস্টার মশাই মাঝেমাঝে গল্প করতে বাবার

কাছে আসতেন। তাঁর গায়ে থাকত একটা চাপকান। খুব কড়া লোক। আর বেশ রাশভারি। হঠাৎ একটা হুঙ্কার শুনে জানলায় যেতেই দেখি —ফুটবলের পোশাক পরে একদল ছোকরা ঘাটের পৈঁঠে ছেড়ে হুড়মুড় করে পালাচ্ছে। ঘাটের সিঁড়ির ওপর ছাড়া বেশ খানিকটা ধোঁয়া। পালাবার সেই দঙ্গলে দেখি হুমায়ুনদা। ধোঁয়াটা যে সিগারেটের তা তখনই বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু হুমায়ুনদা তখন আর ইস্কুলের ছাত্র নন। ভালো ছাত্র হিসেবে সারা বাংলায় তখন তাঁর নাম। হেডমাস্টার মশাই-য়ের ভয়ে তাঁকেও ছুটে পালাতে দেখে আমার সেদিন কী যে মজা লেগেছিল বলার নয়।

সন্ধে হলেই লণ্ঠন হাতে লোক পাঠিয়ে হুমায়ুনদার মা আমাকে আর দাদাকে ডেকে নিয়ে যেতেন। আর থাকত ফিরোজ। আমাদের নিয়ে বসত ওঁর গল্পের আসর। কিসের গল্প বলতেন সে আর এখন মনে নেই। তবে এইটুকু মনে আছে যে, মাঝে-মাঝে লণ্ঠনের আলোয় পুকুরপাড়ের রাস্তা দিয়ে আসতে গা ছমছম করত।

অবশ্য আমাদের হিরো বলতে ছিলেন আকবরদা। আকবরদার ছিল দুটো গুণ। ছোটদের খুব কাছে টানতে পারতেন। আস্তে আস্তে তাঁর আওতায় আমাদের বড় একটা দল দাঁড়িয়ে গেল। না ধমকে, দাদাগিরি না ফলিয়ে মিষ্টি কথায় ছোটদের হাতে রাখার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। আকবরদা আমাদের সেনাপতি। যা বলতেন তাই আমরা শুনতাম। তাঁর অধীনে আমাদের নিয়মানুবর্তিতাটা ছিল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। তাতে গায়ের জোরের কোনো ব্যাপারই ছিল না।

গোড়ায় শুরু হয় খেলাধুলো দিয়ে। তারপর ড্রিল। এরপর রুটমার্চ। কুচকাওয়াজ। কী নয়।

এমনিভাবে তৈরি হয়ে গেল আমাদের পলটন। তার মাথার ওপর আকবরদা। আমাদের সেনাপতি।

ততদিনে পাড়ার ছেলেরা সবাই জুটে গেছে আমাদের পলটনে। শীত পড়ে যাওয়ায় সুবিধেই হল। মাঠে আর তখন বল পড়ছে না। ক্রিকেটের

তখন চলনই হয় নি। মফস্বল শহর তো। ওসব জায়গায় এমন-কি ভলিবল বাসকেটবলও তখন গিয়ে পৌঁছয় নি। ডাংগুলিও খুব একটা দেখেছি বলে মনে পড়ে না। থাকার মধ্যে ছিল ক্বচিৎ কোথাও গাদি আর চু-কিৎকিৎ। আমরা অবশ্য সারা বছরই ছুটির দুপুরে মারবেল আর শীতের দিনে লাট্টু খেলে বেড়াতাম।

সুতরাং আমাদের পলটন বেশ জমে গেল।

আমরা সব সোলজার। তলোয়ার বলে আমাদের হাতে একটা করে বাখারি ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেটাকেই ঘাড়ে নিয়ে আমরা মহাউৎসাহে লেফট-রাইট-লেফট করে চলেছি।

আকবরদা ইতিমধ্যে একটা খাঁকির ইউনিফরম করিয়ে নিয়েছেন। আকবরদাকে মানিয়েছেও বেশ। আমাদের একটাই শুধু খুঁত-খুঁতুনি। খাঁকির ঐ উর্দির সঙ্গে বাঁশের ঐ বাখারিটা যেন কেমন মানাচ্ছে না।

তলে-তলে আকবরদা যে সে-ব্যবস্থাও করে রেখেছেন আমরা কেউ জানতাম না।

পলটনের সবাইকে একদিন চিঠি দিয়ে ডাক করিয়ে এনে উঠোনে দাঁড়িয়ে আকবরদা মিলিটারি কেতায় একটা পারসেল খুললেন। তা থেকে বেরিয়ে এল খাপসুদ্ধ একটা ঝকঝকে তলোয়ার। খেলনার হলেও জিনিসটা ছিল জব্বর।

এর মধ্যে একটা কাণ্ড হয়েছিল বলা হয় নি।

পুবের বাড়িতে নতুন-আসা এক হিংসুটের পাল্লায় পড়ে আমাদের পলটন দুভাগ হয়ে গিয়েছিল। উত্তরের বড়-বাড়ির ছোট আলমগীর কোন্ দলে ছিল আমার মনে নেই। ও ছিল আমার চেয়েও খুব নিরীহ গোবেচারা।

যুদ্ধং দেহি বলে আকবরদা তাঁর এক দূত মারফত চিঠি পাঠিয়ে দিলেন পুবের বাড়িতে। ওরাও সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিল—পরের দিন বেলা তিনটেয় কাম অন ফাইট।

এখনও মনে আছে, বাপ রে বাপ! কী যুদ্ধ! বাখারিতে বাখারিতে

ঠকাস-ঠক ঠকাস-ঠক।

লড়তে লড়তে পা ফসকে উঁচু থেকে নিচু পাড়ে আমি পড়ে গিয়েছিলাম। প্রতিপক্ষ সুযোগ পেয়ে আমাকে যা পেটান পিটিয়েছিল বলার নয়। যখন উঠতে যাচ্ছি একজন ধম্‌কে বলল—ওসব চলবে না, তুমি মরে গেছ। আমি মরে গেলাম।

কিন্তু জীবনে তুটো বিষয়ে সেদিন আমার শিক্ষা হল।

প্রথমত, আমি মরলেও আমাদের দল কিন্তু জিততে পারে। লড়াই থেমে যাওয়ার পর আমি জানতে পারলাম যে যুদ্ধে আমাদের পলটনেরই জয় হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, জীবনে এই প্রথম দস্তুরমত মালুম হল মার খেলে ভীষণ লাগে।

ছেলেবয়সে আমাকে যে বক্সিং শেখা ছাড়তে হয়েছিল সেও কিন্তু এই মার খেয়েই।

তবে একটা সুখস্মৃতিও ছেলেবেলায় আমার এই বক্সিং শেখার সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

আমি তখন মধ্য কলকাতা ছেড়ে এসে দক্ষিণ কলকাতার সত্যভামা ইস্কুলে সবে ভরতি হয়েছি। টালিগঞ্জ থানার পাশের গলিতে থাকতাম।

আমাদের ছেলেবেলার সেই সময়টায় বোধহয় বিপ্লবীদের প্রেরণায় শরীরচর্চার দিকে ছিল খুব ঝোঁক। নওগাঁয় কালীবাড়িতে শেখানো হত লাঠিখেলা, ছোরাখেলা। আমিও কিছুদিন শিখেছি। তামেচা-বাহেরা-শির। ব্যস, তার বেশি আর মনে নেই।

কিন্তু যিনি শিখিয়েছিলেন তাঁকে মনে আছে। বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা। বয়স খুব কম। শুনলাম টোলে এসেছেন পড়ানোর কাজ নিয়ে। দেখলে টুলো পণ্ডিত কে বলবে!

টোল ছিল আমাদের কোয়ার্টারের পেছনে যে নালা, সেটা পেরিয়ে ফুটবল মাঠের পশ্চিমে। শুক্‌নোর দিনে নালাটা দিব্যি হেঁটে পেরিয়ে

আসা যেত।

নালাটা পেরিয়ে ডান হাতে ছিল পলানদের টিনের বাড়ি। বয়সে আমার চেয়ে একটু বড়। পলান ছিল গোঁয়ারের একশেষ।

দুদিন পরে দেখি হোস্টেলের ছেলেদের সঙ্গে টোলের সেই ছোকরা পণ্ডিত হেঁটে নালা পেরিয়ে আমাদের ঘাটে এসেছেন স্নান করতে। তখনও আমার সাঁতারের জ্ঞান ঘাটের পৈঠে ধরে জলে পা ছোঁড়ার বেশি নয়। টুলো পণ্ডিতমশাই এসেই আমাকে ধরলেন। বললেন, তুমি আমার কোমর ধরো, চলো তোমাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।

ডাঙা ছেড়ে দূরে যাওয়ার সে কী রোমাঞ্চ! আজও মনে পড়ে। পুকুরের মাঝবরাবর গিয়েছি। হঠাৎ সেই শয়তান লোকটা আমাকে ছেড়ে দিল। আমি ডুবে যাব। প্রাণপণে চেষ্টা করছি বাঁচতে। একবার যদি পাড়ে উঠতে পারি। দেখে নেব। একবার যদি—

কী করে যে পাড়ে পৌঁছুলাম! কেউ আমাকে উদ্ধার করতে এগোয় নি। নিজেই নিজেকে বাঁচালাম। কোনো রকমে জল খেতে-খেতে হাত পা ছুঁড়ে নিজেকে ভাসিয়ে। ঘাটে এসে গোড়ায় গুম হয়ে বসে রইলাম। তারপর আস্তে আস্তে রাগ পড়তে লাগল। সারা শরীরে জেগে উঠল এক অসম্ভব পুলক। আমি পেরেছি। মৃত্যুকে পেরিয়ে আসতে পেরেছি।

শয়তান লোকটা তখন গুটি গুটি করে ঘাটে উঠে এসে আমার দিকে মিটমিট করে তাকিয়ে হাসছে। ব্যস, তারপর থেকেই শুরু হয়ে গেল আমার সাঁতার কাটা।

তরুণ টুলো পণ্ডিতের সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। আসছেন না দেখে দিন কয়েক পরে খোঁজ নিতে গিয়ে শুনি, শেষ রাত্রে একগাড়ি পুলিশ এসে তাঁকে হাতে হাতকড়া দিয়ে ধরে নিয়ে গেছে। চালান দিয়েছে সোজা জেলা সদরে। পণ্ডিত সেজে ছিল। আসলে সাংঘাতিক লোক। গা-ঢাকা-দেওয়া স্বদেশি। ঘরে খানাতল্লাস করে একটা পিস্তলও নাকি পাওয়া গেছে।

বক্সিং শেখার কথা বলছিলাম। সে তার অনেক পরে। চোয়ালে ঘুষির পর ঘুষি খেয়ে যখন ভাবছি—ঢের হয়েছে, আর আমার মার খেয়ে কাজ নেই। ঠিক সেই সময় এক রবিবারে পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনি ইস্কুল-বাড়িতে কী একটা জলসা হচ্ছে। খুব ভিড়।

একটু এগোতেই দেখি একজন তন্ময় হয়ে আড়বাঁশি বাজাচ্ছে। গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা। কেষ্টঠাকুরের মতো কালো কুচকুচে গায়ের রঙ। বাঁশির কী মিষ্টি আওয়াজ। হঠাৎ আমার মনে হল যেন ভূত দেখছি। আরে, আমাদের কালোকোলো বক্সিংয়ের টীচার! তিনি কিনা বাঁশি বাজাচ্ছেন! দেখে সেদিন কী যে গর্ব হয়েছিল বলার নয়।

তবে বুক দশ হাত ফুলে গিয়েছিল আরও পরে। যখন জানলাম বোম্বাইয়ের ভারতবিখ্যাত বংশীবাদক পান্নালাল ঘোষ হচ্ছেন আমাদেরই ইস্কুলের সেই এককালে তিরিশ টাকা মাইনের বক্সিং টীচার পান্নাবাবু।

ইস্কুল ছেড়ে চলে যাওয়ার পর পান্নাবাবুর সঙ্গে আর আমার কখনও দেখা হয় নি।

দাঁতের কথা দিয়ে শুরু করে কোথায় সরে এসেছি।

হ্যাঁ, আমার বন্ধুর বোন। তার সঙ্গদোষে উঠতি মস্তানের হাতে মার খেয়ে আমার একটা দাঁত হারানো।

এদিকে আমাদের সেই বন্ধুর সোনাদা ছিলেন বিরাট পালোয়ান। বিজয় মল্লিকের আখড়ার লোক। সোনাদা তখন ইনজিনিয়ারিং পড়েন। একেবারে কিংকঙের মতো চেহারা। অমন একজন দুর্ধর্ষ জোয়ান পুরুষ যে কিরকম ভিজে ন্যাতার মতন মানুষ হতে পারে, সোনাদাকে যে না দেখেছে বুঝবে না। সাত চড়েও সোনাদা রা কাড়বেন না।

আমি তখন বিছানায় শুয়ে। বন্ধু, তার বন্ধু—এমনি অনেকেই আসছে। শুনতে পেলাম ওরা ভারি সমস্যায় পড়েছে। বদলা তো একটা নিতে হয়। কিন্তু সোনাদাকে কিছুতেই রাগানো যাচ্ছে না।

ওরা চায় আমাকে সশরীরে সোনাদার ঘরে হাজির করে একবার

শেষ চেষ্টা করে দেখতে।

গেলাম। খানিক পরেই সোনাদা আমাদের ঘর থেকে বার করে দিলেন। বেরিয়ে এসে আমার বন্ধু বেবী হাসি-হাসিমুখে চোখ টিপে বলল, 'ধরেছে।'

এর পরের ঘটনা হল এই যে, একদিন একটা লরির মাথায় আখড়ার ছেলেদের চাপিয়ে সোনাদা ঐ হলিউড মাঠের ছেলেদের এমন রামধোলাই দিয়ে এলেন যা নাকি ওরা বাপের জন্মে ভুলবে না। চলে আসার সময় ওরা সোনাদার পা ছুঁয়ে বলেছে যে, এমন কাজ ওরা নাকি জীবনেও করবে না।

তার কয়েকদিন পরেই ছিল দোল। আমরা এমনিতেই দোলের দিন দল বেঁধে বেরোতাম।

ওষুধ যে কতটা ধরেছে, সেটা সেদিন আমরা হাতেনাতে বুঝলাম হঠাৎ ওই পাড়ায় গিয়ে পড়ে। আমাদের দেখেই হৈ হৈ করে ছুটে এল বিরাট এক দঙ্গল। পিচকিরির জল নয়, বাঁদুরে রং নয়—আমাদের জন্যে ওরা এনে হাজির করল বিশুদ্ধ আবির। তাও আবার সেণ্ট-দেওয়া। হেসে বাঁচি না।

তা এই তো গেল ফোকলা দাঁতের বৃত্তান্ত।

আর বন্ধুর সেই বোন?

তার খুব ভালো বিয়ে হল। সেও আবার আমাদের ভূতপূর্ব কলেজের এক বন্ধুর সঙ্গে।

বিয়ের পরে সেই বন্ধুটি আমাকে একদিন চুপিচুপি জিগ্যেস করেছিল ওর স্ত্রীর সঙ্গে আমার কোনো ভূতপূর্ব প্রেমের সম্পর্ক ছিল কিনা। থাকলে কি আর ফাঁকা মাঠে গোল দেবার ও সুযোগ পেত? ছোকরা ভাবে কী!

তবু আমি ইচ্ছে করে ওর মনে একটু হিংসের বীজ বুনে দেবার জন্যেই জিভটা একটু কেটে শুধু বলেছিলাম—রামো চন্দ্র!

বলেছিলাম। বেশ করেছিলাম। অত লেখাপড়া শিখেও, চড়চড় করে অত ওপরে উঠেও যখন আমি বলব, তখন বুঝবেন--ও একটা চিজ বটে!

৩

কোথাকার কে

দেশের বাড়ি নদীয়ায় হলেও যাদের মধ্যে বড় হয়েছি, তাদের প্রায় সবারই বাড়ি পূর্ববাংলা।

বাড়িতে আমরা 'নুচি' না বললেও 'নেপ' আর 'নেবু' বলতাম। তাতেও বাঙাল বন্ধুরা ঘটি বলে আমাকে খ্যাপাত।

কিন্তু নেবুতলার কথা হলে ওরা পড়ে মুশকিলে। কখনও ওরা মুখ ফসকে লেবুতলা বললে আমিও তখন 'লেলিনে'র কথা তুলে ওদের একহাত নিই।

নওগাঁয় যাওয়ার আগেও (এখানে বলে রাখি, ওখানকার দেহাতি ভাষায় নওগাঁ ছিল 'লগাঁ'), আমার একটা শৈশব ছিল। বোধহয় বছর তিন-চার বয়স অব্দি। সেই বছরগুলো কেটেছিল ৫০-নম্বর নেবুতলার গলিতে।

সেই সময়কার ছাড়া-ছাড়া কিছু কথা মনে আছে।

মাটি থেকে কুড়িয়ে একবার বোধহয় লঙ্কা খেয়ে ফেলেছিলাম। মা আমাকে কোলে শুইয়ে বুকের দুধ খাইয়ে শান্ত করেছিলেন। এ থেকে মনে হয় তখন আমার বয়স খুবই কম ছিল। যতদূর মনে হয়, তখনও আমি মেঝেয় হামাগুড়ি দিতাম।

আমাদের রান্না করত যে, উড়িষ্যার সেই মোহনের আমি খুব ন্যাওটা ছিলাম। ফাঁক পেলেই আমি ওর কোলে চড়ে বসতাম। যতটা মনে পড়ে, মোহনকে আমি খুব ভালবাসতাম। অবশ্য ওর কোলে ওঠার আরেকটা আকর্ষণ ছিল ওর মুখের পান। তার স্বাদ এখনও যেন আমার মুখে লেগে আছে। ও বোধহয় গুণ্ডি খেত না। খেত কি? ও গুণ্ডি খেলে

নিশ্চয় আমাব মাথা ঘুরত। কখনও মাথা ঘুরেছিল বলে তো মনে পড়ে না। তবে এটুকু মনে আছে যে, মোহনের মুখে মুখ দেওয়াটা আমার কাকারা কেউ পছন্দ করতেন না। কেননা আমার ঠোঁট লাল দেখলেই মোহনকে ওঁরা দাবড়াতেন।

পছন্দ করতেন না বললে কম বলা হয়। এর জন্যে আমাকেও বকতেন তো বটেই, চড়চাপড়ও মেরেছেন। মা তো তখন হেঁসেলে। রান্নায় ব্যস্ত। মা হেঁসেলে না ঢুকলে মোহনের আর হাত খালি হবে কেমন করে? আমিই বা কী করে ওর কোলে চড়ে বেড়াব? বেচারা মা আর এসবের কী জানবেন?

বাবা? বাবা তো উদয়াস্ত বাড়ির বাইরে। সে বয়সে বাবাকে দু-একবারের বেশি দেখেছি বলে মনেই পড়ে না। বাবা তখন কেমন দেখতে ছিলেন তাও মনে নেই।

কাজেই কাকাদের চোখ এড়িয়ে কখন কিভাবে পানখোর মোহনের সঙ্গে মুখোমুখি সম্পর্ক পাতাতে হবে, তখন সেই বয়সেই আমাকে সেটা শিখে নিতে হয়েছিল।

মা-র ছটি সন্তানের মধ্যে আমরা দু-ভাই আর এক বোনই কপাল-জোরে টিঁকে গিয়েছিলাম। দিদি ছিলেন সবার বড়।

আমি দু-ভাইয়ের মধ্যে ছোট হলেও মা-র ঠিক কোলের ছেলে নই। কারণ, আমার পরেও আমাদের এক ভাই হয়েছিল। সে নিশ্চয় আঁতুড়ে মারা যায় নি। তাহলে তার কোনো নামকরণ হত না।

একটু আগে তার নামটা মনে করতে পারছিলাম না। খুব আপসোস হচ্ছিল এই ভেবে যে, আমার ভাইবোনেদের মধ্যে শেষ যে দিদি ছিলেন বছরখানেক আগে তিনিও চোখ বুঁজেছেন। আমাদের বংশে আমিই এখন বড়। পুরনো কথা বলতে পারে এমন কেউই আর এখন বেঁচে নেই।

নামটা যখন মনে পড়েছে, তখন বলব নাই বা কেন?

ফ্রয়েড নাকি বলেছিলেন ভুলে যাওয়াটা ইচ্ছাকৃত। ভুলতে চাই

বলেই আমরা নাকি ভুলে যাই।

একমাত্র শিবদাসের ক্ষেত্রে এটা আমার দিক থেকে সত্যি হলেও হতে পারে।

শিবদাস নয়, মা বলতেন শিবোদাস। এমন আবেগ দিয়ে নামটা উচ্চারণ করতেন! আমার সেটা পছন্দ হত না।

সেই শিবদাস—তার বয়স কত ছিল। ভগবান জানেন—সে নাকি ছিল ধবধবে ফরসা। আমার বাবার গায়ের রং পেয়েছিল।

মা নিজে কালো। অথচ শিবদাসের গায়ের রং নিয়ে কী আদিখ্যেতা! বাবা আমাকে 'কালো' বলে ডাকেন ঠিক। কিন্তু বাবার মুখে কোনোদিন শিবদাসের নাম শুনি নি।

তাহলে খোলাখুলিই বলি। এই শিবদাস, যে কিনা ছিল মা-র আসল কোলের ছেলে, যাকে আমি জ্ঞানত কখনও দেখি নি—যে আমার কাছে ছিল শুধুমাত্র শোনা কথা—হ্যাঁ, ইহলোকে না-থাকা সেই ফর্সা শিবদাসকে আবাল্য আমি হিংসে করেছি।

আর এই এঁড়ে-লাগার ব্যাপারটা এ জন্মে যাবার নয়।

মা-রই বা কী আক্কেল। আমাকে ঠোকবার দরকার হলেই অমনি বলতেন, 'আহা রে, আমার শিবোদাস যদি আজ থাকত।'

হ্যাঁ, বলতেন।

বাংলা ভাষার এই আরেকটা মুশকিল। মা-বাবা দিদি-দাদা কাকা-দাদু এঁদের প্রসঙ্গে 'লেন' 'ছেন' এসে যাচ্ছে। ভাবখানা যেন ওঁদের সকলের সঙ্গেই গুরুজন-সম্বন্ধে আমি আপনি-আজ্ঞে করে কথা বলতাম। মোটেই কিন্তু তা নয়।

দিদি-দাদা ছাড়া আর সবাইকেই বলতাম 'তুমি'। দিদি-দাদার সঙ্গে ছিল আমার তুইতোকারি সম্পর্ক। দাদা আমার চেয়ে চার আর দিদি আট বছরের বড়ো। দাদাকে বরাবরই তুই বলতাম। দিদিকে ছোট-বেলায় বলতাম 'তুমি'। পরে তুমি কী করে তুই হল বলছি।

দিদির বিয়ে হওয়ার পর আমি আর দাদা একবার গিয়েছি দিদির

শ্বশুরবাড়ি। বলতে গেলে আমাদের পরের গ্রামে।

অন্য বাড়িতে গিয়ে দিদির থাকা, আলাদা বাক্সবিছানা, ঘরসংসার সামলানো, আঁচলে চাবির গোছা ঝোলানো। এইসব দেখেশুনে আমার কেবলই মনে হত দিদি কেমন যেন পর হয়ে গেছে। যারা পর ভুল করে তাদের আপন মনে করছে। পরের বাড়িটাকে নিজের বাড়ির মতো করে দেখছে। আমার খালি মনে হত দিদিকে কিছুতেই পর হয়ে যেতে দেওয়া উচিত নয়। দাদাকে যখন তুই বলতে শুনছি তখন মনে হচ্ছে ওরা দুজনে অনেক বেশি আপন।

তখন একটু একটু ব্যাকরণ শিখেছি। গোড়ায় গোড়ায় যা দু-চারটে কথা বলতাম সবই ভাববাচ্যে। বেশ বুঝতে পারছি ওভাবে বলার মধ্যে কেবল যেন আঠা-আঠা ভাব থাকছে না। আর এও ঠিক, তুমি দিয়ে সে দূরত্ব কাটানো যাবে না।

সেই সময় চোখকান বুজে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল বিপত্তারিণী 'তুই'। বলে ফেলেই কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। দেখে মনে হল, আমার চেয়ে ছ-বছরের বড় দিদিও ঠিক তার জন্যে তৈরি ছিল না। আমার তখন একটা বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। না পারি গিলতে, না পারি ওগরাতে। কিন্তু তীর একবার ছুঁড়ে দিয়ে তাকে আর ফেরাই কেমন করে? আমার সামনে একমাত্র রাস্তা তখন তুইকে আরও জোর দিয়ে আঁকড়ে ধরা। এমন একটা ভাব দেখানো, যেন বরাবরই আমি দিদিকে তুই বলে আসছি।

সেই থেকে দিদি আমার কাছে বরাবরের মতোই তুই হয়ে গেল।

কলকাতায় সেই শিশুবয়সে কী আশ্চর্য, শিবদাসের কথাটা ঠিক মনে আছে—কিন্তু দাদা-দিদির কথা ভালো মনে পড়ে না।

গলির কথা পরে বলব। বাড়িটার কথা আগে বলে নিই।

বাড়িটা ছিল পুবমুখো। আমরা থাকতাম দোতলায়। রাস্তার ধারে ছিল দুটো ঘর। আলো ছিল বেশ। তবে হাওয়া ছিল কিনা মনে নেই।

বাইরে টানা একটা গাড়িবারান্দা ছিল।

সামনের ডানদিকের ঘরটাতে থাকতেন ঠাকুর্দা।

ঠাকুমাকে আমরা কখনও দেখি নি। শুনেছি, ঠাকুমা যখন মারা যান আমার ছোটকাকা তখন খুবই ছোট। ঠাকুমা সুন্দরী ছিলেন কি? বলতে পারব না। তবে খুব নাকি ফরসা ছিলেন। ঠাকুর্দাকেও আমরা দাদা বলতাম। এখন ভেবে অবাক হই, এক 'দাদা' দিয়ে ঠাকুর্দা আর বড় ভাই—একসঙ্গে দুজনকে কিভাবে হাতে রাখতাম। দাদার রং বেশ ময়লা। আমার বাবা পেয়েছিলেন ঠাকুমার গায়ের রং।

শুনেছি আমাদের আদি বাড়ি ছিল নদীয়ার সীমান্তবর্তী যশোরের সুমিদ্রে বলে কোনো গ্রামে। লিখে মনে হচ্ছে, নামটাতে ভুল আছে। সেক্ষেত্রে ঐ নামের কাছাকাছি নামের কোনো গ্রামে। জীবনে সে গ্রামের একজনকেই আমরা চোখে দেখেছি। আবছা মনে আছে। তিনি সম্পর্কে আমার ঠাকুর্দার এক ভাই। বৌবাজারে ঘোষ-ব্রাদার্সের ঘড়ির দোকানে কাজ করতেন।

আমার ঠাকুর্দা কিংবা ঠাকুর্দার বাবা তাঁর মামার বাড়ির সম্পত্তি পেয়ে নদীয়ার লোকনাথপুর গ্রামে উঠে আসেন। আমার ঠাকুর্দার মা কিংবা ঠাকুমা ছিলেন খুব জাঁদরেল মহিলা। ওঁদের আমলে আমাদের গ্রামে বিলের পাশে উঁচু ঢিবিতে ছিল সাহেবদের নীলকুঠি। গ্রামের লোকদের ওপর কী একটা অন্যায় অবিচার করায় আমার ঠাকুর্দার মা বা ঠাকুমা নাকি লম্বা একটা বেত হাতে নিয়ে নীলকুঠির এক সাহেবকে তেড়ে গিয়েছিলেন মারতে।

এ গল্পটা শুধু আমাদের বাড়ির লোকদের মুখেই শুনেছি। শুনে আমার খুব একটা বিশ্বাস হয় নি। আমাদের বাড়ির লোকেরা যেরকম ভীতু প্রকৃতির তাতে আমি আর দাদা এ গল্পটাকে বরাবরই একটু সন্দে-হের চোখে দেখেছি। তবে পরে ভেবে দেখেছি ঠাকুর্দার মা বা ঠাকুমা তো অন্য বংশ থেকে এসেছিলেন, সেক্ষেত্রে হয়ত তাঁদের একটু বেশি তেজ থাকলেও থাকতে পারে।

আমার পিসিমাদের সঙ্গে মিল থাকার সূত্রে ঠাকুমার চেহারাটা আঁচ করতে পারি।

চোখ আর গালের মাঝখানের হাড় একটু উঁচু। চুল আর ভুরুর মাঝখানে কপাল ঈষৎ চওড়া এবং তেরছা। পায়ের গোড়ালিতে একটু হিল-তোলা ভাব। গায়ের রং পীতাভ। মুখশ্রীতে কমনীয়তার চেয়ে রুক্ষতার পাল্লা ভারি। একই সঙ্গে তিরিক্ষে আর ছিঁচকাঁদুনে। এক কথায় খুব আবেগপ্রবণ। কেষ্টনগরে বাবার এক মাসতুতো বোনকে দেখে, কেন জানি না, আমার খুব ঠাকুমার কথা মনে হয়েছিল। যদিও আমরা কখনও ঠাকুমার কোনো ফটো দেখি নি। ঠাকুমার নামটাও কারো কাছ থেকে জেনে নেওয়া হয় নি।

আমাদের দেশের বাড়ির যে অংশটা জীর্ণ হয়ে ভেঙে পড়েছিল তারই চিলেকোঠাঘরে আমার ঠাকুমার মৃত্যু হয়েছিল বলে শুনেছি মৃত্যু মানে স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। আত্মহত্যা। ক্যানসারের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে।

শাড়িতে আগুন দিয়ে, না গলায় দড়ি দিয়ে—ঠাকুমা কিভাবে মারা গিয়েছিলেন কেউ আমাদের বলে নি। আমাদেরও জিগ্যেস করতে খেয়াল হয় নি। তবে সে আমলে তো কেরোসিনের এমন চালও ব্যবহার ছিল না। কাঠের উনুন। বেড়ির তেলের পিদিম। এ থেকে অনুমান হয়, বোধহয় পোড়া না। ঠাকুমা সম্ভবত গলায় দড়ি দিয়েছিলেন।

আমার মা-র বাবা। আমার দাদামশাই। তাঁকেও আমি দেখি নি কৃষ্ণনগরে মামার বাড়িতে আমার জন্ম হয়েছিল দাদামশাই মারা যাওয়ার ঢের পরে। সেও কি আজকের কথা?

দাদামশাইয়ের অবশ্য ফটো দেখেছি। খাটে শুয়ে আছেন। বুকের ওপর একটা তোড়া। সেকালে ফুলের মালা দিয়ে অত আদিখ্যেতা করার ব্যাপার ছিল না। পেছনে বিভিন্ন বয়সের পাঁচ মামা দাঁড়িয়ে। ছবি হলদে হয়ে যাওয়ায় চোখ দুটো তুলসীপাতা দিয়ে ঢাকা ছিল কিনা বোঝা যায়

নি। নাক আর ওপরের ঠোঁটের মাঝখানে মুড়োঝাঁটার মতো গোঁফ। দেখেই বোঝা যায়, বেশ দশাসই চেহারা। রংও যা শুনেছি বেশ মিশমিশে কালো। আমার মা ওঁর বাবার রংটাই পেয়েছিলেন। আমার দিদিমাকে দেখেছি গায়ে দুধে-আলতার রং।

আমার দাদামশাইয়ের নামটাও তাঁর গায়ের রঙের সঙ্গে মেলানো। কালীমোহন। আমার মার নাম যে যামিনী, সেও কি গায়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়েই দেওয়া হয়েছিল?

না। মা-র কথা এখন থাক। মাকে মনে করলেই আজও আমি কেমন যেন হয়ে যাই। বাবার বেশি টান ছিল দাদার ওপর। আর আমি মা-সোহাগী।

দাদামশাই ছিলেন বাঁড়ুয্যে। ডাক্তার। সহকারী সিভিল সারজেন। যেকালে মুখ্যত সাহেবরাই সিভিল সারজেন হতে পারত, সেকালের পক্ষে বেশ উঁচু পদই বটে।

আমার দিদিমা ছিলেন কুড়িটি সন্তানের গর্ভধারিণী। তার মধ্যে বেঁচে ছিলেন দশজন। পাঁচ মামা আর মাকে নিয়ে পাঁচ বোন।

দাদামশাইয়েরও হয়েছিল ক্যানসার। এক্ষেত্রেও যন্ত্রণার হাত এড়াতে শেষ পর্যন্ত বিষ খেয়ে আত্মহত্যা। টাকাকড়ি, কাঁঠালপোঁতায় বাগানসুদ্ধ বিরাট বাড়ি—সব রেখে গেলেও, পাকা বুদ্ধির অভাবে সব নয়-ছয় হয়ে অতবড় সংসারটা শেষ পর্যন্ত ভেসে গেল।

দাদামশাই সম্পর্কে যদি ভুল শুনে না থাকি, জীবনকে চুটিয়ে ভোগ করেছেন। এসব ব্যাপারে একটু বাড়িয়ে বলা, একটু গল্প—এ তো থাকেই। রোজ নাকি একটা করে কচি পাঁঠার মাথা খেতেন। এমনি এমনি কি আর খেতেন? নিশ্চয় সঙ্গে মদও থাকত। পেঁয়াজ-টেয়াজও খেতেন নিশ্চয়। রোগে ভুগে মৃত্যু-কালেও ওঁর মুখে ছিল এক ভোগতৃপ্ত ছাপ।

নেবুতলার বাড়িটার কথা বলছিলাম। বাড়িটাতে ছিল দুটো সিঁড়ি।

একটা বাইরের মহলে। একটা ভেতর মহলে। সামনেরটা দিয়ে ওপরে উঠলে পুবের দুটো ঘর। ঠাকুর্দার ঘর ডানদিকে। বাকি সবাই কে কোন্ ঘরে থাকত মনে নেই।

তবে বাঁদিকের ঘরটাতে পোয়াতী অবস্থায় একবার মেজো পিসিমা এসে উঠেছিলেন। বাড়িতেই প্রসব হয়েছিল। জানলার ওপর উঠে শিক ধরে দাঁড়িয়ে সে সব কাণ্ডকারখানা দেখেছিলাম। 'ফরসেফ' কথাটা কানে ঢুকে গিয়েছিল। শব্দটা বোধহয় অনেকবার বলা হয়ে থাকবে। এও মনে আছে, মেজো পিসিমা আঁতুড় থেকে বেরিয়েই বদ্ধ পাগল হয়ে যান।

ঠাকুর্দার ঘরটা খুব বেশি করে মনে থাকার কারণ ওই ঘরেই থাকত ঠাকুর্দার কালো রঙের একটা ক্যাশবাক্স। তার ছিল দুটো তাক। কাগজপত্র ছাড়াও ওপরের তাকে থাকত খুচরো পয়সা। আর নিচের তাকে থাকত কাগজের নোট।

ঠাকুর্দা দাদাকে একটু বেশি ভালোবাসতেন। ডাকতেনও 'দাদা' বলে। আমাকে গোবিন্দ বলতেন। দিদিকে বড়ো একটা পাত্তা দিতেন না।

দাদা ঘরে ঢুকে চাইলেই দু-চার পয়সা করে পেত। আমি লক্ষ্য করতাম, ছোট কাকা ঘরে এলে ঠাকুর্দা এদিক-ওদিক চেয়ে ক্যাশবাক্সের নিচের তলায় হাত ঢোকাতেন। তার মানে ছোট কাকাকে নিশ্চয় দাদার চেয়েও বেশি ভালবাসতেন।

ঠাকুর্দার ক্যাশবাক্স। ওটা ছিল আমাদের কাছে গুপ্তধনের মতোই দারুণ কৌতূহলের বিষয়। ওতেই থাকত বাড়ির সবারই কুষ্ঠি। হলদে কাগজ, তাতে লাল কালিতে লেখা। গোল করে মোড়ানো।

ঠাকুর্দা মারা যাওয়ার পর ওটা থাকত মেজোকাকার কাছে। সে তো হল। কিন্তু কুষ্ঠিগুলো গেল কোথায়? ভাগ্যিস আমার বিয়েতে কুষ্ঠি লাগে নি।

কুষ্ঠিটা হারিয়ে আমার ভবিষ্যৎটা অন্ধকার হয়ে গেল।

পুবের মহল থেকে পশ্চিমে যেতে সরু একটা দালান পেরোতে হত। তার ডানদিকে ছিল রান্নাঘর।

সেটা পেরিয়ে সামনেই যে ঘর, সেটাতে মা থাকতেন। বাবাও নিশ্চয় ওই ঘরেই থাকতেন। আর মনে আছে, ছোট পিসিমাও একবার ছেলেপুলে নিয়ে এসে ওই ঘরে অনেকদিন থেকে গিয়েছিলেন। পিসে-মশাইরা তখন থাকতেন করাচি কিংবা সিমলায়।

ঘরটাতে তেমন আলো-বাতাস ছিল না। তবে পাশেই ছিল একচিলতে ছাদ। চড়াইভাতি শব্দটা ঐ ছাদের সূত্রেই আমার মনে গাঁথা আছে। কেন তা আর মনে নেই। ছাদে চড়াইপাখি এসে বসার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? একটার আংটায় আরেকটা কিভাবে আটকে যায় বোঝা মুশকিল।

পাশের বাড়িটা ছিল সোনার বেনেদের। ওদের বাড়ির একটা সুন্দর দেখতে মেয়েকে ছাদে দেখা যেত। তাকে দেখার জন্যে এ বাড়ির ছোকরারা বেশ একটু ছোঁক-ছোঁক করত। ওদের বাড়ির ছেলেরা পায়রা ওড়াত। লক্কা কাগ্‌জি গেঁড়োবাজ—নামগুলো কানে আসত। ওদের কেটে যাওয়া ঘুড়ির হাত্তা সাঁ সাঁ করে আমাদের ছাদের ওপর দিয়ে চলে যেত। কেউ ধরত না।

গায়ে গায়ে লাগানো দু-বাড়ির মাঝখানে একটু উঁচু-করা বেদীর মতন একটা জায়গায় তোলা থাকত। একটা তুলসীর টব। তখনকার সব বাড়িতেই টবে তুলসীর গাছ থাকত। তার ধারেপাশে আর কোনো গাছ ছিল না। পায়রা ছাড়া পাখি বলতে একমাত্র কাক। একবার একটা গোল চাঁদকে সামনের একটা বাড়ির আল্‌সেয় বসে থাকতে দেখেছিলাম।

আমাদের পাড়ায় ডান দিকে একটু এগিয়ে গেলে বাঁদিকে খিলানঅলা একটা বাড়ি ছিল। বোধ হয় একমাত্র সেই বাড়িতেই খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে দুর্গাপুজো হত। আর হত যাত্রা। আমি ছোট বলে যেতাম না। ওরা ছিল ডানকুনি, কোন্নগর কিংবা কলকাতার আশপাশের

কোনো অঞ্চলের জমিদার।

গলির কথা এর পরে বলব। ছাদের কথাটা আগে সেরে নিই।

বাড়ির কে কোথায় রাত্রে শুত সব মনে নেই। দাদা বোধহয় শুত ঠাকুর্দার ঘরে। দিদির তখন এগারো-বারো। ভিক্টোরিয়াতে পড়ত। সেদিনের চোখে বেশ ডাগর বলেই মনে করা হত। দিদি কোন্ ঘরে শুত মনে নেই।

তবে একদিন রাত্তিরে যে আমি মা-র কাছেই শুয়েছিলাম তাতে সন্দেহ নেই। তখন কালীপুজো হয়ে গেছে। বাবা বোধহয় বাইরে কোথাও ট্যুরে গিয়েছিলেন।

বাবার ছিল কড়া হুকুম, দেওয়ালিতে কেউ কোনো বাজি ফোটাতে পারবে না। বাবার এই নিষেধাজ্ঞায় ঠাকুর্দারও দেখেছি সায় ছিল। ছেলেরা বাজি পোড়ালে তার খরচের ঠেলা ঠাকুর্দাকেই তো সামলাতে হত। বোধহয় সেই কারণেই বাবার নিষেধাজ্ঞা ঠাকুর্দা সোৎসাহে মেনে নিয়েছিলেন।

যেদিনের কথা বলছি, সেদিন মাঝরাত্তিরে চাপা গলায় ফিসফিস করে মা আমাকে ডেকে তুললেন। টিনের ট্রাঙ্কটা খুলে মা কয়েকটা কাগজের ঠোঙা বার করলেন। তার মধ্যে কয়েক রকমের বাজি। বসানো তুবড়ি, লাল-নীল দেশলাই আর রংমশাল। অবশ্য মা আমার হাতে দেন নি। একটা একটা করে মা নিজেই সব জ্বালালেন। তখন রাতদুপুর। চারিদিকে শুনসান। আশপাশে কেউ কোথাও নেই। কেউ জানছে না। শুধু মা আর আমি। আমার সে কী আনন্দ। সেদিন পুজো নয়, পার্বণ নয়—এমনি একটা রাত্তির।

এরপর কখনও আর এমনটি হয় নি।

মা নিশ্চয় আগে থেকেই মোহনকে দিয়ে এসব কিনে এনে রেখে-ছিলেন। চুপিচুপি রেখে দিয়েছিলেন ট্রাঙ্কে। কেউ যেন জানতে না পারে। তারপর কলকাতায় বাবা যখন নেই, তখন বাবার সেই অনুপস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিলেন।

এ পর্যন্ত বুঝতে অসুবিধে নেই। কিন্তু দাদা-দিদি কেন বাদ পড়ল? হয়ত অন্যদের কাছে ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে।

আমার ব্যাপারটা নিয়ে অত ঝামেলা নেই। বাবা না থাকলে আমি মা-র কাছেই যে শোব, এটা জানা কথা।

কিন্তু সন্দেহ থাকছে, মা কেবল আমাকে খুশি করার জন্যেই বাজিগুলো পুড়িয়েছিলেন কিনা। তাই যদি হত, তাহলে একটা বাজিও কেন আমাকে পোড়াতে দিলেন না? আমি পাছে পুড়ে যাই, সেই ভয়ে? নাকি মা-র মধ্যেও ছিল একটা হারানো ছেলেবেলা, একটু জো পেলেই যা সংসারের জাল কেটে বেরিয়ে আসতে চাইত?

হতে পারে। আবার নাও হতে পারে।

মা-র মনে নিশ্চয় একটা অবদমিত ইচ্ছে ছিল। ছেলেবেলায় বাপের বাড়িতে কি দেওয়ালিতে বাজি ফোটাতেন? অসম্ভব নয়। আমার মামাতো ভাইরা যে-রেটে পটকা আর উড়নতুবড়ি তৈরি করত, তাতে সন্দেহের একটা ভিত্তি ছিল বৈকি!

ব্যাপারটা খুবই তুচ্ছ। কিন্তু সেই রাত্তিরটা জীবনে কখনও ভুলবার নয়।

শেষে একটা কথা। বাড়িটার সবকিছুই বলেছি। কিন্তু কল-ঘরটা কোথায় এবং কেমন ছিল, একেবারেই মনে নেই।

জানতাম না, এটা হতেই পারে না।

নাকি আমার যা বয়স ছিল, তাতে তখনও বাথরুম ব্যবহার করার উপযুক্ত হই নি?

কী জানি! কোন্‌টা কেন ভুলে যাই, সেও এক রহস্য।

পশ্চিমেরটাই ছিল বাড়ির সবচেয়ে ওঁছা ঘর। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, সেই ঘরটাই বাবা কেন নিজের জন্যে বেছে নিয়েছিলেন? 'নিজের' সর্বনামটা একবচন করেছি এইজন্যে যে, এই নির্বাচনের ব্যাপারে আমার মা-র যে কোনো হাত ছিল না, সেটা ধরেই নিতে পারি। মা-কে যতটা

জানি, সব ব্যাপারে বাবার আত্মত্যাগের এতটা বাড়াবাড়ি তাঁর পছন্দ হত না। নেপথ্যের দু-একটা স্বগতোক্তিতেই তা ধরা পড়ত। তা ছাড়া এতেও তো সন্দেহ নেই যে, ঠাকুর্দা বেঁচে থাকলেও বাবার ঘাড়ের ওপরই তো সংসার। কার সংসার? তিন কাকা। তার ওপর পিসিদের অনবরত ঘাড়ে এসে থাকা। এসব তো ঠাকুর্দারই গুষ্টি।

মা মুখ বুঁজে থাকেন। পাষাণের মতো তাঁর সহ্য। বাবা তো রোজগার করেই খালাস। ফোঁড় দিয়ে দিয়ে ছেঁড়াফাটা সংসারটা মাকেই তো চালাতে হয়।

বাবা দিব্যি আছেন। নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সারাদিনই তো বাড়ির বাইরে।

হ্যাঁ, বাড়ির বাইরে।

বাড়ির বাইরেটা নিয়ে আমিও একটু বলব।

অর্থাৎ, আমাদের সেই নেবুতলার গলিটার কথা।

৪

গলির সঙ্গে গলাগলি

নেবুতলার গলিতে ছিল একচিলতে গাড়িবারান্দা।।

এইটুকু লেখার পর আবার আমি ফুসমন্তরে যেন ছোট হয়ে গিয়েছি। রেলিঙের লোহার গ্রিলে পা দিয়ে উঠে ঝুঁকে পড়ে নিচের বাঁধানো রাস্তাটা চুপিচুপি নিঃশব্দে দেখছি। পাশের ঘরে ঠাকুর্দা ছাড়া কেউ নেই। মা রান্নায় ব্যস্ত। আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। রেলিঙে পা দিয়ে উঠেছি বলে কেউ এখন হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসবে না।।

বাড়ির বাইরেটা যে কী মজার!

চোখ বুঁজলে এখনও যেন সব দেখতে পাই। চোখের ক্যামেরায় সেদিনের তোলা ছবিগুলো, যখন যেমন দরকার, ডেভালাপ, প্রিণ্ট আর এনলার্জমেণ্ট হয়েছে অনেক পরে। ফলে, আজও সে-সব হলদে হয়ে যায় নি। ইচ্ছেমত এখনও সেই নেগেটিভ থেকে স্বচ্ছন্দে আমি পেয়ে যাই নতুন-নতুন প্রিণ্ট।

গলিটা ছিল এমন যে কেউ বোধহয় সেখানে নিজের চোখে কোনো-দিন সকাল হতে দেখে নি।

মনে আছে: হোসপাইপে গলাফাটানো ঘোলা জলে রাস্তায় বান ডাকানোর শব্দ; বাঁশের-চোঙ-লাগানো চৌবাচ্চায় কলকণ্ঠে সকালের প্রথম জল আসার আওয়াজ; গলির দরজায় বাড়িতে ডাকাত-পড়ার মতো করে সাতসকালে ঠিকে-ঝির জোরে জোরে কড়া নাড়া; কলতলার এঁটো বাসনের দিকে চোখ রেখে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাশের বাড়ির কার্নিশে বসা কাকের গলা-চেরা কা-কা।

এ গলিতে সূর্যোদয় দেখা না গেলেও বিচিত্র সব শব্দে এখনও

তেমনি সকাল হতে শোনা যায়।

আর ঠিক তখনই তোলা-উনুনের দম-আটকানো ধোঁয়াগুলো বাইরে থেকে হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে শুয়ে-থাকা মানুষগুলোর নড়া ধরে তুলে দিত। আড়ামোড়া ভেঙে তাদের ওঠবার ভঙ্গিতে মনে হত যেন কড়িকাঠে ঝুলে-থাকা আর দেয়ালে-পিঠ-দেওয়া অন্ধকারের দিকে তারা যেন জোড়া পায়ে লাথি ছুঁড়ছে।

সামনের গায়ে-গায়ে-মেশা দোতলা বাড়িগুলোর ফাঁকফোঁকর দিয়ে কিংবা ছাদ টপ্‌কে হৈ হৈ করে এসে রাস্তায় আর ছাতলা-পড়া উঠোনে লাফিয়ে পড়ত একপাল কচি-কাঁচা রোদ।

রাস্তা দিয়ে মিছিল করে প্রথম যাওয়া শুরু করত বস্তির ঠিকে-ঝি, জলকলের মিস্ত্রি আর বিশাল-বিশাল হাতাখুন্তি কড়াই কাঁধে নিয়ে হালুই-করের দল।

এ-গলির একজনই শুধু সকালে সূর্যোদয় দেখার কপাল করে জন্মে-ছিলেন; প্রথম লড়াইতে লাল-হওয়া ফটকঅলা বাড়ির বুড়ো কর্তা, যাঁর বাড়িতে দোলদুর্গোৎসব হত; আর যাঁর ঠাকুরদালানে বসত যাত্রা-তরজার আসর। সূর্য-ওঠা তিনি দেখতেন তাই বলে এ-গলি থেকে নয়। সাতসকালে গঙ্গা নাইতে গিয়ে বাবুঘাটে তাঁকে চিত কিংবা উপুড় করে যখন তেল মালিশ করা হত, সেই সময় এ-গলির একমাত্র প্রতিভূ হিসেবে একমাত্র তিনিই দেখতে পেতেন ময়দান পেরিয়ে আকাশের হাঁটু ধরে উঁচু উঁচু বাড়ির ফাঁকফোকর দিয়ে জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং সূর্যকে উঠে আসতে।

রাতে-ঘুমুতে-না-পারা ঠিকে-ঝিদের হাত ফস্‌কে থালাটা গেলাসটা কলতলার শানবাঁধানো মেঝেতে পড়ে গিয়ে ঝনঝন আওয়াজে যখন সকালের স্তব্ধতা ভেঙে দিত, তখন তারা নিজেদের অপ্রস্তুত ভাবকে সামাল দিতে বাপের-বাড়ির-জন্যে-মন-কেমন-করা বউদের সান্ত্বনা দিয়ে বলত এ বাড়িতে আজ কেউ আসতেচে গো, মা!

বাঁ হাতের চেটোয় রাখা ঘুঁটের ছাই বা খড়ির গুঁড়োয়, হাঁটু-বার-

করা লাল টেঁটি গামছায়, চটা-ওঠা এনামেলের কাপে চায়ের ধোঁয়ায়, ময়রার দোকানে ফুটন্ত রসে ভাজা জিলিপির গন্ধে, গরম ফুলুরি গালে ফেলে উঃ আঃ শব্দে, ঢোলগোবিন্দ-র মনে আছে, সেকালে নেবুতলায় ভারি সুন্দর সকাল হত।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে চলত রাস্তায় রোদের খেলা। ঘোড়ার গাড়িগুলো যেত পায়ে-টেপা-ঘণ্টায় ঘুঙুরের বোল তুলে। কচিকাঁচা রোদগুলো, ভয় হত, এই বুঝি গাড়ির তলায় পড়ে থেঁতলে যায়! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ত যখন দেখতাম ডানপিটে ছেলেদের মতো সেই রোদ-গুলো টগবগিয়ে চলা ঘোড়ার ঝুঁটি ধরে গাড়ির চালের ওপর টকাস করে উঠে পড়ে পেছনের পা-দানি বেয়ে রাস্তার ওপর লাফিয়ে নামতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে চিৎপাত হয়ে পড়ে যেত। অথচ রোদের গায়ে একটু আঁচড়ও লাগত না।

তারপর রাস্তায় শুয়ে থাকতে-থাকতে পথচলতি লোকদের কখনও পা ধরে, কখনও মাথায় উঠে এমন তুকি-নাচন নাচত যে, তা দেখে ঢোলগোবিন্দ বেজায় মজা পেত। ক্রমে সেই চ্যাংড়া রোদ লায়েক হয়ে উঠে বিকেলে কনে-দেখা-আলো হয়ে ইটের রাজ্য টপ্‌কে কোথায় গিয়ে যে গা ঢাকা দিত, তার দিশে পাওয়া যেত না।

এ-গলিতে টেলিফোন আর টেলিগ্রাফের তারগুলো সেতারের তারের মতো উঁচু উঁচু থাম্বার সাদা সাদা ঠোকায় টান টান হয়ে থেকে এ-দেয়ালে সে-দেয়ালে মাথা ঠুকে গলির বাঁকে একটা জায়গায় যেন দু-হাত বাড়িয়ে দিয়ে কোনো জাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় কোনো কিছু না ধরে শূন্যে আড় হয়ে ঝুলে আছে।

আর সেই তারের গায়ে হেঁটমুণ্ডে লট্‌কে আছে কাটা-সৈনিকের মতো ভোঁ-কাটা-হওয়া কত যে ঘুড়ি। যতক্ষণ কল থাকে, জোরে একটু হাওয়া দিলেই আকাশে উড়ে যেতে চায়। একদিকের কল ছুটে গেলে তখন ডানা-কাটা পাখির মতো ঝটপট ঝটপট করতে করতে কেবলই পাক খায়। ঢোলগোবিন্দ-র মনে পড়ে, নতুন নতুন ঘুড়িগুলোকে ভারি সুন্দর

দেখাত। রঙের কী বাহার। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে রং চটে গিয়ে দুদিনে তাদের এমন যাচ্ছেতাই চেহারা হত যে তাদের দিকে আর তাকানো যেত না। কোনোটার কাঁপের কাঠি ছিঁড়ে গিয়ে দেখাত ঠিক নিশানের মতো। আর সেই নিশানগুলো ঘুরে ঘুরে একমাত্র আকাশ ছাড়া আর সব কটা দিকই ইশারায় দেখিয়ে দিত। ল্যাজে-বাঁধা চেত-টানের কাঠিটা এলোমেলো হাওয়ায় কী করবে দিশে না পেয়ে একবার এ-কাত, একবার ও-কাত হয়ে নিথর নিঃস্পন্দ তারের গায়ে একটা এমন করুণ একঘেয়ে বিষণ্ণ সুর তুলত—সেকথা মনে পড়লে ঢোলগোবিন্দ-র আজও মন খারাপ হয়।

রাতে হিম পড়লে কিংবা বৃষ্টি হলে ঢোলগোবিন্দ দেখতে পেত এক মজাদার তারের খেলা। রাস্তার চানে বাজিকরদের মতন তারের গায়ে পড়ি-মরি করে ঝুলে থাকতে থাকতে হুমড়ি খেয়ে হঠাৎ একসময় হাত ছেড়ে দিয়ে যখন নিচে পড়ে যেত আমার মতো অনেকেরই বুকের মধ্যে কেমন যেন কষ্ট হত।

বর্ষায় রাস্তার খোঁদলগুলোতে জল জমত। সন্ধের পর গ্যাসের আলোয় দেখা যেত তাতে উলটো হয়ে আছড়ে পড়েছে সামনের বাড়ি-গুলোর ছবি।

আট বছরের অদর্শনের পর ঢোলগোবিন্দ যখন আবার কলকাতায় ফিরে এল, তখন তার বয়স এগারো কি বারো। তখন তারের গায়ে ঝুলে-থাকা বৃষ্টির ফোঁটা দেখে তার মনে হয়েছিল ঠিক যেন কোনো কিশোরীর নাকের নোলক।

বৃষ্টির জল-জমা রাস্তাটা তখন আর তাকে রেলিঙের ফাঁক দিয়ে ওপর থেকে দেখতে হয় নি। সটান রাস্তায় যেতে যেতে হঠাৎ একটা গর্তের ধারে নিচু হয়ে সে দেখেছিল মেঘ-ভাঙা চাঁদের ছবি। কলকাতায় ফেরার পর ইঁটের পাজায় যে আকাশটা এতদিন ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, সে যেন হঠাৎ ঘোমটা খুলে তার পায়ের কাছে এসে ধর্না দিয়ে পড়ল।

সে-সব তো ঢের পরের কথা।

আবার সেই আগের কথায় ফিরে যাই।

এ-পাড়ার অনেক বাড়িই ছিল পুঁয়ে-পাওয়া ক্ষয়া-খর্বুটে। বোধহয় চোয়ালের হাড়-বার-করা গাড়িবারান্দাগুলোর জন্যেই ঢোলগোবিন্দদের বাড়িটাও কেমন একটু কোলকুঁজো-কোলকুঁজো লাগত। একতলার রোয়াকে দাঁড়িয়ে দড়িতে ঝোলানো বাঁশের আলনার মতো বারান্দাগুলোকে লাফ দিয়ে যেন ছোঁয়া যায়।

এই গুণটুকুর জন্যেই চড়কের রাতে জেলেপাড়ার সঙ দেখতে বাইরের লোক এ-গলিতে ভেঙে পড়ত।

ছেলেবেলায় দেখা সেই সঙের ছবিটা মনের পটে কেমন যেন লেপে-পুঁছে গেছে।

আজকের মতো ট্রাক-লরি নয়। বার হত গোরুর গাড়ির মিছিল। সেই মিছিল জেলেপাড়া থেকে বেরিয়ে রমানাথ কবিরাজ লেন হয়ে হৈ হৈ করে যখন নেবুতলার গলিতে এসে পড়ত তখন চারপাশের ছাদ আর বারান্দা থেকে উঠত হাততালির ঢেউ।

জেলেপাড়ার সেই সঙে ভাঁড় সেজে ছড়া কেটে অন্যায় অবিচার আর ভণ্ডামিকে চাবুক মারা হত।

আট বছর পর যখন ফিরে আসি, তখন মুখিয়ে ছিলাম জেলেপাড়ার সঙের জন্যে। ঘুরে দেখেও এসেছিলাম তার তোড়জোড় চলছে।

ও হরি, চৈত্রসংক্রান্তির ঠিক মুখে দেখি গলির দেয়ালে-দেয়ালে কাঠের বড়ো বড়ো টাইপে ছাপা পোস্টার : এ বছর জেলেপাড়ার সঙ বন্ধ। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, কেউ যেন আমার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে।

শুধু সে-বছর কেন, সঙ সেই যে বন্ধ হল, ব্যস—কলকাতা থেকে বরাবরের মতোই জেলেপাড়ার সঙ উঠে গেল।

কানাঘুষো শুনেছি, এই সঙ যেমন বিদেশী সরকারকে চটিয়েছিল, তেমনি এদেশের ভণ্ড চাঁইদেরও গাত্রদাহের কারণ হয়েছিল।

যখন কলকাতা ছেড়েছি, তখন আমার বয়স তিন কি চার।

তবু একটা ঘটনার কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। .

ছেলেবেলার স্মৃতির ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত। তার কোনো ধারাবাহিকতা থাকে না। শুধু ছাড়া-ছাড়া কিছু ফ্রীজ-হওয়া শট। কেন কোন্ ঘটনা মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে, ভেবে ঠাহর পাওয়া যায় না।

বারমহলের যে সিঁড়িটা দোতলায় উঠে গিয়েছিল সেটা শেষ হয়ে ডানহাতে ছিল ঠাকুর্দার ঘর।

বেলা বাড়লেও তখনও ঠিক দুপুর হয় নি। ঠাকুর্দার ক্যাশবাক্সটা খোলা। সেটা কোনো টেবিলে থাকত, না তক্তপোশের ওপর থাকত সঠিক মনে পড়ে না। টেবিলে থাকলে ঠাকুর্দাকে চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসতে হয়। অথচ একেবারে ছোটবেলায় তাঁর বাবু-হয়ে-বসা ভঙ্গিটাই আমার কাছে ঢের বেশি চেনা ছিল।

যাই হোক, ক্যাশবাক্সের ডালাটা ছিল খোলা। ঠাকুর্দার ক্যাশবাক্সটার ব্যাপারে বাড়ির সকলেরই একটা চাপা কৌতূহল ছিল, আগেই বলেছি। ঐটুকু পলকা টিনের বাক্সে কে আর তার যখের ধন গচ্ছিত করে রাখবে? মাসে পেনসন তো পেতেন ভারি বত্রিশ টাকা ছ আনা। সেকালে সেরেস্তাদারের আর কত মাইনে ছিল?

এ সত্ত্বেও বাড়ির মেয়েদের যে এত কৌতূহল ছিল তার একমাত্র কারণ তিনি ক্যাশবাক্সের চাবিটা পৈতের সুতোয় বেঁধে রাখতেন এবং ক্যাশবাক্সটাকে সব সময় আগলে বেড়াতেন।

সেদিন সেজোকাকা না ছোটকাকা, কে আমার মনে নেই—সিঁড়ির ধাপগুলো লাফ দিয়ে টপ্‌কে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ঠাকুর্দাকে চাপা গলায় খবর দিয়েছিলেন, 'ভীষণ ব্যাপার। শাঁখারিটোলা পোস্টাপিসে ডাকাতি হয়ে গেছে।'

শোনামাত্র ঠাকুর্দা তড়িঘড়ি তাঁর ক্যাশবাক্সের খোলা ডালাটা দড়াম করে বন্ধ করে আগে চাবি অাঁটলেন। তারপর অন্য কথা।

রাস্তায় তখন লোকে ছোটাছুটি করছে। কয়েকবার গুলি ছোঁড়ার শব্দও নাকি শোনা গেছে।

পরে জানা গেল, ডাকাত নয়। যারা হানা দিয়েছিল তারা স্বদেশী। তারা নাকি মুহুর্মুহু 'বন্দেমাতরম' বলে চেঁচিয়েছিল।

ঠাকুর্দা যেভাবে তাড়াতাড়ি তাঁর ক্যাশবাক্স বন্ধ করেছিলেন, তাতে মনে হয়েছিল ডাকাতরা এরপর হয়ত তাঁর ক্যাশবাক্সটাও লুট করতে আসবে। ফলে, ছেলেবেলা থেকে আমাদের এই ধারণাই হয়েছিল যে, ওর তলাকার খোপে নিশ্চয় সাত রাজার ধন এক মানিকের মতো কোনো গুপ্তধন লুকনো আছে।

ঠাকুর্দা মারা গিয়েছিলেন তারও প্রায় দু দশক পরে। কিন্তু ক্যাশ-বাক্সটার সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটা শেষদিন পর্যন্ত বজায় ছিল।

পরে আমার মেজোকাকা ঠিক ঠাকুর্দার ভঙ্গিতে পৈতেয় বাঁধা চাবি দিয়ে প্রথম যখন সেই ক্যাশবাক্সটা খোলেন, তখন এতদিনের কৌতূহল চাপতে না পেরে আমি তাঁর পাশে গিয়ে বসেছিলাম।

ওপরের ছোট ছোট খোপের কয়েকটাতে ভাগে-ভাগে রাখা ছিল টাকা থেকে পাইপয়সার কিছু কয়েন। একটা খোপে ডাকটিকিট। চওড়া খোপগুলোর একটাতে খাম পোস্টকার্ড এবং আরেকটাতে ফালি-করা কাগজে রোজকার জমাখরচ আর সেই খেরোয় বাঁধানো খাতাটা, যাতে তিনি সকালের নিত্যকর্ম হিসেবে গুনেগেঁথে একশো বার 'শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়' লিখতেন।

আমার আসল কৌতূহল ছিল নিচেকার অদেখা খোপটা সম্পর্কে। সেটা দেখে যে কী হতাশ হয়েছিলাম তা বলার নয়।

নিচের খোপটাতে ছিল দশ টাকার তিনটে নোট। সে মাসে সদ্য-পাওয়া তাঁর পেনসনের ভগ্নাবশেষ। বিধবা সেজো পিসিমাকে মনিঅর্ডার করা আর জমিদারকে খাজনা দেওয়ার রসিদ। আরও টুকিটাকি গুচ্ছের কাগজ। হলদে কাগজে লাল কালিতে লেখা নাতিনাতনীদের কুষ্ঠির ছক। একটা ছোট বাঁধানো খাতায় খুদে খুদে অক্ষরে তাঁর স্বহস্তে লেখা বাংলা পাঁজির হিসেবে আমাদের সব জন্মতারিখ আর জন্মক্ষণ।

যাঁদের বাড়ি, তাঁরা থাকতেন একতলায়।

নেবুতলার সেই বাড়িওয়ালা জ্যাঠামশাই ছিলেন অদ্ভুত মানুষ। কেন সেটা পরে বলছি। জ্যাঠাইমা ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। নিচের বাড়িতে ছিল আমাদের অবারিত দুয়ার। জ্যাঠাইমার অমন সুন্দর মুখে এমন একটা চাপা বিষাদ মাখানো ছিল যে, দেখে ভারি কষ্ট হত।

জ্যাঠামশাই আর জ্যাঠাইমা দুজনেই বনেদি পরিবারের মানুষ। জ্যাঠামশাইরা কোন্নগর থেকে এসে কলকাতার বাসিন্দা হন। জ্যাঠাই-মারা ছিলেন যাকে বলে কলকাতার কায়েত।

জ্যাঠামশাই বোধহয় কাজ করতেন বি-জি প্রেসে। উঁচু পদে থেকে ভালো মাইনেই পেতেন।

বাড়ির বারমহলের একটা এঁদো ঘরে জ্যাঠামশাই থাকতেন। অন্দর-মহলে ছেলেদের নিয়ে থাকতেন জ্যাঠাইমা।

কবে কী কারণে জ্যাঠাইমার সঙ্গে জ্যাঠামশাইয়ের মনোমালিন্য হয়েছিল কেউ জানে না।

কারো কারো ধারণা, ঝগড়ার কারণটা ছিল খুবই অকিঞ্চিৎকর। আসলে নিজেকে দুঃখ দেওয়াটাই ছিল জ্যাঠামশাইয়ের লক্ষ্য। ঝগড়াটা ছিল নেহাৎই একটা বাহানা।

জ্যাঠামশাই তারপর থেকে অন্দরমহলের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখেন নি। মাইনের প্রায় পুরো টাকাটাই তিনি পরিবারের জন্যে খরচ করতেন। রোজ থলি হাতে বাজারে গিয়ে ভালো ভালো তরিতরকারি বড় বড় মাছ কিনে আনতেন। মাসকাবারি বাজার আনতেন দু-হাতে বড় বড় চটের থলি ঝুলিয়ে।

কিন্তু নিজে রোজ দুবেলা খেতেন এক গুঁছা পাইস হোটেলে।

হাজার চোখের জলেও তাঁর গোঁ ভাঙা যায় নি।

কিন্তু যেটাতে সবাই খুব কষ্ট পেত, সেটা হল আড়ত থেকে তাঁর কয়লা আনার ধরনে। পিঠ কুঁজো করে প্রকাণ্ড একটা কয়লার বস্তা সারা পথ টেনে আনবার পর বাড়ির দোরে এসে তিনি হাঁপাতেন। দেখে

রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে যেত। তারা বলাবলি করত, ভদ্দরলোকের কি মাথা খারাপ?

জ্যাঠামশাই কিন্তু সেটাই চাইতেন। লোকে দেখুক, ছি ছি করুক। তাতেই ছিল ওঁর আনন্দ।

এই নেবুতলার গলিতেই আমি প্রথম দেখেছিলাম হাপু-গান। খালি গা। হাতে একটা চাবুক। দু-কলি গান গাইছে আর তারপরই নিজের কালশিটে-পড়া পিঠে চাবুক মারতে মারতে মুখে আওয়াজ তুলছে: হা-পু! হা-পু!

ছেলেবেলায় কাউকে হাপু গাইতে দেখলেই আমার বাড়িওয়ালা জ্যাঠামশাইয়ের কথা মনে পড়ে যেত।

একটা হাফ-হাতা ফতুয়া আর হাঁটুতে-এসে-ঠেকা একটা আট-হাতি ধুতি। এই ছিল জ্যাঠামশাইয়ের পোশাক।

বারমহলের এই উদ্ভট আচরণ কিছুতেই ঠেকাতে না পেরে অন্দর-মহল শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছিল। বারমহলের সাধ করে ডেকে আনা দুঃখ দেখে দেখে অন্দরমহলের অনুভূতিতে এক সময়ে নিশ্চয় ঘাঁটা পড়ে গিয়েছিল.

জ্যাঠামশাই যখন টেঁটি গামছা পরে বাইরের রোয়াকে বসে এইটুকু একটা শালপাতায় একটা করে বেগুনি ফুলুরি দিয়ে প্রাতরাশ সারছেন, তখন তাঁকেই দেখিয়ে দেখিয়ে ফুলবাবু সেজে তাঁর বড় ছেলে ময়রার দোকান থেকে এক চাঙাড়ি সিঙাড়াকচুরি আর গরম জিলিপি নিয়ে ড্যাং-ড্যাং করে অন্দরমহলে ঢুকত।

তাতে জ্যাঠামশাইয়ের এতটুকু ভাবান্তর হত না। ছেলেদের এত সব বারফাট্টাই, অন্দরমহলের এত যে কুটানি—সবই তো তাঁর টাকায়। তাতে তিনি একটুও কাতর নন। বরং তাতেই তাঁর আনন্দ। পাড়ার লোকে দেখুক। টিটকিরি দিক।

জ্যাঠামশাইকে পাড়ার লোকে হাড়কিপ্‌টে ভাবলেও আসলে তিনি মোটেই কঞ্জুষ ছিলেন না। নিজেকে বঞ্চিত করে তিনি চাইতেন মুক্ত-

হস্তে খরচ করে বউ-ছেলেদের সুখী করতে। এই চাওয়ার মধ্যে কোনো খাদ ছিল না।

খিঁচ ছিল শুধু একটা জায়গায়।

জ্যাঠামশাই শুধু চাইতেন তাঁর দুঃখ দেখে ওরা ওঁর জন্যে একটু দুঃখ-বোধ করুক। একটু চোখের জল ফেলুক।

এই নিয়েই ছিল যত ল্যাঠা। জ্যাঠামশাই চাইতেন জ্যাঠাইমা তাঁর হাবভাবে শুধু একটু বুঝিয়ে দিন যে, তাঁকে কষ্ট পেতে দেখে মনে মনে উনিও কিছুটা কষ্ট পাচ্ছেন।

জ্যাঠাইমাও ছিলেন তেমনি ঢ্যাঁটা। দিনভর হাসি-আনন্দে অন্দর-মহলটাকে তিনি সরগরম রাখতেন।

নিজের কষ্টে আর কৃচ্ছ্রতায় জ্যাঠামশাই যে আনন্দ পেতেন, তাতে জ্যাঠাইমার দুঃখকে পরোয়া না করার ভাবটা সব সময় কাঁটার মতন বিঁধে থাকত।

নেবুতলার সেই গলি আজও ঠিক তেমনিই আছে।

কলকাতা থেকে বাঙালিদের হটাবাহার হওয়ার প্রক্রিয়া এই গলির পুরনো বাসিন্দাদের কত অংশকে উৎখাত করে সে জায়গায় অবাঙালি বানিয়াদের এনে বসিয়েছেন সে-খবর আমার জানা নেই।

জ্যাঠামশাইদের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওপরের ভগ্নপ্রায় গাড়িবারান্দাটার দিকে জুল জুল করে তাকাই। পুরনো দিনগুলোর জন্যে মন কেমন করে। নিচের হাফ-দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে পিছিয়ে আসি। ও-বাড়ির আজকের মানুষেরা কেউই আজ আমাকে চিনবে না। আর যদি এমন হয় যে, ও-বাড়িটা বড়লোক অবাঙালি বেহাত করে নিয়েছে—তাহলে কলকাতার ওপর হয়ত আর আমার সে টান থাকবে না।

যেতে যেতে ছেলেবেলার স্মৃতি হাতড়ে ভাববার চেষ্টা করি এ গলিতে এখন কী নেই।

নেই মুসলমান শালকরদের সেই দোকানগুলো। নেই হেলানো বাঁশের গায়ে টান করে বাঁধা দড়িতে শুকোতে-দেওয়া রংবেরঙের সেইসব শাল-আলোয়ান, যা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রংচঙে জাপানি পাখার মতো আস্তে আস্তে নড়েচড়ে এ-গলিটাকে হাওয়া করত।

নেই প্রকাশ্যে প্রকাণ্ড কড়াইতে ফুটন্ত রসে জিলিপি ভাজতে ভাজতে এক হাতে গামছা দিয়ে ঘাম-মোছা খালি গায়ে ভুঁড়ি-বার-করা সেই ময়রা ; তার বদলে আজ বানানো মিষ্টিগুলো যেন ফুসমন্তরে উড়ে এসে চুপচাপ কাঁচের বাক্সে জুড়ে বসে।

নেই ফরাস-পাতা কবিরাজ মশাইয়ের সেই বৈঠকখানা, যেখানে রুগীর চেয়ে বেশি আসত পাড়ার যত গপ্পবাজ লোক।

খোলার বস্তি আজও আছে, কিন্তু সেইসব পেটমোটা হালুইকর, রোগা রোগা ডকের খালাসি, জলকলের মিস্ত্রি, ঘণ্টা-নাড়ানো টিকিঅলা পুরুত, বিচিত্র সব জিনিস-বেচা ফেরিওয়ালা আর আলুকাবলিওয়ালা—তারা সব গেল কোথায় ?

চুনসুরকির দোকানের পাশে থাকত কাবলিওয়ালারা। তারা এ-গলি থেকে অনেকদিন আগেই উবে গেছে।

আজকের কথা থাক। পুরনো কথার খেই ধরে এবার শুরু হবে আমার শৈশবে এই শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার গল্প।

৫

বিদায়, কলকাতা

বিদায়, কলকাতা!

না, একথা বলবার বা বোঝবার মতো তখনও আমার বয়স হয় নি। কোথাও একটা যাচ্ছি। একেবারে চাটি-বাটি উঠিয়ে। এটা নিশ্চয় বুঝেছিলাম। তাতে ছিল যাওয়ার আনন্দ।

কিন্তু ছেড়ে যাওয়ার বিষাদ? ছিল কি? মনে পড়ে না।

কেন থাকবে? বাবা মা দাদা দিদি। ঠাকুর্দা কাকারা। প্রিয়জনেরা সবাই সঙ্গে যাচ্ছে। থেকে যাচ্ছে বটে নিচের তলার জ্যাঠাইমা। মালুদা পুলিনদা ছোটুদা গোপালদা। বাড়িওয়ালা জ্যাঠামশাই। কী দরকার জ্যাঠামশাইয়ের নিজের হাত পুড়িয়ে বেঁধে খাওযাব? নিজে পিঠে করে কয়লাব বস্তা বয়ে আনাব? জ্যাঠাইমা তো আরেকটু নরম হলেই পাবেন?

মোহনদা? মোহনদা থাকল। আর তার মুখের পান।

ঢোলগোবিন্দ-র এসব ভাববার কথা নয়! নাকি তার হয়ে আমি এসব ভাবছি।

ছোটদের মনগুলো কিন্তু অদ্ভুত। মুখ ফুটে না বললেও অনেক কিছুই তারা বোঝে। বুঝুক না বুঝুক, টের পায়। বড়রা সেসব ধরতেই পারে না।

বড় হয়ে ঢোলগোবিন্দ-র ঘাড়ে একবার নভেল লেখার ভুত চেপেছিল। কথায় আছে না, কত শখ যায় রে চিতে!

প্রথম পরিচ্ছেদটা লিখে ফেলেছিল। নেবুতলাব সেই গলিটার কথা।

কিন্তু চুট্‌কির বেশি লেখা এগোয় নি।

লিখলে নেবুতলার জ্যাঠামশাই হতেন তার প্রধান চরিত্র।

তার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল। কেননা সে ধারণা করে নিয়েছিল যে, জ্যাঠামশাইকে সে হাড়হদ্দ বুঝে গিয়েছে। ছাই।

তবে এটা ঠিক যে, জ্যাঠামশাইয়ের মতো এমন বেয়াড়া মানুষ ঢোলগোবিন্দ তার বয়সকালে দুটো দেখে নি। কিন্তু তাই বলে জ্যাঠামশাইকে বুঝে ফেলবে একটা দুধের বাচ্চা, তা কখনও হয়? আর তাই নিয়ে নাটক নভেল?

মনে মনে একটা প্লটও দাঁড় করিয়ে ফেলেছিল। সেটা এই:

ইংরিজি বছরের প্রথম দিন। পয়লা জানুয়ারি। দোতলাটা খালি করে ভাড়াটেরা চলে গিয়েছে।

সকালে ময়দানে প্যারেড হয়। শহরসুদ্ধু লোক ভেঙে পড়ে। এ-বাড়ির আর কেউ দেখতে যাক না-যাক, পুলিনদা যাবেই।

পুলিনদা জ্যাঠামশাইয়ের ঠিক উল্টো। কলেজে পড়ে। বার্ডসাই খায়। স্নো-পাউডার মাখে। কাপড়জামার খুব বাহার। হালকা জিনিসও কুলির মাথায় চাপিয়ে আনে। কলেজের বইও পারলে অন্যকে দিয়ে বওয়ায়।

আসলে জ্যাঠাইমাই পুলিনদাকে জ্যাঠামশাইয়ের ঠিক বিপরীত চরিত্র হিসেবে গড়ে পিটে বানিয়েছেন। উদ্দেশ্য হল, ছেলেকে আদর দিয়ে মাথায় চড়িয়ে জ্যাঠামশাইকে এক হাত নেওয়া।

এই থেকে বুঝুন, ঢোলগোবিন্দ কি রকমের পাকা।

যাক গে যাক, আবার সেই নভেলের কথায় আসি।

বাড়ির লোকে তো জানে, পুলিন কাকভোরে ঘুম থেকে উঠে সেজেগুজে গেছে প্যারেড দেখতে।

এদিকে বেলা বাড়ছে। পুলিন আর আসে না।

বচ্ছরকার দিন বলে জ্যাঠামশাই চাঙাড়িভর্তি খাবার এনেছেন বউ-ছেলেদের মিষ্টিমুখ করাবার জন্যে। তারপর গেছেন বাজারে। নাতি-

নাতনিদের নিয়ে মেয়ে জামাই আসবে দুপুরে খেতে। তাদের জন্যে কিনে আনতে গেছেন ভেট্‌কি আর তপ্‌সে। জামাইয়ের জন্যে কচিপাঁঠারমাংস।

দুপুর গড়াতে যায়। মেয়ে জামাইরাও এদিকে ফিটনে চেপে গেঁড়িগুগ্‌লিদের নিয়ে আহিরীটোলা থেকে এসে হাজির।

তখনও পুলিনদার দেখা নেই।

এরপর আসবে একটা ভয়ঙ্কর শোকের ঘটনা।

বাচ্চারা কেউ খেলতে খেলতে ভাড়াটেদের খালি দোতলায় উঠে যাবে। তারাই কেউ কোনো একটা ঘরে সিলিং থেকে ঝুলন্ত পুলিনদার নিষ্প্রাণ দেহ আবিষ্কার করে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠবে।

একটু মেলোড্রামার দিকে ঝুঁকছিল বলে ঢোলগোবিন্দ ভয়ে আর এগোয় নি। আত্মহত্যার সঙ্গে নারীঘটিত ব্যাপার জুড়ে দিতে না পারলে আর নভেল হয় কেমন করে? কাজেই সে কথাও সে ভেবেছিল। ধরা যাক, ভাড়াটেদের একটি মেয়ে ছিল। তার প্রতি ছিল পুলিনদার হৃদয়দৌর্বল্য। তার চলে যাওয়ার আঘাত পুলিনদা সামলাতে পারে নি।

গল্পের গরু গাছে ওঠেই বটে।

ঢোলগোবিন্দ যদি তার দিদির কথা মনে রেখে এরকম গল্প ফাঁদে, তাহলে তাকে কমসে কম ষোড়শী তরুণী বানাতেই হয়। কিন্তু দিদির বয়স যে তখন মেরে কেটে সাত কি আট।

আর পুলিনদা তখনও জলজ্যান্ত বেঁচে। কর্পোরেশনে রীতিমত ভালো চাকরি করছে।

বানানোরও তো একটা সীমা থাকবে।

ঢোলগোবিন্দ-র এসব অবিমৃষ্যকারিতার কথা আজ অবশ্য অকপটে সব বলা যায়। আজ না আছে পুলিনদা বেঁচে, না আছে তার দিদি।

নভেলে মালুদার জন্যেও বেশ খানিকটা জায়গা ছাড়ার কথা ঢোলগোবিন্দ ভেবেছিল।

বড় হয়ে মালুদা যখন বিয়ে থা করে থিতিয়ে বসেছে, তখন হঠাৎ একদিন তার মাথার পোকা নড়ে উঠল। ওদের পরিবারের কে যেন

ছিলেন এক বিশাল সম্পত্তির অধিকারী। তাঁর ছেলে ছিল নিঃসন্তান। বছর তিরিশ চল্লিশ পরে জানা গেল, জ্যাঠামশাইয়ের ছেলেরাই সেই ভূসম্পত্তির নাকি বৈধ উত্তরাধিকারী। তবে সেই দাবি প্রতিপন্ন করতে আদালতে লড়ে যেতে হবে।

অন্য ভাইরা গা না করায় একা মালুদাকেই আদাজল খেয়ে লেগে পড়তে হল।

এটা করতে গিয়ে মালুদার যে কী হাড়ির হাল হয়েছিল বড় হয়ে ঢোলগোবিন্দ তা নিজের চোখেই দেখেছিল।

সেই মালুদাও আজ আর নেই।

ভাগ্যিস, ঢোলগোবিন্দ সেই নভেলটা লেখে নি।

ইস্টিশান। শেয়ালদা। সন্ধে গড়িয়ে গেছে। দাঁড়ানো রেলগাড়ি। কামরার মধ্যে উপুড়-করা গোটা সংসার।

সারাদিন ধকল গেছে খুব। গোছগাছ। বাঁধাছাঁদা। এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে ঘুরে দেখা। 'যা এখান থেকে' 'ডেঁপো ছেলেটাকে নিয়ে যাও তো' এমনিভাবে তাড়া খেয়ে খেয়ে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ানো। ফেলে দেওয়া পুরনো ক্যালেণ্ডার, সিগারেটের খালি প্যাকেট, বাস-ট্রামের টিকিট, ছেঁড়াখোঁড়া তাস, শিশিবোতলের ছিপি, ছাপা ছবি—ঢোলগোবিন্দ তুলে বেছে দেখে সবার অলক্ষ্যে কোন্‌টা তার নিজের কাছে রেখে দেওয়া দরকার।

ফলে গাড়ি যখন ছাড়ল তার আগেই বুকের কাছে ব্যাঙের আধুলির মতন একটা পুঁটুলি দু হাতে বুকে আঁকড়ে ধরে ঢোলগোবিন্দ তখন ঘুমিয়ে ঢোল।

গাড়ির দুলুনিতে ঘুমটা হয়েছিল বেশ গাঢ়। তাই মাঝরাত্তিরে মা যখন তাকে ঝাঁকিয়ে তুলে দিয়েছিলেন, তখন তার বেশ কিছুক্ষণ লেগে গিয়েছিল কোথায় সে আছে সেটা বুঝতে।

পরক্ষণেই কানের পরদায় এসে ঘা দিয়েছিল একটা ভয়তরাসে গুম-

গুম শব্দ। মা বলেছিলেন, এই হল সাড়া ব্রিজ। ট্রেন এখন পদ্মার ওপর দিয়ে যাচ্ছে।

বলে আমাদের হাতে হাতে গুঁজে দিয়েছিলেন একটা করে তামার পয়সা। নে, জয়-মা-কালী বলে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দে।

জানলা দিয়ে তাকিয়েছিলাম বাইরে। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। ব্রিজের বড় বড় থাম্বাগুলো জানলার গরাদ ভেঙে পালানো আলো-গুলোকে বগলদাবা করে উলটোমুখে ছুটে পালাচ্ছিল। সেই সঙ্গে সমানে গাড়ির চাকায় গুম-গুম শব্দ।

তার মধ্যে আমাদের ছুঁড়ে দেওয়া পয়সাগুলো সোঁ-সোঁ শব্দে কারা যেন হুশ করে টেনে নিচ্ছিল।

রাত্তিরটা ছিল কেমন যেন পৈশাচিক।

তারপর আস্তে আস্তে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিছুতেই আমার আর ঘুম আসছিল না। চোখ খুলতে পারছিলাম না ভয়ে। এমন মিশকালো অন্ধকার আমি জীবনে দেখি নি। যেখানে যাচ্ছি এমনি অন্ধকার কি সেখানেও? বলে দিচ্ছি, আমি কিন্তু ভয় পাব।

ভয়ত্রাসে সেই অন্ধকার ঢোলগোবিন্দ-র বন্ধ-করা চোখের ওপর হাত দিয়ে চাপড়ে চাপড়ে এক সময় ঘুম পাড়িয়ে দিল।

একরকমের পাতলা ঘুম আছে যাতে ছেঁড়া কাপড় জুড়ে জুড়ে কাঁথা সেলাইয়ের মতো স্বপ্ন দেখায়।

ঢোলগোবিন্দ দেখে—

চীনেম্যানদের পাড়ায়—চীনেম্যান? চীনেম্যান আবার কী? ওই যে গো, মাথায় টুপি দিয়ে পিঠে রেশমি কাপড়ের বস্তা নিয়ে বাড়ি বাড়ি ফেরি করে বেড়ায়—ছেলের দল যাদের দেখলেই চ্যাং-চুং-চীনেম্যান বলে খ্যাপায়—সাহেব অথচ সাহেব নয়—কুতকুতে চোখ—হ্যাঁ গো…

সেই চীনেম্যানদের পাড়ায় মস্ত এক বাড়ি। মস্ত বলতে? তিনতলা। চারতলা। নাকি তার চেয়েও উঁচু?

ঢোলগোবিন্দ-র স্বপ্নে সব কেমন ভাসা ভাসা। সবকিছুরই একটা উড়ু-উড়ু ভাব। লেপ করতে এসে ধুনুরিরা টোয়াঙ-টোয়াঙ শব্দ তুলে যখন তুলো ধোনে, তখন যেমন পেঁজা তুলা তাদের মাথার ওপর ফুরফুর করে ওড়ে, ঢোলগোবিন্দ-র স্বপ্নগুলোতে তেমনি ছাড়া-ছাড়া একটু ফুরফুরে ভাব।

আর সেই চাঁনেপাড়ার বড় একটা বাড়ির জলের পাইপ বেয়ে হুইসেল বাজাতে বাজাতে হুড়মুড় করে নেমে পালাচ্ছে, ওরা কারা?

পরনে খাঁকির উর্দি। পট্টি-বাঁধা পায়ে বুট। কোমরে মোটা চামড়ার বেল্ট। মাথায় টুপি।

আরে দূর, ও তো আমার বাবা। আর উনি দীনেশ জ্যাঠামশাই। দুজনেই ঢ্যাঙা। বাবা অনেক ছিপছিপে। জ্যাঠামশাইয়ের গা-টা আরেকটু ভারি। দুজনেরই মাথায় কোঁকড়া চুল। সোজা সিঁথি। ধবধবে গায়ের রং। খাঁকির উর্দি পরলে দুজনকেই ঠিক ট্যাশফিরিঙ্গির মতো দেখায়।

বাবা ছোট দারোগা। দীনেশ জ্যাঠামশাই বড় দারোগা। কোমরে কারো পিস্তল নেই। থাকবে কেন? পুলিশ তো নয়। আবগারির লোক বুক পকেটে শুধু একটা হুইসেল।

কী যেন নাম? মীনা পেশোয়ারি। ডাকসাইটে স্মাগলার। বাড়ি কী? যেন ঝকঝকে প্রাসাদ। দেয়ালগুলো ফাঁপা। তার মধ্যে থাকে চোরাই আফিং চরস আর সোনার বাট।

ঢোলগোবিন্দ তার স্বপ্নে মীনা পেশোয়ারিকে দেখে। ঢোলা পাজামা, ঢোলা পাঞ্জাবি, মাথায় ছোট্ট শিরপ্যাঁচ পাগড়ি। নেবুতলার গলির মোড়ে আগা-খাঁ নামের যে কাবুলিরা থাকে, যেন তাদেরই একজন।

দেয়ালে হাত বুলোতেই তার আঙুলের ডগায় (কী মোটা মোটা আঙুল রে, বাবা) উঠে এসেছে তাড়া তাড়া নোটের সব ইয়া ইয়া পেট-মোটা টাকার বাণ্ডিল।

হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়ে বাছাধন এবার বাঁচতে চাইছে।

টাকা? কাকে টাকা দেখাচ্ছে মীনা পেশোয়ারি?

নিচে খৈনি মুখে দিয়ে অপেক্ষা করছে লাঠিহাতে এক ডজন আবগারি পুলিশ।

হুইসেলে ফুঁ দেবার আগেই মীনা পেশোয়ারির হাতে ঝিকিয়ে উঠেছে পিস্তল। পেছনে দরজা বন্ধ। পালাবার একটাই রাস্তা। বারান্দা থেকে লাফিয়ে জলের পাইপটা ধরে ফেলা। তারপর রাস্তায় নেমে চোঁ-চোঁ দৌড়।

হুঁ। এমনি কড়া মানুষ হল গিয়ে ঢোলগোবিন্দ-র বাপ ক্ষিতীশ মুখুয্যে আর জ্যাঠামশাই দীনেশ সেনগুপ্ত। যারা আবগারিতে থেকেও জীবনে এক কানাকড়িও ঘুষ নেয় নি। সোজা কথা!

স্বপ্নটা হুবহু এইরকম ছিল কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তবে সে কি আজকের কথা?

বলে ভোরের স্বপ্ন সকালেই মনে থাকে না, তার আবার ষাট বছর আগে দেখা স্বপ্ন। ধ্যুৎ!

ভোরাই

মা যখন ঝাঁকিয়ে নড়া ধরে টেনে তুলে দিলেন ট্রেন তখন স্টেশনে সবে থেমেছে।

প্ল্যাটফরমের ওপর ডাঁই-করা লটবহর।

স্টেশনের নাম সান্তাহার জংশন।

তখনও রাত ফরসা হয় নি। ল্যাম্পোস্ট চিমনিতে ঢাকা তেল ফুরিয়ে আসা কেরোসিনের নিবু-নিবু আলো।

স্টেশন থেকে ট্রেনটা ছেড়ে চলে যেতে ঢোলগোবিন্দ-র চোখে পড়ল, রেললাইনের অনেক উঁচুতে একটা ওভারব্রিজ যেন কোনো যাদুমন্ত্র-বলে মাধ্যাকর্ষণের টান কাটিয়ে পৃথিবীর হাত ছেড়ে দিয়ে একেবারে শূন্যে আড় হয়ে শুয়ে আছে।

পরে এই স্টেশনের ধারেই ঢোলগোবিন্দ আবিষ্কার করেছিল সার-সার এমন সব লোহার খাঁচা, যার মধ্যে আড়কাঠির দল ধলভূম সিংভূম মানভূম থেকে কালোকালো মানুষদের ফুস্‌লে এনে জন্তুজানোয়ারের মতন গাদাবন্দী করে রাখত। তারপর লোহার শিক-লাগানো মাল-গাড়িতে চাপিয়ে চা-বাগানের কুলিকামিন করার জন্যে তাদের কাউকে পাঠাত তরাইতে, কাউকে আসামের জঙ্গলে।

কিন্তু আসল কথা সেটা নয়!

আদত কথা হল এই যে, সান্তাহার জংশনে একগাদা লটবহরের মধ্যে মা-র আঁচল ধরে শীতে জবুস্থবু হয়ে কোলে বসে ছেলে ঢোলগোবিন্দ দেখেছিল তার জীবনে রাত পুইয়ে সেই প্রথম সকাল হতে। আঃ, জীবনের প্রথম সকাল!

লোক না, জন না। গাড়ি না, ঘোড়া না। আমাদের স্বস্থানে নিয়ে যাবার জন্যে ঘুম ভেঙে শীতের কুয়াশা ভেদ করে ইস্টিশানে কেউই তখনও পৌঁছে উঠতে পারে নি।

ভাগ্যিস!

নইলে অমন স্বর্গীয়ভাবে সকাল হতে জীবনে আর কখনও কি দেখতে পেতাম? মনে হয়, না।

রাত্তিরে যে অন্ধকার দেখে ঢোলগোবিন্দ ভয় পেয়েছিল, সে অন্ধকারও তার জীবনে সেই প্রথম। নেবুতলার গলিতে তেমন অন্ধকার কোনোদিনই সে দেখে নি। গ্যাস আর বিজলির আলোয় রাত সেখানে দিন হয়ে থাকত।

চায়ের কড়া লিকারে একটু একটু করে দুধ ঢাললে যেমন হয়, চোখের সামনে তেমনি করে বদলে যাচ্ছিল অন্ধকারের রং। যেন এতক্ষণ কাগজে কালি পড়েছিল, ব্লটিং পেপার দিয়ে কেউ তা শুষে নিচ্ছে।

মাথার ওপর আকাশ যে কত বড় হয়, ঢোলগোবিন্দ তাও কি ছাই জানত? আকাশ দেখেছে সে বড়জোর দোতলার চাতাল থেকে। যেন জ্যামিতির চতুর্ভুজ কোনো নকশা।

রাত ফরসা হওয়ার পর সূর্য ওঠার সম্ভাবনায় ডানদিকে রেলওয়ে লোকোশেডের মাথার ওপর লাজুক আকাশের গাল যখন সবে লাল হতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই লোকজন নিয়ে হই-হই করতে করতে আমাদের নিতে এসে গেলেন দীনেশ জ্যাঠামশাই।

যাচ্ছি নওগাঁয়।

পরে ভূগোলের বইতে পড়েছি—সান্তাহার থেকে বেরোলেই বগুড়া জেলা ছেড়ে রাজশাহীতে পা দেওয়া।

সেটা ছিল ইংরিজি বছরের প্রথম দিন। নতুন বছরের একেবারে পয়লা দিনেই নতুন জায়গায়।

জেলা বদলে ছুটে চলেছে মাথায় ছত্রিবিহীন একঘোড়ার আর দু-চাকার টমটম। দাদার 'হাসিখুশি'র পাতা থেকে উঠে আসা সেই 'এক্কা-

গাড়ি খুব ছুটেছে।' ভয়ে চুপটি করে মার কোলের মধ্যে দু-হাঁটু আঁকড়ে বসে আছি।

দু পাশে তাকিয়ে সব গিলছি। আকাশে মেঘের খেলা। ধু ধু করছে মাঠ। আঁটি-আঁটি খড়। মাটির বাড়ি। ডোবাপুকুর। রাস্তার ধারে শিশিরে ভেজা ঘাস। বড় বড় রেন্ট্রি গাছ। টেলিগ্রাফের তারে বসা ল্যাজঝোলা পাখি।

স্থানীয় কেউ মাকে সব চেনাতে চেনাতে যাচ্ছিল।

এই হল পার-নওগাঁ। ছোট্ট বসতি। এবার আসবে ব্রিজ। এই হল যমুনা নদা। দেখবেন এর কী চেহারা হয় বর্ষায়।

ব্রিজের ওপর টমটমের চাকায় আবার সেই পিলে-চমকানো গুম-গুম আওয়াজ।

নিচে নেমে ডানহাতে পোস্টাপিস। রাস্তা চলে গেছে সোজা। বাঁদিকে অবিনাশবাবুর সোডাকল। সরকারি হাসপাতাল ছাড়িয়ে ডানহাতে দেখছেন মস্ত পাঁচিল। এই হচ্ছে গাঁজা-গোলা। বছরের একটা সময় পুড়িয়ে নষ্ট করা হবে বাড়তি গাঁজা। গন্ধে সারা শহরের লোক তখন নাকে কাপড় চাপা দেবে আর খকখক করে কাশবে। গাঁজার শহর নওগাঁ। জানেনই তো।

তারপর এস-ডি-ও-র বাঙলো, পেছনে নদী।

এই হচ্ছে ট্রেজারি। বারান্দায় অষ্টপ্রহর বন্দুক হাতে সেনট্রি। সন্ধেবেলায় ওর ধারকাছ দিয়ে যেই যাক, অমনি চ্যালেঞ্জ করে হেঁকে উঠবে —হুকামদার। সঙ্গে সঙ্গে যদি না বলেন 'ফ্রেণ্ড', গুলি মেরে আপনাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে। অমন কত ঘটেছে।

বাঁয়ে দেখুন, মুনসেফবাবুর বাংলো। মাঠের পেছনে কালীবাড়ি। পাবলিক লাইব্রেরিও ওখানে।

এই যে কে-ডি হাইস্কুল। জানেন তো, ছোটকাকাবাবু এই ইস্কুলেই ভর্তি হবেন।

আর ঐ যে সামনাসামনি উঁচু দেয়াল দেখছেন, ওটা জেলখানা। ওর

পেছনে দারোগাবাবুর বাসা।

ইস্কুলের পাশ দিয়ে বাঁদিকে ঘুরে এবার পশ্চিমমুখো সোজা রাস্তা। মোড়ে মিষ্টির দোকানের পাশ দিয়ে গেলে ডানদিকে উকিলপাড়া; বলিহারের রাজবাড়িও পাবেন ওই রাস্তায়।

টমটমের দোলানি। ঘোড়ার গলায় টুং-টাং। টুং-টাং।

মা, আমার ঘুম পাচ্ছে।

আর এই তো এসে গেলাম, সোনা।

মেসবাড়ির ঠিক পরেরটাই আমাদের কোয়ার্টার। সামনে লম্বা তারের বেড়াটা পেরিয়ে সদর রাস্তা। তারপর সরকারি পুকুর। পুকুর আর রাস্তার মাঝখানে তে-কাঠির মতো উঁচু-উঁচু লোহার বীম পুঁতে গদাম-গদাম শব্দে পিটিয়ে মাটিতে সেঁধিয়ে দিচ্ছে লম্বা লম্বা পাইপ। বুঝলেন, ওখানে টিউবকল হবে।

মেসবাড়ির এ-কোণে থাকেন দীনেশ জ্যাঠামশাই। জ্যাঠামশাই ইন্‌সপেক্টর তো। বিরাট বড় বড় ঘর। ভেতরের উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘর। ভাঁড়ারঘর। সবই বড় মাপের।

বাবা সাব-ইন্‌সপেক্টর। আমাদের কোয়ার্টারগুলো তাই জোড়া জোড়া। পার্টিশান-করা ইঁদারার আধখানা এদিকে, আধখানা ওদিকে।

বাড়ির পেছনে কাটা ঝিল। সবদিক সমান গভীর নয়। উত্তর-দিকটাতে খেলার মাঠে যাবার একটা সরু আলরাস্তা। শীতের দিনে ওদিকটাতে জল থাকে না। নিচে নেমে লুকোচুরি খেলা যায়। খিড়কির দিকটাতে তাবৎ বাড়ির ময়লা ফেলার জায়গা।

দীনেশ জ্যাঠামশাইয়ের স্ত্রী মা-র চেয়ে ছোট বলে আমরা কাকিমা বলতাম। ধবধবে ফরসা গায়ের রঙ। ভারি সুন্দর মুখশ্রী। একহারা গড়ন। মা-র সঙ্গে দেখা হতেই কাকিমার খুব ভাব হয়ে গেল। কাকিমা ছায়ার মতন মা-র সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।

ইংরিজি বছরের প্রথম দিন। আজ আর আমাদের বাসায় উনুন

জ্বলবে না। সকালে চা-পর্ব দিয়ে শুরু করে জ্যাঠামশাইদের বাড়িতে দুবেলা ধুমধাড়াক্কা খাওয়া। কাকিমার এইটুকুনি মেয়ে মঞ্জু। কী মিষ্টি দেখতে। তার ওপর হালকা। তাকে কোলে নেবার জন্যে আমাতে আর দাদাতে কী টানাটানি।

জ্যাঠামশাইরা সকালে খেতেন পেলেটির পাঁউরুটি। আঃ, যেমনি গন্ধ তেমনি সুতার। কেটে খোলা হল নতুন থিন-অ্যারারুটের টিন। তার চারপাশ দাঁতমল কাটা চুড়ির মতো। নিচু হয়ে সেই টিনে নাক লাগিয়ে আমরা বুক ভরে নিশ্বাস নিলাম।

কলকাতা থেকে নওগাঁয় গিয়ে এক অজানা নতুন জগতে যেন সেই প্রথম পা দিলাম।

কোয়ার্টারে আমাদের ছোট ছোট তিনটে ঘর। ষাটের কোলে মাথা-গুনতিতে লোক আমরা খুব কম নই। বাবা-মা। ঠাকুর্দা। মেজোকাকার তখনও বিয়ে হয় নি। সেজোকাকা ছোটকাকা দাদা-দিদি আমি।

গোছগাছের বড় একটা কিছু ছিল না। পায়াগুলোর নিচে ইঁট দিয়ে উঁচু করে ঘরে ঘরে কয়েকটা তক্তপোশ ফেলে তার তলায় টিনের ট্রাঙ্ক রেখে ঘরের জায়গা বাঁচানো। জায়গার অভাবে বাইরের ঘরে মা-বাবার বিয়ের খাট। বাবার সরকারি টেবিল আর একটা চেয়ার। উপরন্তু কাঠের একটা বেঞ্চি।

সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়িতে দরজা-জানলায় পরদা টাঙানোর রেওয়াজ তো দূরের কথা, বাড়িতে শাড়ির নিচে শেমিজ কিংবা ব্লাউজ পরারও সে সময়ে চল ছিল না। মঞ্জুর মা, অর্থাৎ কাকিমা, সে সব অবশ্য পরতেন।

কাকিমার দেশ ছিল বরিশাল। ঘটি আর বাঙালদের মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদে কিছুটা ইতরবিশেষ ছিল। এপারের ফতুয়াটা ওপারে ছিল নিমা। নিমার কাঁধদুটোতে কুঁচি দেওয়া থাকত। ঠিক কোন জায়গায় জানলেও আজ আর মনে নেই। জ্যাঠামশাইদের ঢাকার সোনারং। ওঁরা সব শিক্ষিত বড়-ঘরের মানুষ। জ্যাঠামশাইয়ের বোন বুলুপিসিমা গ্র্যাজুয়েট তো ছিলেনই, ল' পাসও করেছিলেন। করলে কী হবে, মাস্টারি

বা ওকালতি কিছুই তাঁর জীবনে করা হয় নি। বয়স্ক বাবা, অসুস্থ ভাই, ভাইপো, ভাইঝি—এদের সামলাতে সামলাতেই একদিন বুড়ো হয়ে গেলেন। জীবনে বিয়ে করাও আর হয়ে উঠল না।

দেয়ালে ফটো বলতে গোড়ায় শুধু ছিল সেরেস্তাদার থাকার সময় হাকিম আর আমলাদের নিয়ে পেছনে-দাঁড়ানো ঠাকুর্দার একমাত্র গ্রুপ-ফটো। পরে অবশ্য আপিসের ফেয়ার ওয়েল, কলেজের ফুটবল টিম, পরিবারের কারো মৃত্যু ইত্যাদি সূত্রে এই গ্রুপফটোর সংখ্যা একটা দুটো করে ক্রমশ বাড়তে থাকে। দেয়ালের বাকি সবটাই ছিল হয় ঠাকুর-দেবতাদের ছবি, নয় রং-বেরঙের ছাপা ক্যালেণ্ডারে ভর্তি।

বাবার একটা দুর্বলতার কথাও এই উপলক্ষে জানিয়ে রাখি।

একসময়ে বেআইনি আর বেকানুনি লোকেরা সবাই রীতিমত জেনে গিয়েছিল যে, আর যেই হোক ক্ষিতীশবাবু ঘুষের কারবারে নেই। টাকাপয়সার রাস্তায় গেলে সুবিধে করা যাবে না। সুতরাং তারা কিছুদিন ধরে অবশ্যই বাজিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিল নগদনারায়ণের বদলে ঘুরিয়ে কিছু করা যায় কিনা। বলা যায় না, তাতে হয়ত অজান্তে ফাঁদে পা পড়লেও পড়তে পারে।

বাবার নাক ছিল বেশ লম্বা। হাজার চাপাচুপি দিলেও, কোনো কিছুতে ঘুষের নামগন্ধ থাকলে ঠিক তিনি ধরে ফেলতে পারতেন। এসব ব্যাপারে বাবার সাংঘাতিক রকমের শুচিবাই বাড়ির আর কেউ খুব একটা পছন্দ করত না। তারা বলত, আদর করে কিংবা খাতির করে কেউ যদি পুকুরের পাকা রুই, বাগানের ফল তরকারি কিংবা দোকানের দইমিষ্টি পাঠায়—সেটাকেও ঘুষ বলে ধরে নিয়ে পত্রপাঠ ফেরত পাঠানোর কোনো মানে হয়? এটা একটু বাড়াবাড়ি নয় কি? আরে বাপু, টাকা তো নয়। বাবার অসাক্ষাতে এসব কথা যখন হত, মা-ও তাতে সায় না দিয়ে পারতেন না।

অতই যদি হবে, এই যে নতুন বছরের ডাইরি-ক্যালেণ্ডার আর ছাপ-মারা রকমারি উপহারগুলোর জন্যে উনি যে হা-পিত্যেশ করে বসে

থাকেন, কেউ দিয়ে গেলে আহ্লাদে আটখানা হন—তাতে বুঝি কোনো দোষ হয় না ?

বাবার এই ছেলেমানুষিতে আমি আর দাদা বেশ মজা পেতাম।

হ্যাঁ, কথাটা হচ্ছিল দেয়াল সাজানোর ব্যাপারে। দেয়ালে গোড়ায় ছিল শুধু ঠাকুর্দার গ্রুপ-ফটো। সবেধন-নীল-মণি হলেও ফটোটাতে একটা মজা ছিল। ফটোর লোকগুলো দু সারিতে দাঁড়িয়ে বা বসে। একজন সাহেব আর চোখে পাঁসনেওয়ালা দু-একজন বাদে বাকি সবাইকে অবিকল একরকম দেখতে। মুখে চাপদাড়ি, টেরিহীন চুল, গায়ে একরঙা আচকান (ফটোতে সবই কুচকুচে কালো), পাশের দিকে বোতাম। কেউ একটু লম্বা, কেউ একটু বেঁটে, তফাত এই যা। দেখিয়ে না দিলে গ্রুপ থেকে ঠাকুর্দাকে খুঁজে বার করা রীতিমত শক্ত ছিল।

এর অল্প কিছুদিনের মধ্যে দ্বিতীয় আরেকটি ফটো এসে দেয়ালে ঠাঁই নিল। হাসি-হাসি মুখে মঞ্জুকে কোলে করে আছেন কাকিমা। দীনেশ জ্যাঠামশাইয়ের স্ত্রী।

কথা নেই বার্তা নেই, দুম করে অমন একটা ফটো এসে কেন আমাদের দেয়াল জুড়ে বসল, তার কারণটা পরে বলছি।

এদিকে নওগাঁয় পা দিয়ে প্রথমেই বাবার সম্বন্ধে লোকজনেরা এসে যা বলল শুনে আমরা তাজ্জব।

আমাদের নিয়ে আসার কিছুদিন আগেই বাবা নওগাঁয় এসে কাজে জয়েন করেছিলেন। এই একা থাকার সময় 'শীতবসন্ত' না 'বঙ্গে বর্গী, কী একটা নাটকে যেন বাবা গান গেয়েছিলেন আর 'অলীকবাবু' গোছের প্রহসনে করেছিলেন কোনো একটা কমিক রোল।

আমরা যখন গিয়েছি তখনও শহরের লোকের মুখে-মুখে ফিরছে বাবার গান গাওয়া আর লোক-হাসানোর কথা।

আমরা বাড়ির লোকেরা কিন্তু এই শোনা কথায় কখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারি নি। বাড়িতে একটু-আধটু গুনগুন করলেও থিয়েটারের

স্টেজে উঠে গলা ছেড়ে বাবা 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' গাইছেন, এ তো ভাবাই যায় না।

আর তার চেয়েও অবিশ্বাস্য ছিল কমিক রোলে বাবার অভিনয়।

বাড়িতে আমরা বাবাকে যমের মতো ভয় করতাম। বাবার ছিল টানা নাক। মুখচোখও ভালো। ঘন কোঁকড়া চুল। গায়ের রং সাহেব-দের মতো ফরসা। একটু লালচে। আমার কথা তো ওঠেই না, এমন কি আমার দাদা-দিদিরাও কেউ বাবার রং পায় নি। আমার মা কালো। আমিও কালো। বাবা আমাকে ডাকতেন 'কালো' বলে।

কিন্তু বাবা যে স্টেজে উঠে কমিক রোল করে মানুষকে হাসিয়েছেন! মরে গেলেও বাড়িতে আমরা কেউ এটা বিশ্বাস করে উঠতে পারি নি। তা ছাড়া আর দ্বিতীয়বার কখনও স্টেজে উঠে বাবা সেটা আমাদের সামনে হাতেনাতে প্রমাণ করেও দেখান নি।

হ্যাঁ, তবে একটা কথা। আমার দাদা কিন্তু যেমন ভালো গান গাইতেন, মানুষকে হাসাবারও ছিল তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা। আমার যে এক-মাত্র ভাইপো, জন্মাবার পর দাদাকে যে প্রায় দেখে নি বললেই চলে— সে কিন্তু গান গাইতে আর মানুষকে হাসাতে পারে। এ দুটো গুণ আমার ভাইঝিরও আছে। একে কি বলা যাবে বংশগতি? অথচ তা থেকে ছিটকে গিয়েছি আমি আর দিদি। তবু তো দিদি দেখতে ভালো ছিল।

সে যাই হোক, ছেলেবেলার সেই দিনগুলো ভারি আনন্দে কেটেছে।

সেসব কথা মনে পড়লে ইচ্ছে করে আবার তেমনি ছোট হয়ে যাই। তবে একা নই। তেমনি সবাইকে নিয়ে।

৭

কাকিমা ছবি হলেন

আমার যে অত সাধের নেবুতলার গলি, তাকে বেমালুম ভুলে যেতে আমার একটুও দেরি হল না।

তা ছাড়া, খোলা আকাশের নিচে সবুজে-মোড়া মাঠে-ঘাটে যে অবারণ মুক্তি, তার পাশে ইটকাঠ দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা নেবুতলার সেই এঁদো গলি কখনও দাঁড়াতে পারে?

গোড়াতেই ঢোলগোবিন্দ-র এটা কবুল করা উচিত ছিল যে, তার স্মৃতিশক্তিটা বড়ই দুর্বল। কবে কী ঘটেছিল, কার কী নাম—এসব তার মনে থাকে না। অথচ পুরনো কথা বলবার জন্যে তার নোলা সপসপ করে। আর সমানে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপায়। মনে না পড়লে যা-হোক একটা নাম বানিয়ে নেয়। তবে যা বলে তা গল্পকথা নয়।

ঢোলগোবিন্দদের পরিবারের কথা একটু বলে নেওয়া যাক। ওর মাতৃকুলে পিতৃকুলে এমন কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না যার নাম বললে লোকে চিনবে। ব্রাহ্মণ হলেও ওরা ভঙ্গকুলীন। গ্রামে ভগ্নপ্রায় ভদ্রাসন ছাড়া উঠবন্দী স্বত্বে একুনে মাত্র পঁচিশ একর প্রজাবিলি-করা জমি। তার জন্যে জমিদারকে নিয়মমতো খাজনা দিতে হয়।

নদীয়ার সীমান্তে যশোরের কোন্ এক স্বমিদ্রে গ্রামে নাকি ছিল ওদের আদিবাস। ওর ঠাকুর্দা কিংবা তাঁর বাবা বালবিধবা মায়ের হাত ধরে নদীয়ার লোকনাথপুর গ্রামে এসে অপুত্রক দিদিমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। ফলে, ঠাকুর্দার পিতৃকুলের সঙ্গে পরে আর কোনো সম্বন্ধই থাকেনি।

ওর বাপখুড়োরা চার ভাই চার বোন। সবচেয়ে বড় বনগাঁর

পিসিমা। তারপর বাবা। বাবার পর তিন বোন। সব বোনেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল ওরা নওগাঁয় যাবার আগে। মেজোপিসিমার আসানসোলে। কলকাতায় প্রসব হতে গিয়ে মেজোপিসিমা সেই যে পাগল হয়ে গেলেন, তারপর সে রোগ আর সারে নি। রাঁচির পাগলা-গারদেই শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হয়। সেজোপিসিমার বিয়ে হয়েছিল লোকনাথপুরের কাছেই নদী পেরিয়ে কুড়ুলগাছিতে। সম্ভবত রায়-বাড়িতে। সেজোপিসিমা অল্পবয়সে বিধবা হলেও আদরযত্নে শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন। ছোটপিসিমার বিয়ে হয় দত্তপুকুরের কাছে হৃদয়পুরের বিষয়সম্পত্তিবান গাঙ্গুলীবাড়িতে।

বড়পিসিমাকে ঢোলগোবিন্দ কখনও দেখে নি। বনগাঁর সঙ্গে এবাড়ির ঘনিষ্ঠতা হয়, বলতে গেলে, বড়পিসিমা মারা যাওয়ার পর। বড়পিসেমশাই ছিলেন পেশায় উকিল। ওর বাবার বংশে তখন অবধি একমাত্র বি. এ. পাস ওর ছোটকাকা। মেজোপিসেমশাইকে সে চাক্ষুষ করে দ্বিতীয়বার কলকাতায় ফেরার পর। পিসেমশাইদের মধ্যে উনিই ছিলেন একমাত্র রাঢ়ের লোক। সেজোপিসেমশাই মারা যান ওর জন্মের আগে। নওগাঁয় একমাত্র ছোটপিসেমশাইকেই একবার সপরিবারে আসতে দেখেছিল। কলেজে ভালো ছাত্র ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ পড়া ছেড়ে লড়াইতে চলে যান। ফিরে এসে মিলিটারিতেই কেরানির কাজ নেন। সেই থেকে ক্যান্টনমেণ্টে ক্যান্টনমেণ্টে আজ এখানে কাল সেখানে পরিবার ট্যাঁকে করে ঘুরতে হয়েছে।

তিন পিসির পর তিন কাকা—মেজো সেজো আর ছোট। বাবার সঙ্গে ছোটকাকার বয়সের তফাত প্রায় আঠারো-উনিশ বছরের।

আমাদের বাড়িতে ছোটকাকা ছাড়া আর কেউই আই. এ-র বেশি এগোতে পারে নি।

বঙ্গবাসীতে বাবা ছিলেন গিরিশ বোসের ছাত্র। সে-আমলে ললিত বাঁড়ুজ্যে বাংলা পড়াতেন। বাবা লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন। (সব বাবাই লেখাপড়ায় ভালো হয়।) ইণ্টারমিডিয়েটের টেস্টে বাবা নাকি

হয়েছিলেন সেকেণ্ড। আর তখনকার ডাকসাইটে ছাত্র পঞ্চানন মিত্র ফার্স্ট। আবগারিতে চাকরি জুটে যাওয়ায় ফাইনাল পরীক্ষা আর দেওয়া হয়ে ওঠে নি। ঠাকুর্দা তখন রিটায়ার করায় বড় ছেলে হিসেবে বাবার ঘাড়ে এসে পড়েছিল সংসারের ভার। একটা ভালো যে, এসব নিয়ে বাবাকে কখনও আপসোস করতে শুনি নি।

বাবা আর ঠাকুর্দার মধ্যে যে খুব একটা সহজ সম্পর্ক ছিল না, ছেলেবেলা থেকেই এটা আমরা টের পেয়েছিলাম। ঠাকুর্দার সামনে বাবা কোনোদিনই গলা তুলে কথা বলেন নি। কিন্তু এটা লক্ষ করতাম যে, ওঁরা দুজনেই দুজনকে কেমন যেন এড়িয়ে চলতেন। বাবাকে যখন যা বলার, সেটা ঠাকুর্দা মাকেই ডেকে বলতেন—যাতে মা-র মুখ থেকে কথাগুলো বাবার কানে যায়।

বাবার সঙ্গে কাকাদের বয়সের বেশ তফাত ছিল। ছোট থেকেই তাদের বড় করার ভার বাবাকে নিতে হয়। পেনসন নেবার পর ঠাকুর্দা তাঁর সংসারটা বাবার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হয়েছিলেন। এ নিয়ে পিতা-পুত্র দু-তরফেই বোধহয় একটা অস্বস্তির ভাব ছিল।

বাবার মধ্যে একটা গোঁ ছিল, হাজার টানাটানিতেও ঠাকুর্দার টাকা তিনি ছোঁবেন না। আবার মাঝে-মধ্যে ঠাকুর্দা দু-চারটে করে টাকা কাকাদের ধরে দিলে সেটাও বাবার চোখ এড়াত না। বাবা মনে করতেন, ঠাকুর্দা বুঝি এ বিষয়ে বাবার অক্ষমতাটা তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন।

ঠাকুর্দার বোধহয় এও মনে হত যে, ছেলের সংসারে আর যাই হোক তিনি কর্তা নন। তার জন্যে ঠাকুর্দা প্রায়ই দেশে চলে গিয়ে একা থাকবেন বলে শাসাতেন। সে কথা বাবার কানে গেলেই খেপে যেতেন। বাবার কাছে মা লুকোতেন না।

ভাই-অন্তপ্রাণ হয়েও বাবার বোধহয় বদ্ধমূল একটা ধারণা ছিল যে, ঠাকুর্দা তাঁর ছেলেদের ব্যাপারে একটু একচোখো। বিশেষ করে, বাবার ওপর তাঁর টান কম।

ঠাকুর্দার মনের ভাব পরে বড় হয়ে খানিকটা বুঝতে পারি। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাবা যখন ঠাকুর্দার হাতের বাইরে চলে গেলেন, বাবা তাঁর চোখে খানিকটা বোধহয় পর হয়ে গেলেন এবং তাঁর সংসারে ঠাকুর্দা হয়ে গেলেন অনেকটা পরমুখাপেক্ষী। চিরদিন নিজের দাপটে সংসার করে এসে বুড়ো হয়ে এই হাল অম্লানবদনে মানা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। সাধে কি আর আগেকার লোকেরা বয়স হলে একসময়ে বানপ্রস্থে যেত এবং পরে কাশীবাসী হত?

একে একে কাকারা সাবালক হয়ে উঠলে ঠাকুর্দার মনোভাবের যে বদল দেখেছি, তাতে আমার এই অনুমান খুব বেঠিক নয় বলেই আমার মনে হয়েছে। সবার ছোট বলেই শেষ পর্যন্ত ছোটকাকার প্রতি ঠাকুর্দার পক্ষপাত অবিচল থেকে গিয়েছিল।

এর মধ্যেও একটু কথা আছে।

বাবা-কাকাদের মধ্যে মেজোকাকাকেই সবচেয়ে বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন বলে মনে করা হত। ঠাকুর্দার ভরসা ছিল দেশের বাড়িঘর জমি-জমা পারলে একমাত্র তাঁর মেজো ছেলেই বজায় রাখতে পারবে। ভাইদের মধ্যে মেজোকাকারই যা সংসারে একটু আঠা ছিল। মেজোকাকার ভালো নাম প্রভাস হলেও ডাকনাম ছিল হারু। ভর্তি হওয়ার সময় খানিকটা নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে এবং খানিকটা সুভাষ বোসের নামের প্রভাবে মেজোকাকা ইস্কুলের খাতায় ঢোলগোবিন্দ-র নাম লিখিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র।

মেজোকাকার বিষয়জ্ঞান সম্পর্কে অন্যদের ধারণায় যে বেশ কিছুটা বাড়াবাড়ি ছিল, আমি তার দুটো দৃষ্টান্ত দেব।

প্রথম জীবনে জামসেদপুরের টাটা কারখানায় মেজোকাকা পেয়েছিলেন অ্যাপ্রেনটিস হওয়ার, যাকে ইংরেজিতে বলে, সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু বাড়ির জন্যে হুতুশে হয়ে সে কাজ তিনি ছেড়ে দেন। ওঁর সে সময়কার সতীর্থরা সবাই পরে টাটার বড় চাকুরে হয়ে গাড়িবাড়ি এবং সেই সঙ্গে প্রচুর টাকা করেছেন। কিন্তু তা নিয়ে পরে মেজোকাকাকে

কখনও আক্ষেপ করতে শুনি নি।

নওগাঁয় ফিরে এসে মেজোকাকা তার বদলে দিলেন এক স্টেশনারি দোকান। এর পেছনে উৎসাহ যোগান মেজোকাকার আজীবন প্রাণের বন্ধু নারানকাকা। নেবুতলা লেনের কাছেই রমানাথ কবিরাজ লেনে ছিল নারানকাকাদের মস্ত পৈতৃক বাড়ি। ওঁরা ছিলেন সোনার বেনে। এ রকম নিঃস্বার্থ বন্ধুবৎসল মাটির মানুষ জীবনে আমি কম দেখেছি। কলকাতা থেকে নারানকাকা ধারে মাল যোগাড় করে রেলে করে পাঠাতেন।

আমরা তখন ছুতোয়নাতায় প্রায়ই মেজোকাকার দোকানে গিয়ে বসে থাকতাম। ভেতরে খড়ভরতি প্যাকিং বাক্স থেকে বার হত ঝকঝকে তকতকে কত যে নতুন বাহারি জিনিস! দোকানময় ভুরভুর করত সেইসব টাটকা নতুন জিনিসের আনকোরা গন্ধ।

লোকসানের ঠেলায় শেষ পর্যন্ত সে দোকান যখন উঠে গেল তখন আমাদের ছোটদেরই মন খারাপ হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। বিষয়জ্ঞানী হিসেবে মেজোকাকার সুনামও এতে বড় রকমের ঘা খেয়েছিল। কেউ কেউ তখন ঠেস দিয়ে বলেওছিল—আরে বাবা, তোমরা জাতকেরানির বংশ, ওসব ব্যাবসাট্যাবসা কি আর তোমাদের দিয়ে হয়?

পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি যে ছোঁবেন না—বাবা একথা ঠাকুর্দা বেঁচে থাকতেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। সবাই ধরে নিয়েছিল মেজোকাকাই সেসব দেখাশুনো করবার ভার নেবেন।

হঠাৎ যখন দেশভাগ হল, সবাই ধরে নিয়েছিল মেজোকাকাই দৌড়ঝাঁপ করে ভিটেমাটি জমিজায়গার একটা বিলিবন্দোবস্ত করবেন। তা মেজোকাকা কলকাতা ছেড়ে নড়লেনই না। যারা এদিক থেকে গিয়ে আমাদের দেশের বাড়ি জবরদখল করেছিল, তারা মেজোকাকাকে চিঠি দিল যাতে তাদের সঙ্গে জমি বাড়ি এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থা করা হয়। মেজোকাকা সে বিষয়ে কোনো গা দেখালেন না। শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে তারা লিখল, এসে অন্তত সিন্দুকের বাসনকোসনগুলো নিয়ে যান।

কাকস্য পরিবেদনা মেজোকাকা একদম চুপ। হ্যাঁ বা না, কোনো উত্তরই দিলেন না।

বাবার আপত্তিতে আমাদের পরিবারের কেউ উদ্বাস্তু বলে নামও লেখায় নি।

এই তো গেল মেজোকাকার বিষয়জ্ঞান।

আর সেজোকাকা? সবাই বলত, ওর মাথায় ছিট আছে। ছিট নয়, আসলে গানের পোকা। স্থানকালের কোনোরকম তোয়াক্কা না রেখে ছ্যাখ্-না-ছ্যাখ্ সেই পোকাটা নড়ে উঠত। আর ছিল সেজোকাকার একটা নিকেলের বাঁশি।

ভাইদের মধ্যে ওই সেজোকাকারই রং ছিল ময়লা। ঠাকুর্দার মতন। তবে মাথায় বেশ ঢ্যাঙা। তুলনায় ছোটকাকা কম লম্বা। তবে আমার মতো বেঁটে নয়।

ছোটকাকা সেজোকাকায় যেমন ছিল ভাব, তেমনি খিটিমিটি। সেজকোকা ছিলেন সব নিয়মের বাইরে। খেয়ালির একশেষ। কখনও মনে হল, শরীরচর্চা করা দরকার। শুরু হয়ে গেল ব্যায়াম। এই ভারি ভারি ডামবেল ভাঁজছেন, দরজার পাল্লা দুটোকে বারবেল করতে গিয়ে দড়াম করে উল্‌টে সানের মেঝেতে পড়ে হাত পা ভাঙছেন। ডনবৈঠক দেওয়ার কোনো সময় অসময় নেই। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ হয়ত ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করলেন। বড়ো বাটির এক বাটি ছোলাই রোজ সাবাড় করে দিচ্ছেন। ফলে, একসময়ে পেট ছেড়ে দিল এবং ব্যায়ামের বাড়াবাড়িতে পালোয়ান হওয়ার বদলে হয়ত দড়ির মতো শুকিয়ে গেলেন। তখন বেল রে, মকরধ্বজ রে। এটা রে সেটা রে। তাই নিয়ে আবার এক হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার। তা নিয়ে কারো কিছু বলবার উপায় নেই। বিশেষ করে ছোটকাকার। বেধে যাবে ধুন্ধুমার কাণ্ড।

তবে গানও যে নিয়ম করে কোনো ওস্তাদের কাছে তালিম নিয়ে শিখেছিলেন তা নয়। গানের গলা ছিল ভালো। হারমোনিয়াম অপূর্ব বাজাতেন। গাইতেন নিজের খেয়ালে। কিন্তু কেউ গাইতে বললে পুরো

গান শেষ না করেই একটা থেকে আর একটাতে চলে যেতেন।

আমাদের বাড়িতে সেজোকাকারই যা ছিল বই-পড়ার বাতিক। ইংরিজি-বাংলার কোনো বাছবিচার ছিল না। নওগাঁর বাইরে এক গ্রামের ইস্কুলে—বোধ হয় আক্কেলপুরে সেজোকাকা কিছুদিন পড়ানোর কাজ নিয়েছিলেন। হোস্টেলেই থাকতেন, মাঝে মাঝে সাইকেল চালিয়ে আসতেন। সাইকেল চালাতেন দু-হাত ছেড়ে দিয়ে। হ্যাণ্ডেলের ওপর থাকত একটা খোলা বই। ডিকেন্স কিংবা হ্যাগার্ডের। বাবা চটে গিয়ে বলতেন, রবির সবকিছুর মধ্যেই একটা বাহাদুরির ভাব। ওর কিস্সু হবে না।

হয়ও নি। পড়াতেন খুব ভালো। বিশেষ করে, ইংরিজি। কিন্তু এক জায়গায় বেশিদিন তাঁকে ধরে রাখা যেত না। মাস্টারিই করুন আর চাকরিই করুন, পায়ের নিচে কখনও ঘাস গজাতে দিতেন না। মাইনের টাকা খরচ করতেন খোলামকুচির মতন। টাকা থাকত হয় জামার পকেটে, নয় খোলা ট্রাঙ্কে। মাঝে-মাঝে টাকা জমানোর খেয়াল হত। চালের বাতায় কিংবা বাঁশের চোঙে, এমন সব জায়গায় টাকাপয়সা গুঁজে রাখতেন যে, হয় তা উই-ইঁদুরে কাটত আর তা না হলে কোথায় রেখেছেন পরে আর তা মনে করতে পারতেন না।

বরং ছোটকাকার স্বভাবে ছিল একটা মাত্রাজ্ঞান এবং কিছুটা গোছালো ভাব। ছোটবেলায় মা মারা যাওয়া, হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো করা—এসবের ভেতর দিয়ে ছোটকাকার মধ্যে একটা আত্মনির্ভরতার ভাব গড়ে উঠেছিল। ছোটকাকা সবার সঙ্গেই বেশ মানিয়ে-বনিয়ে চলতে পারতেন। ছোটকাকাও ভালো গান গাইতেন। তাই বলে যখন-তখন যত্রতত্র নয়। তাঁর মধ্যে অসাধারণ হওয়ার কোনো মোহ ছিল না। ফলে, ছোটকাকার ওপর কেউ কখনও বিরক্ত হত না। বাবাও দেখেছি ছোটকাকাকেই বেশি ভালোবাসতেন।

মা-র কথা এবার একটু সংক্ষেপে বলে নেব।

সেকালে বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েদের নিজস্ব নামগুলো আস্তে আস্তে মুছে যেত। গোড়ায় দিদি-বউদি, তারপর অমুকের বউ, অমুকের মা এবং যত বয়স বাড়তে থাকে তত মাসি-পিসি, গিন্নী-মা এবং তারও পরে দিদিমা-ঠাকুমায় গিয়ে শেষ হত!

আমার মাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। মা-র ভালো নাম যামিনী হলেও মাকে ও-নামে কাউকে কখনও ডাকতে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। বাড়িতে কানে যেত শুধু আমাদের ভাইবোনদের 'মা' ডাক, কাকা-দের গলায় 'বউদি', ঠাকুর্দার 'বউমা' আর বাবার নৈর্ব্যক্তিক 'ওগো শুনছ'. কচিৎ কদাচিৎ মা-র যখন নাম লেখার দরকার হত, গোটা-গোটা মেয়েলি ছাঁদের অক্ষরে মা লিখতেন—যামিনীবালা দেবী। এই শ্রীমতী যামিনীবালা দেবী যে বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র মুখার্জীর বউ, লোকে থোড়াই সে খবর রাখত।

মা নাকি ছেলেবেলায় কেষ্টনগরে মেমসাহেবদের ইস্কুলে বাংলা পড়েছেন। ইংরিজিতে হাতেখড়ির আগেই বোধহয় মা-র বিয়ে হয়ে যায়। ফলে মা আদৌ ইংরিজি জানতেন না।

মা ঠিক পড়ুয়া টাইপও ছিলেন না। পড়ার সময়ই বা কোথায় পেতেন? একটা ছেড়া-ফাটা সংসার সারাক্ষণ সেলাই আর রিপু করে টেনেবুনে চালাতে হত। বাবা তো মাসকাবারে মাইনের টাকাটা মার হাতে ধরিয়ে দিয়েই খালাস। তা দিয়ে তো হরিদাদার দইয়ের ভাঁড় হয় না। ফলে, অভাবের সংসারে অশান্তি ছিল নিত্যসঙ্গী।

মা-র বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। খরচ কমাবার জন্যে মা এমন ধোঁকার ডালনা বাঁধতেন যে, মাছের কথা ভুলে গিয়ে বাড়ির সবাই হাপুস হুপুস করে ভাত খেয়ে নিত। দুধের অভাব ভোলবার জন্যে মা তো আমাদের খুব শৈশবেই চা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। আমিষের খরচ বাঁচাতে আরেকবার চালু করে দিলেন রাত্তিরে চন্দৌসির আটার রুটি আর রসগোল্লার পায়েস। সবাই তো মহাখুশি।

মা-র কাছে শিখেছিলাম, ভাতের সঙ্গে আর কিছুই যদি না জোটে,

এক-পলা সর্ষের তেল, নুন আর কাঁচা লঙ্কা কিংবা লঙ্কা পোড়া—ব্যস্। তার কাছে কোথায় লাগে নামী-দামী চর্ব্যচোষ্য।

মা-র আসকারাতেই সেজোকাকা বানিয়ে ফেলেন তিনটে ছিপ। সেই ছিপ নিয়ে সেজোকাকা দাদা আর আমি একটু ফাঁক পেলেই সামনের পুকুরে গিয়ে বসতাম। টপাটপ মাছ উঠত। আর তাতে হেসে খেলে সারা বাড়ির একবেলার মাছের সংস্থান হয়ে যেত।

নওগাঁয় আমরা যাওয়ার পর-পরই একটা ঘটনা ঘটে, যার পর মা আর কোনোদিনই কোনো নেমন্তন্নবাড়িতে যান নি। ব্যাপারটা যতটা জেনেছিলাম তা এই :

মা-র কোনো দামি রঙিন শাড়ি ছিল না। থাকলেও অন্তত আমরা কখনও পরতে দেখি নি। বাইরে কোথাও গেলে পরতেন লালপাড় তাঁতের সাদা শাড়ি। গায়ের রং কালো হলেও মা-র খুব ভালো মুখশ্রী ছিল। চোখে মুখে খুব লাবণ্য ছিল।

একবার এক বিয়েবাড়িতে গিয়েছেন। সেখানে এক অফিসারের বউ মা-র সাদাসিধে সাজসজ্জা দেখে এবং তারপর হাত দুটো ধরে মুখের কাছে এনে নাকি বলেছিলেন, 'এ মা! হাত দুটোও যে একদম খালি। তোমার স্বামী বুঝি তোমাকে ভালোবাসে না?'

ব্যস, তারপরই বাড়ি ফিরে মা জানিয়ে দিয়েছিলেন এর পর থেকে আর কখনও তিনি কোনো নেমন্তন্ন-বাড়িতে যাবেন না। এরপর বাবাও কখনও মাকে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোথাও যাওয়ার ব্যাপারে কোনো জোরজার করেন নি।

বাবা যে ঘুষ নেন না, সে ব্যাপারে মার মনে মনে একটা গর্ব ছিল। মুখে না বলে ভাবভঙ্গি দিয়ে সেই বোধটা ছেলেমেয়ের মধ্যেও তিনি চারিয়ে দিয়েছিলেন।

ইংরিজিতে একটা সুবিধে আছে। আপনি-তুমি-তুইয়ের বালাই নেই। বাংলায় এই এক মুশকিল। ঠাকুর্দা থেকে বাবা-কাকা-মা—সবাই-কেই আমরা 'তুমি' বলতাম। দাদা-দিদির বেলায় স্রেফ 'তুই'। অথচ

বড়দের সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'আপনি আজ্ঞে' না করাটা খারাপ দেখায়। কিন্তু লিখতে গিয়ে মাঝে মাঝে বাধো-বাধো ঠেকে। পূর্বাপর সংগতি ঠিক বজায় যে থাকে না তার কারণ, কেবলই ভয় হয়, খুব আপনজনকে এই বুঝি পর করে দিচ্ছি।

মা-র প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসি।

বিয়ের সময় মা ছিলেন অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। একমাত্র ছোটমামা ছাড়া ভাইবোনদের মধ্যে মা ছিলেন সবার ছোট এবং সবার আদরের। ছোট-মামা সম্ভবত তখনও জন্মান নি।

দাদামশাই সম্বন্ধে আগে বলেছি। ছিলেন অ্যাসিসটাণ্ট সিভিল সার্জেন। কালো দশাসই চেহারা। পাঁঠার আস্ত মাথা খেতেন যখন, সঙ্গে কি আর বিলিতি মদ থাকত না? মারা যান ক্যানসারে। আমরা দাদামশাইকে দেখেছি শুধু মৃত অবস্থায় তোলা ছবিতে।

তাঁর বিরাট বাগানঅলা মস্ত দোতলা বাড়ি ছিল কেষ্টনগরের কাঁঠাল-পোঁতায়। বড় হয়ে সে বাড়ি দেখেছি। তখন বাড়ি বিক্রি হয়ে গিয়ে সেখানে পুলিশের লোকজনেরা থাকে।

আমরা তিন ভাইবোনই হয়েছি মামাদের নেদেরপাড়ার ভাড়া-বাড়িতে। মামাদের অবস্থা তখন পড়তে শুরু করেছে। কাঁঠালপোঁতার বাড়িটা বিক্রি করার তোড়জোড় চলেছে। সেই অবস্থায় একবার সেই সাবেকী বাড়িটাতে ঢুকেছিলাম। বাড়ির ভেতর ছিল প্রকাণ্ড বাগান। সেটা তখন বনজঙ্গলে ভর্তি। তারই মধ্যে দেখেছিলাম একটা কাঁঠাল-চাঁপা আর অনেকগুলো লেবু গাছ। মিষ্টি গন্ধের জন্যেই গাছগুলোর কথা মনে আছে।

জ্ঞান হয়ে দিদিমাকে যখন দেখেছি তখন তাঁর বয়স হয়েছে। তখনও দিদিমার গায়ের রঙ চাঁপাফুলের মতন। অথচ তাঁর ছেলেমেয়েরা তাঁর গায়ের রং পায় নি। বড়মাসিকে দেখি নি। বড়মাসি নিঃসন্তান অবস্থায় অল্পবয়সেই মারা যান। বড় মেসোমশাই দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন।

কিন্তু মামার বাড়ির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কখনও ছিন্ন হয় নি। তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমাদেরও আপন মাসতুতো ভাইবোনের মতোই সম্পর্ক ছিল।

মেজোমাসির রংই ছিল যা একটু পরিষ্কার। উত্তরপাড়ার বড় জমিদার-বাড়ির বউ হওয়ায় মেজোমাসির খুব ঠ্যাকার ছিল। বাপের বাড়ি গরিব হয়ে যাওয়ার পর নিজেদের গাড়িতে দিদিমাকে যা ত্-একবার দেখতে এসেছেন, কখনও ত্-এক ঘণ্টার বেশি থাকেন নি। একবার বাড়ি সারানো কিংবা কী একটা যেন কারণে মেজোমেসোমশাইরা ত্-এক মাসের জন্যে হাড়কাটা গলির মুখে একটা বাড়ি ভাড়া করেছিলেন। তখন ওঁদের রুচি দেখে আমরা সবাই খুব হতাশ হয়েছিলাম।

মামার বাড়িতে আরও একটা কারণে মেজোমাসি অপ্রিয় হয়েছিলেন। আমার মেজোমামার সুন্দরী আর সুশিক্ষিতা মেজো মেয়েকে মেজোমাসি নাকি সব জেনেশুনেও, জোর করে, মলঙ্গা লেনে নিজস্ব বাড়ি থাকার সুবাদে এমন এক নেশাখোর অশিক্ষিত অপাত্রের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন যে, তার সঙ্গে আমার সেই দিদির কোনোদিন ঘর করা তো সম্ভবই হয় নি, উপরন্তু গোটা জীবনটাই তার একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

সেজোমাসি আর ন-মাসিরও ভালো বিয়ে হয়েছিল। হাতছালার জমিদারবাড়িতে। কিন্তু ত্জনেরই এমনি কপাল যে, জমিদারি লাটে উঠে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁদের এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, দিন চলাই শক্ত হয়ে ওঠে। সেজোমাসিমা তার ওপর ছেলেমেয়ে নিয়ে বিধবা হয়ে আরও আতান্তরে পড়েন। অত ত্ঃখের মধ্যেও সেজোমাসিমা পদ্য লিখতেন। তার কিছু কিছু 'বিষাণ' পত্রিকায় ছাপাও হয়েছিল।

এবার মামাদের কথায় আসি।

বড়মামা ছিলেন নেহাত ভালোমানুষ। বাড়ির বড় ছেলের যে গুণ থাকলে অনেক সময় পড়ন্ত সংসার কষ্টেসৃষ্টে আবার উঠে দাঁড়ায়, বড়মামা মোটেই তেমন উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন না। মামারা সবাই ছিলেন বেশ লম্বা-চওড়া। সেই সঙ্গে মৃত্ভাষী। আমাদের বাড়িতে

বাবা-কাকোরা তার উলটো। মাথায় ঢ্যাঙা হলেও কৃষকায়, কিন্তু উচ্চকণ্ঠ। আমাদের ছেলেবেলাতেই বড়মামা মারা যান। বড়মামিকে আমার তেমন মনেই পড়ে না।

কেষ্টনগরের পাট উঠিয়ে মামারা চলে এসেছিলেন কলকাতায়। গোড়ায় থাকতেন পটলডাঙায়, মধ্যে চুনাপুকুরে এবং তারপর থেকে ডকসন লেনে।

শুনেছি দাদামশাই নাকি নিজস্ব বাড়ি ছাড়াও টাকাকড়িও রেখে গিয়েছিলেন ভালোই। বাড়ি বেচার পর মামাদের মাথায় ঢুকেছিল ব্যবসা। দাদামশাইয়ের জমানো টাকাও শেষ পর্যন্ত তাতেই খইকলা হয়ে উড়ে যায়।

ছোটকাকা বা সেজোকাকার পৈতে উপলক্ষে দিনকয়েকের জন্যে একবার আমরা কলকাতায় এসেছিলাম। তখন হ্যারিসন রোডের ওপর ন মামা একটা হোটেল চালাচ্ছিলেন। নাম দিয়েছিলেন বোধহয় ক্যালকাটা হোটেল। চেনাশুনো লোকজনেরা শেয়ালদা স্টেশন থেকে সটান ওই হোটেলে ওঠে বিনা পয়সায় খেয়েদেয়ে থেকে ন মামার ব্যবসায় লালবাতি জ্বেলে দিয়েছিল।

প্রথমে ন মামা আর তারপর ছোটমামা তখন সুড় সুড় করে টেলিগ্রাফ আপিসে চাকরি নেন। কিন্তু ব্যবসার নেশা ন মামা কখনও ছাড়তে পারেন নি। যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন একবেলা চাকরি এবং আরেকবেলা টুকটাক কিছু না কিছু করে গেছেন।

বাড়ির বেসামাল অবস্থার জন্যেই বোধহয় ছোটমামা চিরকুমার থেকে গিয়েছিলেন। ইস্কুল-কলেজে যেমন ভালো ছাত্র, তেমনি খেলাধুলাতেও ছোটমামা ছিলেন চৌকস। পরে টেলিগ্রাফ ইন্সটিটিউটের হয়ে খেলে ফুটবলে খুব নাম করেছিলেন। ছোটমামার নাম ছিল নন্দগোপাল। নওগাঁয় থাকতে খেলার পাতায় যখন এন ব্যানার্জীর নাম বার হত, তখন সেটা দেখিয়ে আমি আর দাদা বন্ধুমহলে খাতির কুড়োতাম।

সেজোমামা ছিলেন বড়মামার চেয়েও ভালোমানুষের বেহদ্দ। জীবনটা

কাটিয়ে দিয়েছিলেন শুধু টিউশনি করে। অনেক বেশি বয়স পর্যন্ত ছিলেন নিঃসন্তান। ন' মামা আর ছোটমামা যা আয় করতেন, তার সঙ্গে নিজেরটা যোগ করে সেজোমামা সংসার চালাতেন। তাতেও বড় সংসারে বেশ টান পড়ত।

মেজোমামা থেকে গিয়েছিলেন এর বাইরে। সম্ভবত মেজোমামিমা শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে নিজেকে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নি বলে। ওঁরা কেষ্টনগরেই থেকে গিয়েছিলেন। আলাদা হয়ে ভাড়া বাড়িতে।

মেজোমামার ছিল নিজস্ব একটা ধরন। ডাক্তারি পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দেন। কিন্তু মাথা ছিল খুব পরিষ্কার। প্রথম জীবনে ছিল ব্যাবসার ঘোড়ারোগ। তাতে বাপের অনেক টাকা জলে দিয়েছেন। বাড়ি ছেড়ে এটা ওটা করে বেড়িয়েছেন, কিন্তু কোথাও কোনো কাজে থিতু হতে পারেন নি। তবে মেজোমামা কখনই একেবারে বেকার হন নি। নিজে ডাক্তারি পাস না করলেও প্রাইভেটে ওঁর কাছে পড়ে কত ছাত্র যে পাস করা ডাক্তার হয়েছে তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। ডাক্তারি ছাত্রদের পড়ানো ছিল মেজোমামার সারা জীবনের একটা হবি। শেষ বয়সে আর সব ছেড়ে দিয়ে লক্ষ্মীছাড়ার মতো ঘুরে না বেড়িয়ে কেষ্টনগরের বাসায় যখন থিতু হয়ে এসে বসলেন, তখন ওঁর হুঁশ হল যে এতদিন মিথ্যে সোনার হরিণের পেছনে না ছুটে বাড়ি বসে শুধু ডাক্তারি ছাত্র পড়িয়েই তিনি হেসেখেলে সংসার নিবাহ করতে পারতেন। কিন্তু তখন খুব দেরি হয়ে গেছে। এক সময়ে নিঃসঙ্গ জীবনে ওঁর ছিল দুটো নেশা। দিনরাত ধেনো খেয়ে চুর হয়ে থাকা আর বনেবাদাড়ে শিকার করে বেড়ানো। শেষদিকে মদ ছাড়তে ওঁর যত না কষ্ট হয়েছিল, তার চেয়ে ঢের বেশি দুঃখ হয়েছিল বহু বছরের নিত্যসঙ্গী পুরনো বন্দুকটাকে হাতছাড়া করতে।

আরেকটা গুণ ছিল মেজোমামার। কথা দিয়ে মানুষকে পটাতে পারতেন। ফলে, একার জীবনে তাঁর কখনও সঙ্গীর অভাব হয় নি। হোক না সে ভক্তরা সব নীচের তলার।

কেষ্টনগরের মেয়ে হওয়ায় আমার মা-র কথাও ছিল খুব মিষ্টি। কিন্তু

দিদিমা দোখনো হওয়ায় ওঁর নুচি-নেবু-নেপ আমাদের কানে ভালো লাগত না। তা ছাড়া রুচিতেও কখনও কখনও বাধত। কেননা দিদিমার মুখের কোনো আগল ছিল না। আমাদের তখন কতটুকুই বা বয়স। পরীক্ষার আগে গেলে বলতেন—ছ্যাখ্, পরীক্ষা দিতে যাবার সময় রাস্তায় কোনো বেবুশ্যে দেখলে অমনি ঢিপ করে প্রণাম করবি। দেখিস, পরীক্ষা খুব ভালো দিবি।

দিদিমা খুব সুন্দরী ছিলেন বলেই বোধহয় দাদামশাই কখনও দিদিমার কোল খালি রাখতে দেন নি। ফলে, দিদিমাকে বিশটি সন্তানের জননী হতে হয়েছিল। বেঁচেবর্তে ছিল অবশ্য তার অর্ধেক।

মাতৃকুল-পিতৃকুলের কথা আপাতত এখন ধামাচাপা দিয়ে ঢোলগোবিন্দ আবার ফিরে যাক তার প্রথম জীবনের নওগাঁয়।

কাকিমাকে কদিন দেখি নি। সম্ভবত প্রসব হতে গেছেন হাসপাতালে। মঞ্জু এসে আছে আমার মা-র কাছে। মঞ্জুকে কোলেপিঠে নিয়ে আমার আর দাদার অনেকটা সময় কেটে যায়।

হঠাৎ একটা চুপচাপ। ফিসফাস। মা-র চোখে আঁচল। চোখ দুটোতে ভিজে ভিজে ভাব।

জ্যাঠামশাইদের বাড়িতে অনবরত লোক আসছে।

বেলা বাড়তেই খাটে শুয়ে কাকিমা এলেন। পায়ে আলতা। সর্বাঙ্গ ফুলে ঢাকা। কাকিমা মারা গেছেন এটা বুঝতে একটু সময় লেগেছিল। যখন বুঝলাম তখন দিদি দাদা আর আমার সে কী চিৎকার করে কান্না। মঞ্জু অবশ্য তখনও কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না।

আমার জীবনে সেই প্রথম মৃত্যু দেখা।

আমাদের ঘরের দেয়ালে মঞ্জুকে কোলে নিয়ে কাকিমা সেই থেকে ফ্রেমে বাঁধানো ছবি হয়ে রয়ে গেলেন।

৮

গণেশায় নমঃ

জোড়া-দেওয়া তক্তাপোশে ঢালা বিছানায় ঠাকুরদার সঙ্গে আমরা শুতাম।

সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতে শুনলে বুঝতাম ঠাকুরদার ঘুম ভেঙেছে। বিছানা ছেড়ে না ওঠায় বলা যেত না যে, ঠাকুরদা ভোরে উঠতেন। শুয়ে শুয়েই, কখনও সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতেন কখনও বা আমাকে আর দাদাকে পাখি পডানোর মতো করে মুখস্থ করাতেন ঊর্ধ্বতন সাতপুরুষের নাম।

এমন সব বিকট সেকেলে নাম যে, শুনলেই আমাদের হরিভক্তি উড়ে যেত। বাবা-কাকারা এ দুর্ভোগ থেকে রেহাই পেয়েছিলেন ছেলেবেলায় ওঁরা ওঁদের ঠাকুরদাকে না পাওয়ায়। যতদূর মনে পড়ে, রামযুক্ত নামই ছিল বেশি। রাজারাম, জগৎরাম, সহায়রাম, শেষ পর্যন্ত আর কিছু না পেয়ে, রামরাম। দাদা বলত, রামো রামো। শেষকালে দেবশর্মণ।

বলো তো দাদু, আমরা কুলীন, না ভঙ্গ? ভঙ্গ। কোন্ শ্রেণী? রাঢ়ী শ্রেণী। কোন্ গোত্র? ভরদ্বাজ। কোন্ মেল? ফুলিয়া মেল। দাদু বলতেন, ফুলে-মেল।

আমাদের যে প্যাসেনজার নয়, মেল—এটা শুনে ভালো লেগেছিল। ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে ঠাকুরদার যে গর্ব ছিল, গ্রামে গেলে সেটা বেশি টের পেতাম। বামুনপাড়ায় আবার এও শুনতাম যে, ভঙ্গরা কুলীনদের চেয়ে ছোট।

মফস্বল শহরে ছত্রিশ জাতের সঙ্গে সরকারি কোয়ার্টারে বাস করার ফলে জাতের বালাইটা কখনই আমাদের মনে তেমন চেপে বসতে পারে নি। তা ছাড়া প্রতিবেশী মুসলমান পরিবারগুলোতে আমাদের ছোটদের

ছিল অবাধ প্রবেশাধিকার। ঈদ্ বকরীদ মিলাদশরীফে আমরাও উৎসবে মেতে উঠতাম।

ঠাকুরদা যে তাই বলে খুব গোঁড়া শুচিবায়ুগ্রস্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাও নয়। জলচৌকিতে বসে স্নান করার সময় সূর্যস্তোত্র আর গায়ত্রীমন্ত্র পড়তেন। শুনতে আমাদের ভালোই লাগত।

ঢোলগোবিন্দর আজ যা বয়স, তার ঠাকুরদা সে বয়সে ছিলেন একেবারেই বুড়োস্থ বুড়ো। ছানি-কাটা চোখে ইয়া মোটা কাঁচের চশমা। হাতে বেতের লাঠি। ঠাকুরদা বলতেন 'নড়ি'। পরনে সাদা কলারহীন ফুলহাতা শার্ট। শীতের সময় বালাপোশ আর আলপাকার চাদর। দুপাশ থেকে ব্রহ্মতালুতে উঠে যাওয়া কপাল। সারা গায়ে ঝোলা-ঝোলা কোঁচকানো চামড়া। পায়ে তালতলার চটি। বাইরে বেরোবার জন্যে দুপাশে ইলাস্টিক-দেওয়া সায়েববাড়ির জুতো।

সেযুগে যৌবন ছিল খুব স্বল্পায়ু। চল্লিশ পেরোলেই যে কেউ বুড়ো বলে নিজেকে চালিয়ে দিতে পারত। সেই সুবাদে তখন স্নেহভরে যে-কোনো নবোঢ়াকে নিরাপদে চুমো খাওয়া যেত।

ঢোলগোবিন্দ সখেদে আজ মনে করে, যতটুকু তার স্মরণে আছে, তার ঠাকুরদা তেমন সুযোগ বড়ো একটা হাতছাড়া করতেন না।

ঢোলগোবিন্দকে নিয়ে এই এক মুশকিল। যত বলি, ছোট হয়ে যা, ছোটবেলার কথা মনে কর্—ততই থেকে থেকে তার নিজ মূর্তি বেরিয়ে পড়তে চায়। একটু ফাঁক পেলেই সাপুড়ের ঝাঁপি থেকে ফণাটাকে বার করে দেয়।

ষোলো আনা বিশ্বাস করবেন না ওর কথা। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দেওয়া তো আছেই, তা ছাড়া ওর স্মৃতিতে স্থানকালপাত্রেরও মা বাপ নেই।

ঠাকুরদা চোখ বুঁজবার ঢের আগেই এক কান দিয়ে ঢোকানো সাত-পুরুষের নামাবলী অন্য কান দিয়ে বার করে দিয়েছিলাম।

সেসব নাম আর আমাদের জন্মসময় যে খাতাটায় লেখা ছিল, ঠাকুরদার ক্যাশবাক্সে তারই পিঠোপিঠি ছিল গোটানো হলদে কাগজে লাল কালিতে লেখা আমাদের এক দিদি আর দুই ভাইয়ের কুষ্ঠি। খাতা কাগজ ক্যাশবাক্স—একদিন সমস্তই লোপাট হয়ে গেছে। ফলে, সেই থেকে আমাদের নির্ভরযোগ্য কোনো জন্মদিন নেই।

বাঁচা গেছে।

ঠাকুরদাকে বাড়ির বারান্দায় বসিয়ে রেখে এবার আসি একটু অন্য কথায়।

কাকিমা মারা যাওয়ার পর মঞ্জু কিছুদিন থেকে গেল আমার মা-র কাছে। জ্যাঠামশায়ের পক্ষেও মঞ্জুকে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে থাকাটা খুব সুখের হত না।

জ্যাঠামশাইয়ের সবচেয়ে ছোট দুই ভাই সদাশিবকাকা আর বু-কাকাও কিছুদিন দাদার কাছে এসে থেকে গেলেন।

বু-কাকার পুরো নাম বুড়োশিব। ওঁরা দুজনে আমার সেজোকাকা-ছোটকাকারই সমবয়সী।

বু-কাকা ছিলেন খুব রসিক। লোকের পেছনেও যা লাগতে পারতেন।

আমাদের লাগোয়া বাড়িটাতে তখন এসে আছেন এক অবিবাহিত আবগারি অফিসার। একটু গ্রাম্যতাদুষ্ট নিরীহ গোছের মানুষ। সব সময় একটু ছোঁক-ছোঁক ভাব। শহরের আধুনিক স্মার্ট মেয়ে দেখলে গলে যান। অথচ সাহসের বেজায় অভাব।

বু-কাকার দল ঠিক করল ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু মশকরা করবেন। এক আমার মা ছাড়া বাড়ির বড়রা কেউ ওদের এই ইয়ারকি-ফাজলামির ব্যাপারগুলো জানত না। মা যে শুধু জানতেন তাই নয়, ভাবসাব দেখে মনে হত, ওদের ওইসব দুষ্টুবুদ্ধির পেছনে মা-র হয়তো বেশ খানিকটা সায় ছিল।

নইলে বু-কাকাদের কী সাধ্য ছিল আমার ছোটকাকাকে অমন

পটের বিবি করে সাজানোর !

সেদিন সকাল থেকেই চলছিল বাড়ির ভেতরের মহলে একটা গুজগুজ ফিসফাস। কিসের কী ব্যাপার আমরা ছোটরাও ঠিক বুঝি নি। কিছু একটা মজা হবে এটাই শুধু আঁচ করেছিলাম।

দু বাড়ির মাঝখানে হাফ-ইঁদারার পুবদিকে ছিল একটা যোজক দরজা।

ছোটকাকা মেয়ে সেজে ওই দরজাটা খুলেই পাশের বাড়িতে ঢুকেছিল।

একটা সময়ে ছোটকাকা ফিরে আসার পর যেখানে বসে ওরা ছোট-কাকার মুখ থেকে ওবাড়ির সব বৃত্তান্ত শুনেছিল, আমরা ছোটরা সেখানে ঘেঁষতে পারি নি।

পাশের বাড়ির ভদ্রলোক তার দিন কয়েকের মধ্যেই বদলির ব্যবস্থা করে ছুটি নিয়ে নওগাঁ ছেড়ে চলে যান।

পরে কাকাদের দুখ্যু-দুখ্যু ভাব দেখে মনে হয়েছিল যে, ওরা কেউ ভাবে নি ঠাট্টার ফল এতটা গুরুতর হয়ে দেখা দেবে।

•

এই সময়ে জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে এসে গেলেন তাঁর সদ্য বিলেত-ফেরত এক ভাই নৌ-কাকা।

সেকালে যারা বিলেতফেরত হত, বাংলা ভুলে যাওয়ায় সাহেবদেব উচ্চারণে তারা বাংলা বলত। নৌ-কাকা আমাদের অবাক করেছিলেন রান্নাঘরে বসে মা-র সঙ্গে গড়গড় করে ঢাকার উচ্চারণে বাংলা বলে।

আর তার চেয়েও অবাক হয়েছিলাম আমাদেরই বাড়িতে নৌ কাকাকে স্লিপিং-গাউন প'রে বীরের মতো তক্তাপোশের ওপর দাঁড়িয়ে বাঁশের একটা লাঠি দিয়ে ঘরের ভেতর ফোঁসফাঁস-করা একটা জাতসাপ মারতে দেখে। বিলেতফেরতদের কী বুকের পাটা !

মঞ্জু ছিল আমার খুব ন্যাওটা। ওকে কেউ দুষ্টুমি করে আমার বাবাকে শ্বশুর বলতে শিখিয়েছিল।

একদিন কী কারণে যেন কিছুক্ষণের জন্যে ঢোলগোবিন্দর গায়ে একটাও সুতো ছিল না। হঠাৎ মঞ্জু সে-ঘরে ঢুকে পড়ে 'দিগম্বর' 'দিগম্বর' বলে হাততালি দিতে শুরু করলে নিরুপায় ঢোলগোবিন্দকে মরমে মরে গিয়ে দরজার আড়াল নিতে হয়। সেদিন সে যে কী লজ্জা পেয়েছিল বলবার নয়।

আমাদের বাড়িটাকে ফাঁকা করে দিয়ে মঞ্জু একদিন ওর কাকাদের সঙ্গে ঢাকায় চলে গিয়েছিল। ও যাওয়ার সময় মা-র সে কী কান্না!

ঢাকায় গিয়ে মঞ্জু আমাদের জন্যে কী রকম হুতুশে হয়েছিল, জ্যাঠা-মশাই মাঝে মাঝেই তার খবর বলতেন। কেউ ওকে কিছু বললেই ও নাকি কাঁদতে কাঁদতে তাকে শাসাত, 'গোবিন্দরে কইয়া দিমু।' মঞ্জু আমাদের ছেড়ে গিয়ে বাঙাল ভাষায় কথা বলছে এটা শুনে কেমন যেন মন খারাপ হত।

পরে বড় হয়ে কলকাতায় এসে মঞ্জুর জ্যাঠতুতো বোন টেবলি আর পিসতুতো বোন মন্টু তিন কাহনকে সাত কাহন করে ঢোলগোবিন্দর পেছনে কম লাগে নি।

আর মঞ্জু? এখনও তো ওর মুখের কাছে আমি দাঁড়াতে পারি না।

জ্যাঠামশাই যে আমাদের কী ভালোবাসতেন, সেটা বুঝেছিলাম কল-কাতায় জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর সময়। শরীর ভালো যাচ্ছিল না জ্যাঠা-মশাইয়ের। একদিন সকালে লোক দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালেন। কথা বলতে পারছিলেন না। তখন আমার মা নেই, দাদাও নেই। হয়তো কাকিমার কথা, আমার মা-র কথা, দাদার কথা মনে পড়তেই আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন। আমাকে দেখে কী খুশি হয়েছিলেন। আমার একটা হাত টেনে নিয়ে মাথায় দিয়েছিলেন। চোখের কোণে ছিল এক ফোঁটা জল। দুপুর নাগাদ জ্যাঠামশাই মারা যাওয়া পর্যন্ত আমি ঠায় তাঁর শিয়রে বসে ছিলাম। পরে আমিও আর কান্না ধরে রাখতে পারি নি।

ঢোলগোবিন্দ দেখেছে পুরনো দিনগুলো শেষ হয়েও যেন শেষ হতে চায় না। ছুতোনাতায় কেবলি ফিরে-ফিরে আসে।

দাদা-দিদিকে যিনি পড়াতেন, তাঁর নামটা ভুলে যাওয়া আমার উচিত নয়। কিন্তু কপাল চাপড়েও মনে করতে পারছি না। কিন্তু কাকে জিগ্যেস করব? পুরনোরা কেউ তো আর নেই।

পুরনো কথা যা-ও বা মনে পড়ে, ফ্যাসাদে পড়ি নামের জায়গায় এসে। নাম একটা দিয়ে দেওয়া যায় বটে। রাম শ্যাম যদু মধু যে-কোনো। কেননা সেকালের সব নামই ছিল সাদামাঠা। আজকালকার মতো এত ঢঙের নয়।

উপাধি মনে আছে। রায়। প্রথম নাম? পেটে আসছে মুখে আসছে না। রাস্তা থেকে নেমে একটু ভেতর দিকে। মাটির দেয়াল, টিনের চাল। ছোট্ট একটু উঠোন। আগাগোড়া দারিদ্র্য দিয়ে লেপামোছা সংসার। দাদা-দিদিকে প্রাইভেটে পড়াতেন। আমি ছাড়া-গোরু। তখনও হাতে-খড়ি হয় নি। বাবা-মা-রা তখন ছিলেন ওইরকম। বয়সমতো ইস্কুলে ভর্তি করতে হবে, নইলে কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় বসা যাবে না, সরকারি চাকরিতে ঢোকা যাবে না—তখন অত সব হুঁশ ছিল না। হিসেবও নয়।

নাম মনে পড়ছে না যখন, তবে কি বলব মাস্টারমশাই? তাহলে বড্ড দূরের লোক হয়ে যায়। ধবধবে গায়ের রং, কুচকুচে কালো চুল আর গোঁফ। বাড়িতে ক্ষার দিয়ে কাচা সাদা শার্ট আর ধুতি। দাদা-দিদিকে পড়িয়ে একবেলা আমাদের বাড়িতে খেয়ে মাইনর ইস্কুলে মাস্টারি করতে যেতেন। মা নিজে কাছে বসে পরিপাটি করে খাওয়াতেন। কিছু-কিছু লোক আছে, যাদের মুখ দেখলেই মায়া হয়। উনি ছিলেন তেমনি মানুষ।

ছোট ভাই, বোন আর মা নিয়ে কষ্টের সংসার। বোন বলতে মরুনীদি। এই নামটা কেন ভুলি নি পরে বলব। ভারী মিষ্টি দেখতে। সিঁথিতে সরু করে সিঁদুরের দাগ। গোটা সংসারটা মরুনীদিই মাথায় করে রেখেছে। কল থেকে জল টেনে আনা, বাসন ধোয়া, রান্না, কাপড়-

কাচা, গোবর কুড়িয়ে এনে ঘুঁটে দেওয়া। সব ওর ঘাড়ে। ঠোঁটের কোণে একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটে থাকে বলেই মরুনীদিকে অত সুন্দর লাগে।

ও-বাড়ির প্রাণ ছিল মরুনীদি। ওঁর টানেই আমরা থেকে-থেকেই ও-বাড়িতে যেতাম। তখন তো বুঝতাম না। ওঁর নাম রেখেছিল যাঁরা, তাঁদের ওপর রাগ হত। এখন বুঝি, ওটা গুরুজনদের তুক-করা নাম—যাতে ওর ওপর কোনো অশুভ শক্তির নজর না লাগে।

কিন্তু বিয়ে করেও মরুনীদি কেন নিজের সংসারে থাকে নি? মাকে একবার এই নিয়ে বলতে শুনেছিলাম। বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা বলে না? এ হল তাই। ওর স্বামীটা একটা হারামজাদা লক্ষ্মীছাড়া নেশাখোর। অমন বউকে বাপের বাড়িতে ফেলে রেখে পালিয়েছে।

মরুনীদির জন্যে আমাদের যে কী কষ্ট হত বলার নয়। কেবলি মনে হত ওর অখদ্যে স্বামীটাকে একবার হাতের মধ্যে পেলে হয়।

ঢোলগোবিন্দর অক্ষরপরিচয় হয়ে গিয়ে থাকলেও, ও যে ইস্কুলে না গিয়ে রাস্তার ছেলেদের সঙ্গে খেলে বেড়ায়, এটা নিশ্চয় হঠাৎ বাড়ির কারো নজরে পড়ে গিয়েছিল।

আট বছরের ধাড়ি ছেলেকে ধরেবেঁধে পুরে দেওয়া হল মাইনর ইস্কুলের খোঁয়াড়ে।

ওর চোখ দুটো সারাক্ষণই লটকে থাকে জানলায়। খোলা খানিকটা মাঠের ভেতর দিয়ে এবড়ো-খেবড়ো পায়ে চলার রাস্তা। বেল না বাজালেও সাইকেলে ঝাঁকুনি লেগে ঠুনঠুন শব্দ হয়। কড়া রোদে মাথায় শোলার টুপি পরে ওর বাবা গাঁয়ে টহল দিয়ে দুপুরে ভাত খেতে বাড়ি ফেরে। আর ঠিক তখনই ওর বাইরে যাবার দরকার হয়। একেবারে একছুটে বাড়ি। বাবার মাখা দুধভাত ওর মুখে অমৃত বলে মনে হয়। ভাগ্যিস, দাদা-দিদি দূরের ইস্কুলে পড়ে।

দাদা-দিদির দেখাদেখি সকালে ঢোলগোবিন্দও ওর বই নিয়ে বসে।

আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে : র-জ-নী রজনী। রজনী মানে, যে আমাদের দুধ দেয়। শী ত-ল শীতল। শীতল মানে, ধোপা। শুনে হো-হো করে ওরা হাসে। ম'লো যা, ওরা হাসে কেন ?

একটু একটু করে এলেম বাড়ে। ফার্স্ট হয়। জয়দেব সেকেন্ড। কাশীরাম থার্ড। জয়দেব হেঁটে আসত অনেক দূরের এক গ্রাম থেকে। দুপুরে তখন টিফিন খাওয়ার তেমন রেওয়াজ ছিল বলে মনে পড়ে না। ছুটির সময় দেখতাম ওর মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে যেত। ওকে দেখে আমার খুব কষ্ট হত। জয়দেব ছিল জাতে কামার। কাশীরামের বাবা ছিলেন আমাদের বাসার পেছনের সরকারি বাগানের মালি। ওরা দুজনেই ছিল আমার খুব বন্ধু। আরও একজনের সঙ্গে আমার ভাব ছিল। গাঁয়ের এক মুসলমান খেতালের ছেলে। বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো। লাস্ট বেঞ্চিতে বসত। বই কখনও ছুঁত বলে মনে হয় না। সবাই ওকে দূর-ছাই করত। আমি মাঝে মাঝে ওর পাশে গিয়ে বসতাম। কিন্তু সব সময় ওর গা দিয়ে বার হত বিড়ির গন্ধ। আমি বুঝতে পারছি জেনে ফিকফিক করে হাসত।

মফস্বলের ইস্কুল তো। ছেলেরাও বেশির ভাগ চাষীর ঘরের। খেতের ফলটা মুলোটা এনে তারা মাস্টারদের তোয়াজ করে। আমি কিছু আনতে পারতাম না বলে মাথায়-ফেজ-পরা আমাদের এক অঙ্কের টিচার আবগারি দারোগার ছেলে বলে আমাকে খোঁটা দিতেন। সেসব কথা বাড়িতে আমি বলতাম না ইস্কুলে শাস্তি পাওয়ার ভয়ে।

জাত নিয়ে সে সময় বড় বেশি কথা হত। উঁচুজাত নীচুজাত তো বটেই, রাঢ়ী-বারেন্দ্র, বামুন-বদ্যি-কায়েতের মধ্যেও বিদ্যেবুদ্ধিতে কে ছোট কে বড়ো এই নিয়ে তুমুল তর্ক বাধত। শুধু কি তাই ? ঘটি-বাঙাল থেকে শুরু করে মেঘনার এপার-ওপার, এ-জেলা সে-জেলা, এ-অঞ্চল সে-অঞ্চল —ভাগাভাগির অন্ত ছিল না। এই ভেদবুদ্ধি দেখে ঢোলগোবিন্দ কেমন যেন কুঁচকে যেত।

কেননা সব জাতে আর সব অঞ্চলেই যে তার পড়ার আর খেলার

সাথী ছড়ানো।

সকাল নটা-দশটায় কাগজ আসত। ঢোলগোবিন্দ লক্ষ করেছিল, ঠাকুরদার কাছে কাগজটা ছিল যেন তাঁর নেশার সামগ্রী। নটা বেজে গেলেই তিনি ঘর-বার ঘর-বার করতেন।

পড়াটা যখন সড়গড় হয় নি, তখন থেকেই ঢোলগোবিন্দ একছুটে পুকুরের ও-মুড়োয় গিয়ে হকারের কাছ থেকে কাগজ এনে ঠাকুরদার হাতে পৌঁছে দিত।

নিজে সে কাগজ পড়তে শেখার পর থেকেই ঠাকুরদা পড়লেন মুশকিলে। তখনও খরগোশের মতো ছুটে যেত ঠিকই, কিন্তু কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতে ফিরে আসত শম্বুকগতিতে। ঠাকুরদা মনে মনে গজরাতেন, কিন্তু তাঁর কিছুই করবার থাকত না।

কাগজে সে সময়ের সবচেয়ে বড় খবর বাচ্চা-ই-সাকো। বন্দুক গরজাচ্ছে আফগানিস্তানের তল্লাটে-তল্লাটে।

কলকাতা করপোরেশনে কে হল মেয়র, কে ডেপুটি মেয়র—সব আমার নখদর্পণে।

বাড়ির লোকে আদিখ্যেতা করে। বাইরের কেউ এলে বলে—বাপ রে, এইটুকু ছেলের কী আউট-নলেজ। এ ছেলে বাঁচলে হয়।

দাদা গান গায়। ইংরিজি কবিতা আবৃত্তি করে। মেডেল পায়, প্রাইজ পায়। আমিও পাই গান গেয়ে, আবৃত্তি করে।

ছোটকাকা থাকে কেষ্টনগরের কলেজের হোস্টেলে। ছোটমামার সহপাঠী। ছুটিতে ছোটমামাও একবার আসে। জানিস, আমার ছোটমামা বিরাট ফুটবল প্লেয়ার। হ্যাঁ, এন ব্যানার্জী। কলেজ টিমের ক্যাপটেন।

দিদির তখনও বিয়ে হয় নি। আমার বর্ণপরিচয়ের আগে মা-র সঙ্গে আমরা একবার কেষ্টনগরে গিয়েছিলাম। নেদেরপাড়ায় মামাদের তখন ভাড়া বাড়ি। কাঁঠালপোঁতায় দাদামশাইয়ের বাগানসুদ্ধু বুড়ো দোতলা বাড়িটা তখন খালি। বিক্রি হয়ে গিয়েছিল কিংবা হওয়ার

অপেক্ষায়। মা একদিন আমাদের সঙ্গে করে দেখিয়ে নিয়ে এসেছিলেন বাগানে কত যে লেবুগাছ ছিল। কাঁঠালপোতা থেকে আসার সময় পাত টিপে টিপে লেবুর গন্ধ নাকে নিয়ে নেদেরপাড়ায় ফিরেছিলাম।

মামার বাড়িতে আমরা সব পদ্মপাতায় ভাত খেতাম। সেই পাতা সুঘ্রাণ আজও যেন নাকে লেগে আছে।

সামনেই ছিল অধর ময়রার দোকান। সেই সরপুরিয়া আর সর ভাজার কোনো তুলনা হয় না।

দাদার সমবয়সী ছিল বড়মামার ছেলে মটরদা। দিদির সমবয়স রানীদি। ইন্দু ছিল আমার সমবয়সী। আমি ওকে 'ইঁদুর' বলতাম, আমাকে বলত 'গোলবাঘা'। বড় হয়ে মটরদা লেখাপড়ায় তেমন সুবি করতে না পেরে হাজারিবাগে মামাদের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। তাদে ছিল ট্রাক-লরির ব্যবসা। পরে সেখান থেকে সবার সঙ্গে সব সম্প চুকিয়ে মটরদা পাকাপাকিভাবে চলে যায় হিমাচল প্রদেশের নাহানে মটরদা নেই। ওর ছেলেপুলে নাতিনাতনিদের আজ আর সমতলে মানুষ বলে বোধহয় চেনাই যাবে না।

ছাদে উঠতে যাব, হঠাৎ রানীদি, দিদি এবং আরও কে কে যে সিঁড়ির বাঁকের মুখ থেকে আমাকে এক ধমক দিল। তাকিয়ে দে ওদের বুকের কাপড় সরানো। গলার স্বরে বুঝতে পেরেছিলাম ও লোকের চোখ এড়িয়ে অন্যায় কিছু করছিল। ব্যাপারটা যে শরীর নি তাতে আমার সন্দেহ ছিল না।

ঢোলগোবিন্দ তো আর কানা নয়। মেয়েদের আর ছেলেদের, সে যে-বয়সেরই হোক, শরীরের আকৃতিগত তফাত ঢের আগেই ত চোখে পড়েছিল। আবার এই পার্থক্যই যে মেয়েপুরুষকে এক ক তাদের জোড় বাঁধার ধরন দেখেই সেটা সে আঁচ করতে পারে।

অত কম বয়সেও তার নিজের শরীরেও কিছু একটা হত, এক কিছু সে চাইত—নইলে খাটের তলায় গিয়ে ইন্দুর সঙ্গেই বা সে অ জড়াজড়ি করে সুখ পেত কেন?

জুট কো-অপারেটিভে কাজ পেয়ে দিদির আগেই বিয়ে হয়ে গেল মেজোকাকার।

আমরা দল বেঁধে বরযাত্রী হয়ে ট্রেনে করে গেলাম দমদমে। কাকিমার বাবা রেলে কাজ করতেন। গোলগাল নাদুসনুদুস চেহারা। মাথায় তত লম্বা নন। কাকিমার নাম যোগমায়া। দিদি মহামায়া। ভাই কেষ্ট। সে আমার বয়সী। যে যে-কাজ করে, নিজের ছেলেকেও সে-কাজে ঢুকিয়ে দিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা বোধহয় বর্ণাশ্রমের যুগ থেকেই চলে আসছে। নাকি এ প্রথা আরও পুরনো? তবে ট্রেড থেকেই যে ট্র্যাডিশনের পত্তন তাতে সন্দেহ নেই। তাই পরে কেষ্টও নিয়েছিল রেলের কাজ।

মেজোকাকার বিয়ে উপলক্ষেই দমদমের মশার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। পরে দমদম জেলখানায় অবশ্য সে পরিচয় আরও দীর্ঘস্থায়ী এবং আরও ঘনিষ্ঠ হয়। ওঃ সে কী মশা রে, মশাই! মেজাজে মিলিটারি, আওয়াজে এরোপ্লেন আর গা-আন্দাজে যেন একেকটা দমদম-বুলেট।

কাকিমার তখন কী-ই বা বয়স। সম্পর্কে পুত্রবৎ হলেও আমরা কাকিমার কাছে খানিকটা ভাইবোনের মতন ছিলাম। কাকিমার খুব পড়ার শখ ছিল। আমাদের পড়ে পড়ে শোনাতেন দেবীচৌধুরানী, কপালকুণ্ডলা।

ও-পি, ও পি-পি, ও পোড়ারমুখি—এখনও মনে আছে।

সন্ধের পর বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে বসত গল্পের আসর। ছড়া আর রূপকথার গল্প বলতেন মা।

এর সঙ্গে ঘুমিয়ে ঢোল হয়ে পড়ার বোধহয় একটা সম্পর্ক ছিল। নইলে রূপকথা শোনা প্রসঙ্গ মনে এলেই মাদুরে শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখার কথা কেন মনে আসে? কেন চাঁদ দেখলে আজও মনে পড়ে চরকা-কাটা সেই বুড়ি আর তার দুঃখিনী নাতনির কথা?

তখন থেকেই পৃথিবীকে দেখার একটা অন্য ভঙ্গি ঢোলগোবিন্দকে

পেয়ে বসেছিল। সমতলে চিতপাত হয়ে মাথার ওপরকার সবকিছুকে দেখা। আকাশের পটে বহুরূপী মেঘের ত্রিমাত্রিক চলচ্ছবি কিভাবে যে তাকে দ্যাখ্-না-দ্যাখ্ মাটির দিকে টানত। সবচেয়ে মজা লাগত শুয়ে শুয়ে তার মা-র মুখটা দেখতে। রোজকার ঠাঁয় একভাবে দেখা মুখ, ঝাঁকড়া গাছ, ছাদ-আলসে—তার চোখে যেন নিজেদের নতুন করে ঝালিয়ে নিত।

কলকাতা থেকে কেউ একজন এসেছিলেন। বোধহয় মেজোকাকার এক বন্ধু। নারানকাকা কি? হতে পারে।

তাঁর সঙ্গে ছিল একটা বক্স-ক্যামেরা। জ্যান্ত মানুষের ফটো তুলতে সেই প্রথম দেখি। সেই ক্যামেরায় তোলা একটা ছবির কথাই মনে আছে।

রান্নাঘরের সামনে রোদে চোখ কুঁচকে হাসি-হাসি মুখে মেজোকাকিমা দাঁড়িয়ে আছেন। পেছনে ভেজিয়ে রাখা কালো দরজায় সাদা-সাদা চুনের আঁজি। আসলে ছিল ওগুলো রোজকার দেওয়া দুধের হিসেব! মেজোকাকিমা কলকাতায় এসে মারা যাওয়ার পরে ওই ছবিটাই একটু বড়ো ক'রে দেয়ালে টাঙানো হয়।

ঠাকুরদা বসে আছেন। ওঁর কথাটা টুক করে সেরে নিই।

বাবা বলতেন, 'মোহনমান'। ঠাকুরদা বলতেন 'গাঁধী'। রবীন্দ্রনাথ বা গুরুদেব বলার লোক নওগাঁয় দেখেছি একজনকেই। হুমায়ুন কবিরের বাবা চলে যাওয়ার পর যিনি রেজিস্ট্রার হয়ে আসেন, সেই দীর্ঘকায় সুপুরুষ সুকুমার চাটুয্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পড়াশুনো-করা একমাত্র ভক্ত। আমার বাপদাদার বয়সী বাকি আর সবাই বলতেন 'রবি ঠাকুর' এবং নামটা প্রায়শই তাঁরা ব্যবহার করতেন তুড়ুং ঠোকার জন্যে।

রিটায়ার করার আগে পর্যন্ত ঠাকুরদা খুব একটা পড়ুয়া লোক ছিলেন বলে মনে হয় না। আমাদের দেশের বাড়িতেও বইপত্রের তেমন পাট দেখি নি।

কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পর ছুটো কারণে সাধারণত বইয়ের দরকার পড়ে। এক তো সময় কাটানো। দুই, পরলোকের ভাবনা।

একটা ভালো। বৈতরণী পার হওয়ার জন্যে ঠাকুরদা কোনো গুরু ধরেন নি। ধর্মসভায় যাওয়া, শাস্ত্রপাঠ শোনা—এসবের তাঁর বালাই ছিল না। বাড়িতে পুজো-আর্চা করারও কোনো বাতিক দেখি নি। ঠাকুর-দেবতাকে ভক্তি করা, হিন্দুধর্মকে বড় মনে করা, সনাতন প্রথা-গুলোকে মান্য করা—অথচ কোনো কিছু নিয়েই খুব একটা বাড়াবাড়ি নয়। সব মিলিয়ে ঠাকুরদা ছিলেন একজন সাধারণ ছা-পোষা মানুষ।

বাবার সঙ্গে ঠাকুরদার চরিত্রের ছিল এইখানেই তফাত। বাবার মধ্যে ছিল সবকিছুতেই একটা বাড়াবাড়ির ঝোঁক। যা করতেন তাই চুটিয়ে। অগ্রপশ্চাৎ ভাবা তাঁর কুষ্ঠিতে লেখা ছিল না। সামাল দিতে না পারলেও একা নিজের ঘাড়ে বিরাট সংসারের ভার নিয়েছিলেন। যৌথ পরিবারের পায়ের নিচে যখন মাটি সরে যাচ্ছে, তখনও বালির বাঁধ দিয়ে তা ঠেকানোর কী নিরন্তর তাঁর চেষ্টা। ঘুষ না নেওয়ার ধনুর্ভঙ্গ পণ। অথচ সামান্য মাইনে। সুতরাং পোষাবার জন্যে কেস করে রিওয়ার্ড পাওয়ার ধান্ধায় কেবলি বাড়ির বাইরে এখানে সেখানে ছুটে বেড়াতে হচ্ছে।

ঠাকুরদার মধ্যে ছিল একটা শান্ত নির্বিকার ভাব। কারো সাতে-পাঁচে নেই। নিজের ব্যাপারে একটু যেন আঁটিসুঁটি। অন্যের ব্যাপারে রাগদ্বেষ-ঘৃণাও নয়। আসলে হেঁকে বলবার মতো, ডেকে দেখাবার মতো তাঁর মধ্যে তেমন কিছু ছিল না।

অথচ তার এই ঠাকুরদা, আর একটু বড় হয়ে, ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ তার দাদা—পরিবারের এই দুজনেই ঢোলগোবিন্দর মনের জমিতে একমুঠো সার ফেলে দিয়েছিল।

ঠাকুরদার সবচেয়ে প্রিয় বই ছিল 'দোহাবলী'।

কাউকে শোনাবার জন্যে নয়, নিজের মনেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তেন।

কিন্তু সেই দোহাগুলো এক অদৃশ্য টানে ঢোলগোবিন্দকে বেঁধে রাখত। কোনোটা কবীরের, কোনোটা তুলসীদাসের, কোনোটা বা আর কারো।

হাম দেখত জগ জাত হৈ, জগ দেখত হাম জাহিঁ।
এয়সা কোই না মিলা, পাকড়ি ছুড়াতৈ বাহি॥

আমি দেখছি জগৎ যায়, জগৎ দেখছে আমি যাই। এমন কাউকেই দেখছি না, যে ছাড়িয়ে এর বাইরে নিয়ে যায়।

নিত নহনে সে হরি মিলে তো জলজন্তু হোই।
ফলমূল খাকে হরি মিলে তো বাদুড় বাঁদরাই॥
তিরণ ভখন্‌কে হরি মিলে তো বহুত মৃগ অজা।
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলে তো বহুত রহে খোজা॥
দুধ পিকে হরি মিলে তো বহুত বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা॥

নিত্যস্নান, ফলাহার, তৃণভক্ষণ, স্ত্রী-পরিহার, দুগ্ধপান—এসব করেই যদি ভগবান মিলত, তাহলে তো জলের জীব, গাছের বাঁদর-বাদুড়, বনের হরিণ-ছাগল, হারেমের খোজা আর কোলের কচিকাঁচারাই ভগবানকে পেত। মীরা বলে, প্রেম বিনা কৃষ্ণলাভ হয় না।

কেউ বলেন :

ধন্য কলিযুগ, তোমার তামাসা দেখে দুঃখও লাগে, হাসিও পায়।

সত্যবাদীকে কেউ পাত্তা দেয় না মিথ্যুকেরা জগৎ ভোলায়। পায়ের দড়া ছিঁড়ে যাবে ঘুরে ঘুরে দুধ বেচতে গিয়ে; কিন্তু মদ বেচতে পারবে দিব্যি ঠ্যাঙের ওপর পা তুলে বসে। চোর ছাড়া পায় আর সাধুরা ধরা পড়ে। রাস্তার লোককে বিনা দোষে ফাঁসিতে লটকায়।

তুলসীদাস বলেন :

চরণ চোঁচ লোচন রঙ্গোঁ চলি মরালী চাল।
ক্ষীর নীর বিবরণ সমৈ বক উঘরত তেহি কাল॥

ঠ্যাং ঠোঁট চোখ গায়ের-রঙ চলন—অবিকল হাঁসেরই মতন। কিন্তু দুধগোলা জল খাওয়ার সময়ই বক আসলে ধরা পড়ে যায়।

ঢোলগোবিন্দ ফাঁপরে পড়ে।

মনে মনে একেবারে সেই সময়কার হয়ে গিয়ে কি ছেলেবেলার কথা ভাবা যায়?

বৃষ্টির পর ভেজা মাটি থেকে ওঠা সোঁদা গন্ধ বুক ভরে নেওয়া, গা-সিরসির-করা সকালে ঘাসের গায়ে সোনার দানাগুলোর দাম কমে বেলা একটু বাড়লে রূপো হয়ে যাওয়া, পুকুরের জলে খাপরা ছুঁড়ে ব্যাঙ নাচানো, আঁচল সরিয়ে মার বুকে মুখ ঘষা, ইট তুলে তুলে কেঁচো খোঁজা, কাঠফাটা দুপুরে ফুটো সরা থেকে টুপ-টাপ টুপ-টাপ করে শুকনো তুলসীর মাথায় সমানে জল পড়া, মাচা থেকে ঝুলে-পড়া লাউ-ঝিঙে-শশা উঠোন জুড়ে বেলযুঁই, সন্ধ্যামণি বো ামফুল মোরগঝুঁটি, ব্যাণ্ডবাজানো ছ্যাকরা গাড়ির পেছনে পেছনে ছু'ট অপেরা পার্টির অন্ত-শেষ রজনী-লেখা লাল-নীল কাগজ হাতিয়ে ফেরা, অন্ধকারে কলাগাছ আড়াল করে স্বচক্ষে পেত্নী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভয় পেয়ে 'মা-গো' বলে ছুটে পালানো, ঠাকুরদার তলপেটের নিচে মরা ইঁদুরের মতো জিনিসটা হাতে ঠেকলে গা ঘিনঘিন করা, কালভার্টের নিচে বর্ষার জলের পড়ি-মরি করে ছোটা, খাঁকি টিউনিকে হ্যাটকোট পরে দূর থেকে আসতে দেখে বাবাকে গোরাসাহেব ভেবে তাড়াতাড়ি দরজার পেছনে লুকিয়ে পড়া, কাঁটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে কুয়ো থেকে বালতি তোলার মজা দেখা, সেজোকাকার হাতে ছিপে-তোলা ট্যাংরা মাছের কাঁটা ফোটার যন্ত্রণা, জামাল সাহেব-দের ময়লা চিট শতচ্ছিন্ন শাড়ি-পরা বাঁদী অসুখী মেয়েটার বাইরের চাতালে ফেলে-দেওয়া এঁটো সিগারেট কুড়িয়ে কুড়িয়ে মৌজ করে সুখ-টান দেওয়া, দেখা হলেই পাড়ার এক বুড়োদামড়ার মঞ্জুকে নিয়ে বদ-রসিকতায় ঢোলগোবিন্দর রেগে যাওয়া, রাত্তিরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও ফুট-বলের স্বপ্ন দেখা, কোনো বাড়িতে শিন্নির লোভে গিয়ে সত্যপীর কিংবা লক্ষ্মীর পাঁচালি শোনা, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সাইকেলে পা গলিয়ে প্যাডেল ঠেলা, দূরের রাস্তা দিয়ে ঝুমুর ঝুমুর করে যায় একঘোড়ার টমটম, ডাক-

বাংলার নন্দনকাননে কাঁটাঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখা অলৌকিক সাহেব-মেমদের ডেক-টেনিস খেলা, ভিড় করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলিহার-রাজবাড়িতে ডায়নামোর কানে-তালা-ধরানো ভটর ভটর শব্দে বিজলির স্বর্গীয় আলো জ্বলতে দেখা, আকাশে মেঘের ঘনঘটায় বাজ যখন পড়ব-পড়ব করে তখন আমাদের বুকের মধ্যে নিয়ে কাঁপা কাঁপা ভীরু গলায় মা-র আওড়ানো সেই 'জয়মণি, স্থির হও' 'জয়মণি, স্থির হও'—

এসব মনে পড়ার মধ্যে কত ফেলা-ছাড়া, কত জোড়াতালি, কত কমানো-বাড়ানো—ঢোলগোবিন্দ বিলক্ষণ তা জানে। কিন্তু স্মৃতির ওপর তার হাত নেই। স্মৃতির তো ভারি বয়েই গেছে ঢোলগোবিন্দর হেড আফিসের বড়বাবু হতে। হাকিম না, হুকুম না—কারো সে তোয়াক্কা করে না। খেয়াল হলে তবেই সে আরজিমাফিক ফাইল টেনে নামাবে। তাও তার সাজ করতে ঢোলগোবিন্দর দোল ফুরোয়। আর তার পুরনো সব ফাইলই তো পোকায় কাটা।

অনেকক্ষণ মুখ বুঁজে লিখছি, এবার কিছু ফোড়ন না কাটলেই নয়।

পাঠক-পাঠিকাগণ! এতক্ষণে নিশ্চয় সমঝে গেছেন যে, ঢোলগোবিন্দ যদি ব্যাসদেব হয়, তাহলে আমি তার নিতান্ত অলক্ষুণে হস্তিমূর্খ কলমচি মাত্র। গণেশার মতন আমারও সেই একই শর্ত। বলা থামালেই লেখকপদে ইস্তফা দেব। তাই আমাকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে মাঝে-মাঝেই সে এমন ব্যাসকূট ছাড়ে যে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়।

এখন এই ভেবে আপসোস হয় যে, এ তো আজকের লেডী স্টেনো-টাইপিস্টদের কাজ। নয়তো নৈর্ব্যক্তিক মাইক্রো-টেপ। তাও আমার তো শুধুই ভেরেণ্ডা ভাজা।

পৃথিবীর প্রথম ওয়ার-করেসপনডেনট মহাভারতের সঞ্জয় আর চুকলিবাজ রোভিং-রিপোর্টার নারদের কথা ভেবে হিংসে হয়।

খাসা দিন ছিল তখন।

৯

শোলক-বলা কাজলাদিদি

ারিখের সঙ্গে-সঙ্গে একেকটা বারও জীবনের শেষ অবধি কেমন যেন নে থেকে যায়।

মা বলতেন, বুধবারে আমার নখকাটা বারণ। ওটা আমার জন্মবার।

ঢোলগোবিন্দর আসলে বুধবারটা মনে আছে সম্পূর্ণ অন্য একটা ারণে। বুধবার ছিল দিদির ইস্কুলের ছুটির দিন। যতদিন হরি ঘোষের গায়ালে ভরতি হয় নি, ততদিন বুধবারটা সারাদিন সে দিদির কাছে াকতে পারত।

উঠোনে গাছে জল দেওয়া, লক্ষ্মীগাইকে খেতে দেওয়া, বেলা পড়ে গেলে পুকুরপাড় থেকে চই-চই করে হাঁসগুলোকে ফিরিয়ে আনা, এসব াজে দিদি ছিল মা-র হাত-নুড়কুত। মাচায় শশা আর উচ্ছে, রান্নাঘরের ালে কুমড়ো, কাঁটাঅলা বোঁটায় বেগুন, মাটির তলায় পেঁয়াজ, গাছে ঙ্কা বিস্তর হত। সন্ধেবেলায় তুলসীতলায় পিদিম দেওয়া, শাঁখ বাজানো —এসব দিদিই করত।

গরমকালের কাঠফাটা রোদ্দুরে শুকিয়ে-যাওয়া তুলসীর মাথায় ঝালানো ফুটো সরা থেকে টুপ-টাপ টুপ-টাপ করে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ার দৃশ্যটা ঢোলগোবিন্দর চোখে আজও লেগে আছে। গরমকালে সকালে উঠে দিদির প্রথম কাজই ছিল সরাটাতে জল ঢেলে কানায় কানায় ভরতি করা।

এ বাড়ির অত আদরের এমন যে দিদি, যার বাপের বাড়ির নাম 'খুকী' আর বাইরের পোশাকি নাম 'রেণুকা' বা 'রেণু'—তার একদিন বিয়ে হয়ে গেল।

দিদির বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে ব্রত করার পাট সেই যে উঠে গেল, পরে তা আর কখনও ফিরে আসে নি।

কিন্তু দিদির ব্রত করার সেই ছবিটা ঢোলগোবিন্দর বুকের মধ্যে চিরদিনের মতো রয়ে গেল।

গোবরজলে নিকোনো মেঝে। তাতে পরিপাটি করে পিটুলিগোলার আলপনা। মধ্যিখানে মাটির বাঁধ দিয়ে হয়েছে পুকুর। তার মাঝখানে পাতাসুদ্ধু বেলের ডাল। পুকুরপাড়ে ছড়ানো রকমারি ফুল। দিদি বসেছে কাঠের পিঁড়িতে। বামুনপুরুতের কোনো বালাই নেই। মেজো-কাকিমা দিদিকে সব বলে বলে দিচ্ছেন। বাইরের উঠোনে ঝাঁ-ঝাঁ করছে চোত্‌মাসের রোদ্দুর।

ফুলচন্দন হাতে নিয়ে দিদি বলছে :

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা, কে পূজে রে দুপুরবেলা?
আমি সতী লীলাবতী, ভাইয়ের বোন, পুত্রবতী।
হয়ে পুত্র মরবে না, পৃথিবীতে ধরবে না।

তারপর অঞ্জলি করে দিদি যখন বলত :

পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে,
মরণ যেন হয় গঙ্গাজলে—

মনটা যে কী খারাপ হয়ে যেত বলার নয়।

দিদির বিয়ে হয়ে মা বেশ একটু ঝাড়াহাতপা হতে পেরেছিলেন। তা ছাড়া মা-র কাজের বোঝা হালকা হয়েছিল মেজোকাকিমা আসার পর।

সে সময় বাবুদের বাড়িতে জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কাজই করত বাবুদের অবাঙালী পিওনেরা। মাসে একবার করে তারা আপিসে যেত শুধু টিপসই দিয়ে মাইনে আনতে। থাকার জন্যে তাদের ছিল দুটি বেডের একটি করে ঘর। সে ঘরে চাকরিপ্রার্থী দেশোয়ালি আদমিদের ভিড় সারা বছরই লেগে থাকত। আবগারির লোক বলে বিনা পয়সায় ওদের ঘরে হরবখত গাঁজার জমাটি আড্ডা বসত।

বাবার যে বাড়ির পিওন ছিল, তার নাম শুভালাল। আমাকে 'রামবাহাদুর' আর দাদাকে 'জংবাহাদুর' বলে ডাকত। সামনের দুটো দাঁত ছিল সোনা বেঁধানো। একটা হাতে উলকি। যেমন আমাদের ভালোবাসত, তেমনি শাসনও করত। আর দেবতার মতো ভালোবাসত বাবাকে।

আপিসের পিওন ছিল স্থানীয় এক মুসলমান। মাঝে-মাঝে তগিতে-ধরা জিওল মাছ এনে আমাদের খাওয়াত।

ইস্কুলের ক্লাসঘরে বা খেলার মাঠে যে বন্ধুত্ব তার মধ্যে জাত-ধর্ম-বর্ণের কোনো খাদ থাকত না। মুশকিল হত কেউ কারো বাড়িতে গেলে। জীর্ণ সংস্কারের কাপড়ে সেই বৈষম্য কিছুতেই ঢাকা যেত না।

কেউ এক গ্লাস জল চেয়ে বসলে কিংবা বাইরের কাউকে খেতে বললে তার এঁটো ধোয়া নিয়ে বাড়ির কাজের লোকেরাই বেঁকে বসত। আমাদের বাড়িতে এ নিয়ে কোনো মুশকিল ছিল না। আগে থেকেই সবাইকে বলা থাকত, বাইরের লোকের এঁটো থালাগেলাস মা নিজেই সব ধুয়ে রাখবেন।

ছোঁয়াছুঁয়ির এই ব্যাপারটা ষোল আনা চাপা যেত না। যার মনে লাগাব তার ঠিক লাগত। তখন নিজেদের খুব বোকা বোকা মনে হত।

উচ্চবর্ণের বলে সে আঁচ আমাদের গায়ে লাগত না। মনে মনে অস্বস্তি হওয়ার সেটা ছিল একটা বড়ো কারণ।

বাবার চাকরির সূত্রে নওগাঁকে যতটুকু জেনেছিলাম, আড়ে-বহরে তা খুব বেশি নয়।

গাঁজার জায়গা বলে দেশের লোকে তখন একডাকে নওগাঁকে চিনত। গাঁজা ছাড়া ছিল পাট।

নওগাঁয় ছিল পাটের বিরাট সমবায়। সে সময়ে সমবায়ের প্রাণ-পুরুষ ছিলেন সরকারের এক বড় আমলা। যামিনী মিত্তির মশাই। শয়নে জাগরণে তাঁর স্বপ্ন ছিল সমবায়। বাবা তাঁকে চিনতেন। তাঁর অত সাধের সমবায় আন্দোলন মার খাওয়ায় শেষ জীবনটা তাঁর কী রকম

মনঃকষ্টে কেটেছিল, বাইরে-ঘরের সেসব আলোচনার ছিটেফোঁটা মাঝে-মাঝে আমাদের কানে ছিটকে আসত।

গাঁজা-চাষের বাঁধা-ধরা একটা এলাকা ছিল। যারা গাঁজার চাষ করত তাদের বলা হত খেতাল।

বছরের একটা সময়ে আমাদের কোয়ার্টারের সামনে রথের মেলার মতন ভিড় জমে যেত খেতালদের। তারা আসত পাট্টা বদলাতে। কলকাতা থেকে বাড়তি লোক আসত চাতোরের ডিউটিতে। 'চাতোর' কথাটা তখনই যা শুনেছি। ঠিক মানেটা কখনও জেনে নেওয়া হয় নি।

চাতোরের বাবুরা এসে তাঁবুতে থাকত।

এই সময় আমি আর দাদা একটা কেটলি আর একটা ঘটি নিয়ে খেতালদের জল দিতাম। তারা যে কত দোয়া দিত বলার নয়। আমাদের কাছে ওটা ছিল খেলা।

খেতালদের মধ্যে যারা ছিল শাঁসালো, তারা খাতির পেত—বসবার জন্যে তাদের চেয়ারও জুটে যেত। বাকিরা সবাই ঘাসের ওপর ঘট হয়ে বসে থাকত। পাট্টা বদলানোর দিনগুলোতে মাঠে তিল ধারণের জায়গা থাকত না। খেলা বন্ধ করে আমরা তখন পুকুরে ছিপ নিয়ে বসে যেতাম।

এরই কাছাকাছি একটা সময়ে নদীর ধারের গাঁজাগোলায় উদ্বৃত্ত হওয়া মন-মন বাতিল গাঁজা যখন পুড়িয়ে ফেলা হত, রাস্তার মানুষ কাপড়ের খুঁটে নাক চাপা দিয়ে হাঁটত। সে গাঁজার কতটা সেই আগুনে আর কতটা কার কলকেয় পুড়ত কে তার হিসেব রাখে?

এমনি একটা সময়ে বিমলকাকাবাবু এসেছিলেন। উনি বড় চাকুরে। ওঁর জন্য খাটানো হয়েছিল একটা বড় তাঁবু। বিমলকাকা ছিলেন খুব শৌখিন লোক। সাহেবি মেজাজ। ওঁর স্ত্রীকে সবাই মেমসাহেব বলত। উনি ছিলেন বেশ খাণ্ডারনি মহিলা। সন্ধেবেলা অরগান বাজালে কী হবে, চাকরবাকরদের ইংরিজিতে ড্যাম-ইস্টুপিড বলতেন। বিমলকাকাবাবু ছিলেন নাকি পাঁড় মাতাল। নইলে কারো

চোখ ভাঁটার মতন হয়।

সন্ধে হলে ছুতোনাতায় আমরা একবার অন্ধকারে তাঁবুর পাশ দিয়ে ঘুরে আসতাম। তাঁবুর একধারে ছিল রসুইঘর। সেখানে বিমলকাকাবাবুর বাবুর্চি মুরগি রাঁধত। মশলাদার মাংসের ঝাঁঝালো গন্ধে আমাদের জিভে জল আসত। মাঝে-মধ্যে যে দু-চারজন ইয়ার-দোস্তদের নেমন্তন্ন করে ওঁরা খাওয়াতেন তারা সবাই ছিল সরকারের ওপরমহলের লোক। ফলে বাবুর্চির অত ভালো রান্না কোনোদিন আমরা চেখে দেখার সুযোগ পাই নি।

কিন্তু সকালে যখন দেখতাম রাস্তার পাশে মুরগির পালকগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে, মানুষগুলোকে ভারি নিষ্ঠুর বলে মনে হত।

পাড়ার ছাঁ-পোষা লোকজনেরা ওঁদের সাহেবি কেতা আদৌ পছন্দ করত না। বিমলকাকাবাবুর দামি ছড়ি, ফেলে-দেওয়া মদের বোতল আর বাড়িতে আয়াবাবুর্চি রাখার মধ্যে তারা এমন এক লাটসাহেবির গন্ধ পেত, যেটা মাইনের টাকায় হওয়া কোনোমতেই সম্ভব নয়।

সকলের ভাগ্যি ভালো নওগাঁর মতো ছোট জায়গায় বেশিদিন ওঁদের মন বসে নি।

আমাদের পাশে বিরাট টানা বারন্দাঅলা ব্যারাকবাড়িটাকে সবাই বলত মেসবাড়ি। আজকের দিনে হলে নাম দেওয়া হত অতিথিনিবাস।

যাদের পাকাপাকিভাবে কোয়ার্টার মেলে নি, যারা আসত এটা-সেটা অস্থায়ী কাজে—শীল্ডে ফুটবল খেলতে, বছরের শেষে ইস্কুলে ইস্কুলে বই ধরাতে, গ্রামাঞ্চলে বন্যার ঠেলায়। এইরকম নানা সুবাদে আসা মানুষজনের পায়ের ধুলো পড়ে মেসবাড়িটা সম্বৎসর সরগরম থাকত।

পুকুরের তিন পাড়ে তিনটে দোতলা বাড়ি। লাল ইঁটের। দক্ষিণের বাড়িটা রেজিস্ট্রারের। সামনে পেছনে প্রকাণ্ড বাগান। খেলাধুলো করবার জন্যে যেতাম গট গট করে সদরের গেট দিয়ে। কিন্তু নারকোলে কুল আর কাঁঠালচাঁপা পাড়তে হলে যেতাম ঝাঁ-ঝাঁ রোদে

ঠিক-দুপুরে পেছনের তারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে।

পুবের লালরঙা দোতলা বাড়ির খিড়কিতে ছিল প্রকাণ্ড পুকুর। সেখানে মাঝে-মধ্যে শৌখিন শিকারীরা ছিপ নিয়ে বসত। কে নাকি সেখানে আধমনি, কে তিরিশ-সেরি মাছ তুলেছে—এই নিয়ে কী বারফাট্টাই।

আমরা যখন যাই, তখন ওই তিনটে বাড়ির দক্ষিণেরটাতে থাকতেন কবির সাহেবরা, পুবেরটাতে একজন আবগারি সুপারিনটেনডেন্ট আর উত্তরেরটাতে থাকত ছোট আলমগীবরা।

ছেলেবেলার কোন্ কথা কেন মনে থেকে যায়, হয়তো তা মনস্তত্ত্ববিদেরা বলতে পারেন। কিন্তু জেনে কী লাভ হবে?

এই যেমন, ছোট আলমগীরদের বাড়িতে প্রথম দেখেছিলাম দোতলার স্নানের ঘরে চেয়ার-কমোড। সাহেবরা নাকি উবু হয়ে বসতে পারে না। এসব বাড়ি তো তখন সাহেবদের কথা ভেবেই তৈরি হত। চেয়ারের মাঝখানের ফুটোটুকুই আমি দেখেছিলাম। শুনেছিলাম তাতে দরকারের সময় অ্যালুমিনিয়ামের একটা বাটি লাগিয়ে নেওয়া হয়।

কিংবা পুবের বাড়িটার উঠোনে দাঁড়িয়ে দোতলার রেলিঙের ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখেছিলাম একটা বড়ো গড়গড়ার নল মুখে লাগিয়ে এক গিন্নিবান্নি মানুষকে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়তে।

মেসবাড়িতে যেই যখন আসুক, ছোটদের সঙ্গে তাদের ভাব না হয়েই পারে না।

আজ এ-দপ্তর, কাল সে দপ্তর। এইভাবে সরকারি বাবুরা প্রায়ই আসতেন প্রদর্শনী নিয়ে। কখনও বন, কখনও কৃষি। কখনও চামড়া, কখনও তাঁত।

কোয়ার্টারে যাঁরা সপরিবারে থাকতেন, দুদিনের জন্যে আসা অতিথিদের নিয়ে তাঁরা খুব একটা মাথা ঘামাতেন না। কে কেমন লোক কে জানে। বিবাহিত না অবিবাহিত, কার কী জাত জানা নেই। উটকো লোক বাড়িতে এলে পাড়ায় তা নিয়ে কথা হতে পারে। বেশির

ভাগেরই তো ছোকরা বয়েস। কেউ কেউ আবার স্নো-পাউডারও মাখে। ডাইনে-বাঁয়ে সিঁথি কাটে।

ওদেরও বয়ে গেছে বড়দের সঙ্গে গায়ে পড়ে ভাব করতে। বারান্দার বাইরে যে ছেলেরা দুমদাম বল পেটাচ্ছে আর ঘরে বল চলে গেলে একদৌড়ে কুড়িয়ে আনছে, একটা বিস্কুট দিয়ে আর গোপাল-ভাঁড়ের দুটো গল্প বলে তাদের অনায়াসে হাত করা যায়। ওরাই তো পাড়ার গেজেট। সকলেরই হাঁড়ির খবর রাখে। তা ছাড়া যখন-তখন ফাইফরমাসও খাটিয়ে নেওয়া যায়।

আমাকে তো একজন হাত করেছিল স্রেফ একটা কাঁচের টেবিলচাপা দিয়ে। আমার কাছে সে এক আশ্চর্য ম্যাজিক। চারদিক বন্ধ একটা নিরেট কাঁচের মধ্যে আস্ত একটা সবুজ গাছ। ভাবতে পার?

ঢোলগোবিন্দ গুম হয়ে বসে থাকে।

তার মনে পড়ে যায়, সাপের চামড়ার প্রদর্শনী নিয়ে আসা এক ভদ্র-লোকের কথা। তাঁর টেবিলে ছিল চারকোনা ব্লটিং কাগজের একটা প্যাড। অসাবধানে তার হাত লেগে দোয়াতের খানিকটা কালি তার ওপর চলকে পড়তেই সে দেখল এক অবাক কাণ্ড। টলটলে কালিটাকে ব্লটিংপেপার যেই না শুষে নিল, অমনি তা দেখতে হল সান্তাহার স্টেশনে অবিকল রাত পুইয়ে সকাল হওয়ার মতন।

ঢোলগোবিন্দর জীবনে এ জিনিস আরেকবারও ঘটেছিল।

ও তখন দমদম জেলে। রেল-ধর্মঘটের ডাক দেওয়ার পর গোটা জেলখানায় তখন বন্দীর ভিড়ে পা ফেলার জায়গা নেই। এক সপ্তাহে ওর ওপর পড়ল চার শো লোকের চা তৈরির ভার। বিরাট-বিরাট হাঁড়ি আর ডেকচি। টিন টিন দুধ। একেবারে যজ্ঞিবাড়ির ব্যাপার।

গুঁড়ো চায়ের পুঁটুলি ডুবিয়ে লিকারের রং হয়েছে কষকষে। যেই না তাতে দুধ পড়া, অমনি অবিকল সেই সান্তাহারে সকাল হওয়া।

পৃথিবীতে সবার মন একরকমের নয়। পঞ্চেন্দ্রিয় কুড়িয়ে-বাড়িয়ে পাঁচ আঙুলের যে ছাপ তুলে রাখে, সেসব ছাপ যার-যার তার-তার।

দিদির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকেই মা-র মধ্যে একটা ঝাড়াহাতপা হওয়ার ভাব।

মেজোকাকিমা যে মার অতটা ন্যাওটা হয়ে যাবে, এটা বোধহয় কাকাদের ঠিক হিসেবে ছিল না। মেজো ছেলের জন্যে ফরসা মেয়ে এনে ঠাকুরদাও বোধহয় মনে মনে এই ভেবে খুশিই হয়েছিলেন যে, বড় বউমার ওপর একহাত নেওয়া গেছে। তার মানে রঙের তুরুপ।

কাকিমা এসে মা-র সংসারের বোঝা একটু হালকা হওয়ায় মা-র মধ্যে আস্তে আস্তে একটা চনমনে ভাব ফুটে উঠছিল। একটু ফাঁক পেলেই পাড়ায় এবাড়ি ওবাড়ি যাওয়া, যে শোক পেয়েছে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া, যে ভয় পাচ্ছে তাকে ভরসা। এবাড়িতে হাম, ওবাড়িতে বঁটিতে হাত কাটা। একটা না একটা লেগেই থাকে। মা সবকিছুরই টোটকা জানেন।

বাবা যে এত এখানে ওখানে যান, বাবার কাছে প্রায়ই যে কাজেকর্মে এত লোক আসে, বাইরের ঘরে এত যে লম্বাই-চওড়া কথা হয়—তবু আমাদের জগৎটা সেই সরকারি কোয়ার্টারের মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। সেই থোড়বড়িখাড়া, আর খাড়াবড়িথোড়।

একবার সমবায় নিয়ে সারা-বাংলা কী একটা সম্মেলন হয়েছিল। শামিয়ানা টাঙানো হয়েছিল পার্কে কো-অপের মাঠে। চারপাশ ঘিরে পড়েছিল সার-সার তাঁবু। আমার ছিল সেটা চোখে-না-দেখা, শুধু দাদার কাছে শোনা কথা। কেননা তখনও আমি অত দূরে যাওয়ার মতন বড় হই নি।

আমার জিভে লেগে আছে শুধু তার স্মৃতি।

ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে দার্জিলিং থেকে এসেছিলেন একজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক। সমবায়ের কোনো কেষ্ট-বিষ্টু। ছেলেটির কী যেন নাম। বোধহয় বীর বাহাদুর। তার সঙ্গে আমার দাদার হয়ে গিয়েছিল হলায়-

গলায় ভাব। ফিরে গিয়ে দাদাকে ইংরিজিতে চিঠিও দিয়েছিল। দাদার আর দেব-দেব করে উত্তর দেওয়া হয়ে ওঠে নি। আসলে তা নয়। দাদা বোধহয় বুঝেছিল, নওগাঁয় ক্লাস ফোর-এ পড়া ছেলের পেটে এমন বিদ্যে গজায় না যাতে সে ইংরিজিতে চিঠির উত্তর দিতে পারে।

কিন্তু সেটা কথা নয়। বীর বাহাদুর চলে যাবার আগে সম্মেলনে বেঁচে-যাওয়া চানাচুরের বড়ো একটা টিন দাদাকে দিয়ে গিয়েছিল। জীবনে সেই প্রথম আমার চানাচুর খাওয়া। তার স্বাদ আজও আমার মুখে লেগে আছে।

আর মজা হত শীল্ডের খেলা হলে। উত্তর-বাংলার নামী-নামী সব ক্লাবের প্লেয়াররা এসে উঠত মেসবাড়িতে।

আমাদের তখন পায় কে!

রেলের লোকোটিম আর জেলাশহরের টাউন ক্লাবগুলো শীল্ডে খেলতে আসত। আমাদের কাজ ছিল মেসবাড়িতে গিয়ে প্লেয়ারদেব যাবতীয় ফাইফরমাস খাটা আর ভক্তিভরে তাদের পা টিপে দেওয়া। উত্তর-বাংলায় কীসব প্লেয়ার ছিল তখন। শরৎ সিং, তরু সেনগুপ্ত। ছোটদের সব হিরো। একেকটা যেন হীরের টুকরো।

জলপাইগুড়ি থেকে এল একবার এক জাঁদরেল টিম। সে টিমের যিনি ম্যানেজার হঠাৎ তিনি সটান আমাদের বাসায় এসে হাজির। স্বয়ং টিমের ম্যানেজার! ভাবা যায়?

কী ব্যাপার? না, কাকিমা বললেন ওঁর বাবার পিসতুতো দাদা হন যে। তার মানে সম্পর্কে আমাদের দাদামশাই। তবে তো খুবই আপন। আমাদের বাড়িতে না থাকুন, একদিন তো ওঁকে খেতে বলাই উচিত।

কাকিমারই তো নিজে থেকে আগ বেড়ে বলা উচিত ছিল। তা নয়। আমাকে আর দাদাকেই এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হল। বড়দের নিয়ে এই হল মুশকিল।

সব ব্যাপারেই ওদের কিন্তু কিন্তু

কাকিমার কথা শোনো। বলেন কি, 'আত্মীয় আবার কিসের?

যাকে বলে কুটুম। তা ছাড়া ওই পরিবারের নাকি বড়ো বেশি টাকার গুমর। চা-বাগানের শেয়ার আর জমিদারির আয়ে পায়ে পা দিয়ে বসে খায়। কাপ্তান বলতে যা বোঝায়, ভদ্রলোক হলেন তাই। শিকার আর ফুটবল—এই নিয়েই দিব্যি আছেন।

আঃ, কী দেবদূতের মতো চেহারা। মাজা রং, প্রশস্ত কপাল। ব্যাকব্রাশ-করা চুল। সোনার চশমা। ঢুলু ঢুলু চোখ। গাল দুটো একটু ভাঙা। গরদের পাঞ্জাবি। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসেছিলেন আসর জাঁকিয়ে।

ভদ্রলোককে চোখ কুঁচকোতে দেখে দাদা পিছিয়ে আসছিল। পেছন থেকে ঢোলগোবিন্দ হাত দিয়ে আটকাল। কে যোগমায়া? কে বরদা-কান্ত? মাথায় ঢুকছিল না। যাই হোক, আবগারি কথাটায় শেষ পর্যন্ত কাজ হল।

আমাদের উদ্ধার করতে বা ড়তে উনি এলেন। বাইরে কচিকাঁচাদের ভিড় জমে গেল। ভাইঝির সঙ্গে ব্যবহারটা করলেন শালীর মতই। আমি আর দাদা কৃতার্থ। অত বড় একজন লোক। কিন্তু কী আত্মীস্থয়! দুপুরে চর্বচোষ্য খেয়ে বিছানায় লম্বা হলেন। আমরা পা টিপে দিলাম। উনি ঘুমোলেন।

পরে কী হল, বলব?

অবশ্য না বলারই বা কী আছে। ঢোলগোবিন্দ বোঝে জীবনে এইরকমই হয়।

জলপাইগুড়ি উঠল ফাইনালে। উঠবে না? উঠবেই তো। কার টিম? সেটা তো দেখতে হবে।

আমার কাকিমার বাবার সাক্ষাৎ পিসতুতো দাদা। প্রায় আপন।

মাঠে সেদিন সারা শহর ভেঙে পড়েছে। ধুবড়ির সঙ্গে ফাটাফাটি খেলা।

হাফটাইমের আগে একটা গোল খেয়ে জলপাইগুড়ির থোঁতা মুখ ভোঁতা। আমি আর দাদা সমানে এতক্ষণ বাক-আপ বাক-আপ বলে

চেঁচিয়েছি। গোল খেয়ে আমাদের তখন কাহিল অবস্থা। আর হবি তো হ, হাফটাইমের পর আবার একটা গোল।

হঠাৎ দেখি, আমাদেরই আত্মীয়—থুড়ি, কাকিমার কুটুম—সেই ভদ্রলোক মদ খেয়ে বেহেড অবস্থায় মাঠের ভেতরে চলে গিয়ে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করে দিয়েছেন আর দু হাতে কাপড় তুলে যাচ্ছেতাই সব খিস্তি করে চলেছেন। শহরের লোকে থাকতে না পেরে ছুটে গিয়ে যখন তাঁকে চ্যাংদোলা করে মাঠ থেকে বার করে আনছে, তখন আমি আর দাদা আর সেখানে থাকি? ফুটবলের খুরে দণ্ডবৎ করে সোজা বাড়ি।

পরের দিন বন্ধুরা কেউ যখন বলেছে, 'হ্যাঁরে, তোদের সেই আত্মীয়—', তখন তার উত্তরে এমন একটা ভাব করে তাকিয়েছি যেন বলতে চেয়েছি, 'আত্মীয় না কচু! বাসায় এসেছিল বটে, তবে ভালো করে তাকে কেউ চেনেই না—উঁহু, আমার কাকিমাও না।'

ছোটরা কীরকম বিচ্ছু হয়, ঢোলগোবিন্দ নিজেকে দিয়ে তা বিলক্ষণ জানে।

মেসবাড়িতে এসে উঠত বিচিত্র ধরনের মানুষ। মেয়াদ কারো কম, কারো বেশি।

চাটগাঁ থেকে কোনো এক আত্মীয় আবগারি অফিসারের চিঠি নিয়ে মেসবাড়িতে এসে উঠেছিলেন এক ওষুধের ব্যবসায়ী। খাড়া নাক, লম্বা মুখ, খদ্দর পরার দরুন বেশ সাত্ত্বিক চেহারা। তিনি চলে যেতে সারা শহর চালমুগরার সাবানের বিজ্ঞাপনে ছেয়ে গেল।

যেসব বউরা প্রথম সাক্ষাতেই মা-কে মাসিমা বলতেন, তাঁদের বউদি বলে ডাকার অভ্যেসটা আমাদের সড়গড় হয়ে গিয়েছিল।

এইরকমের এক বউদি একবার ঢোলগোবিন্দর মনে বড় দাগা দিয়েছিলেন।

ব্যাপারটা অবশ্য এমন কিছুই নয়।

'ডেপুটির জীবনচরিত' লিখেছিলেন কে? গিরীশ সেন? না, গিরীশ

নাগ? যিনিই লিখে থাকুন, তাঁর ছেলে। আর ছেলের বউ। আর ছেলের বউ মানে, আমাদের বউদি।

বউদির ছিল ভারি মিষ্টি চেহারা। নইলে কি আর ঢোলগোবিন্দর সঙ্গে ভাব হয়? দেখতে ভালো হবে, মানুষটা ভালো হবে—তবে ঢোল-গোবিন্দ তার কাছে ঘেঁষবে।

দাদাবউদি দুজনেই ছিলেন একটু মুখচোরা চাপা ধরনের মানুষ। ঢোলগোবিন্দ মনে করতে পারে না দাদার চাকরিটা ঠিক কী ছিল।

(হ্যাঁ, ঢোলগোবিন্দর অসাক্ষাতে একটু চিমটি কেটে একটা কথা জনান্তিকে আপনাদের জানিয়ে রাখি। ঢোলগোবিন্দ বেজায় ভুলো লোক। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাতে ওর জুড়ি নেই। ওকে একটু চেপে ধরুন, দেখবেন একই মুখে দুরকমের কথা বলছে। সেই সঙ্গে বয়সের ব্যাপারটা তো আছেই। একবার মুখ খুললে আর থামে না। একই কথা দশ জায়গায় দশ রকম করে বলবে। মাঝের থেকে চোর দায়ে লোকে আমাকে ধরে। বলে, তুমি লেখ কেন ওসব ছাইপাঁশ।

(আমার কপালটা কী। একবার দেখুন, ধর্মাবতার! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। পেট চালানোর জন্যে আমাকে তো লিখতেই হবে, ধর্মাবতার!

(ঢোলগোবিন্দকে মাঝে-মাঝে আমি জেরা করি না তা নয়। ওর এই দাদাবউদির প্রসঙ্গটাই ধরুন না কেন। ওকে জিগ্যেস করেছিলাম দাদাটির গোঁফ ছিল? ও বলেছিল, হ্যাঁ—বেশ পুরুষালি গোঁফ। তার ঠিক দু মিনিট পরেই বলে কিনা—না হে না, গোঁফটা কেটে দাও। তাহলেই বুঝুন, ও ব্যাটা আমাকে দিয়ে যেমন লেখকের, তেমনি নাপিতের কাজটাও করিয়ে নিচ্ছে।)

সেদিন ছিল সরস্বতী পুজো। সকালে উঠে স্নানটা সেরে নিয়ে সাঁ করে ঢোলগোবিন্দ চলে গিয়েছিল বউদিদের বাড়ি। গিয়ে দেখে দাদার হাতে কী একটা বই।

'কী গো দাদা, আজ না অনধ্যায়? দূর, আজ কেউ বই পড়ে?'

বলে ঢোলগোবিন্দ ছোঁ মেরে বইটা কেড়ে নেয়। দাদার ঠোঁটে স্বভাব-সুলভ হাসি নেই। চোখটা একটু কুঁচকে আছে। তাও যথাসম্ভব মোলায়েম করে বললেন, 'বইটা দাও।'

কোথায় যেন একটা তাল কেটে গেছে। ঠিক এরকম হওয়ার তো কথা ছিল না।

ভেতরে ঢুকে দেখল বউদি চা-টোস্ট খাচ্ছে। ঢোলগোবিন্দ একটু অবাক হয়েই বলল, 'সে কী বউদি, তুমি অঞ্জলি দিতে যাবে না?'

বউদি একটু হেসে চুপ করে থাকলেন। তারপর ঢোলগোবিন্দর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, 'না রে, গোবিন্দ। আমাদের যেতে নেই।'

ঢোলগোবিন্দ যেন চাবুক খেয়ে চমকে উঠল।

'যেতে নেই? কেন?'

'বা রে, তুই জানিস না! আমরা যে ব্রাহ্ম। হিন্দু নই।'

ঢোলগোবিন্দ ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল। চোখে সে কেমন যেন অন্ধকার দেখতে লাগল। বউদিরা হিন্দু নয়? তাহলে ব্রাহ্মরা কী?

সেবার পাড়ায় হৈ-হৈ কাণ্ড রৈ-রৈ ব্যাপার। সত্যিই হৈ-হৈ কাণ্ড রৈ-রৈ ব্যাপার।

বাঘ নয়। সিংহ নয়। সার্কাস নয়। চিড়িয়াখানা নয়।

হাতি। হ্যাঁ মশাই, সত্যিকার হাতি।

ঢোলগোবিন্দরা দেখল কোথাকার কোন দুবলহাটি না দিঘাপতিয়া থেকে উড়ে এসে জমিদারের এক হাতি ওদের খেলার মাঠটা জুড়ে বসেছে। ওর যা শুঁড় দোলানোর কেতা, তাতে কার সাধ্যি তাকে দূর-যা করে তাড়ায়। ওর কুলোর মতো কান দুটো দিয়ে ছোটদেরই বরং সে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করছে।

শুভালালদের কাছ থেকেই এ ব্যাপারে প্রথম একটা পাকা খবর পাওয়া গেল।

বর্ষায় দেশগ্রামের কী হাল হয়েছে দেখে এসো গা। এখানে পোস্টাপিসেরই তো হাতায় জল। রাজবাড়ি ডুবুডুবু। তা জমিদরবাবুরাই তো এয়েছেন হাতির পিঠে চেপে। তিন দিন তিন রাত যে জল হল, সে কি সোজা বৃষ্টি। জল না নামা পর্যন্ত ওঁয়ারা এখেনেই থাকবেন। ওই মেসবাড়িতে।

ঢোলগোবিন্দর প্রথমেই মনে হল, খেলার মাঠটা গেল বেহাত হয়ে। তারের বেড়ার ও-পাশটা দিয়ে একবার সে ঘুরে দেখে এসেছে। হাতিটার সমানে মুখ চলছে। কচি কচি ডালপালা কচরমচর করে খাচ্ছে। কদিন থাকলে ওর নাদাতেই তো মাঠের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কিছু বলাও যায় না। বানভাসি হয়ে এসেছে হাজার হোক।

বাপ রে, অত লটবহর আর অত লোকলস্কর! আনল কেমন করে! আবার কত বায়নাক্কা! দরজায় ঝুলিয়েছে বাহারি পরদা। বারান্দায় দুই বরকন্দাজ। বসে বসে খৈনি ডলে আর থুথু ফেলে। ডে-লাইটে আলো হয়ে থাকে সারা বাড়ি।

বাজার থেকে আসে তাড়া-তাড়া পান। বারান্দার নিচেটা পানের পিকে লাল হয়ে থাকে।

বাবুর্চি আর খানসামা, ঝি-চাকর আর হুঁকোবরদারে সারা বাড়ি গমগম করে।

হাতি দেখতে সারাদিন ভেঙে পড়ে শহরের লোক।

ঢোলগোবিন্দদের গোড়ায় মজা লেগেছিল, কিন্তু ছাঁ-পোষা লোকদের পাড়ায় অত বড়লোকি কদিন সয়?

গায়ে সন্ধের অন্ধকার ঢাকা দিয়ে কারা নাকি সব ও-বাড়িতে আসে। হারমোনিয়াম এসরাজ আর তবলার সঙ্গে শোনা যায় ঘুঙুরের বোল। মাঝে-মাঝে নাকি বড় বড় কালোয়াত আসে। মাইফেল হয়। ঢোলগোবিন্দরা তার কী জানবে? সন্ধে হলেই তো ওদের চোখ ঘুমে ঢুলে আসে। ওরা শুধু শুনতে পায় পাড়ার লোকের গজর-গজর। আর দেখে দূর থেকে তাদের ল্যাজনাড়ানো আর তড়পানো।

বানের জল নেমে গেলেও জমিদারবাবু কিন্তু নড়েন না। একা
াতিটাই যা মাঠ ছেড়ে এদিক ওদিক টহল দিয়ে বেড়ায়।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল বারান্দার নিচে একটা খাট নামিয়ে
ারকোলদড়ি দিয়ে লম্বা-লম্বা বাঁশের সঙ্গে বাঁধা হচ্ছে। বারান্দায় রাখা
য়েছে ফুলের কয়েকটা তোড়া। বাড়ির ঝি-রা ঘরের বাইরে এসে চোখে
াচলের খুঁট চাপা দিচ্ছে।

জমিদারগিন্নীকে ধরাধরি করে যখন খাটে তোলা হল, তখন নাকি
ার মুখটা নীল দেখিয়েছিল।

পাড়ায় এতসব কাণ্ড হয়েছে—না ঢোলগোবিন্দ, না তার দাদা
বন্দুবিসর্গও জানতে পারে নি। ওরা দুজনেই তখন ইস্কুলে।

গোটা পাড়ার লোক এই প্রথম অন্তঃপুরবাসিনী জমিদারগৃহিণীকে
দখল। চোখ দুটো বেলপাতা দিয়ে ঢেকে দিলেও তাঁর রূপ নাকি তখনও
ঁকরে পড়ছিল। ঝিদেরই কেউ নাকি 'মা, তোমার গৌর বর্ণ নীল হল
কসে' বলে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। 'কিসে' বলেছিল, না 'বিষে' বলেছিল
—এ নিয়ে মতান্তর থাকলেও, এটা যে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার ব্যাপার
াতে কারো কোনো সন্দেহ ছিল না।

এর কদিন পরই জমিদারবাবুরা শহরের পাট উঠিয়ে নিজতালুকে
ফিরে গেলেন।

ারুনীদির কথাটা শেষ না করায় আধকপালে হয়ে আছে।

ঘটনাটা ঘটেছিল আমরা নওগাঁ থেকে চলে আসার বছর দশেক
পর।

মা একদিন গিয়েছিলেন কালীঘাটে। ফিরে এসে দরজা দিয়ে ঢুকতে
ঢুকতেই মা চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'দেখে যা রে সবাই, সঙ্গে করে কাকে
এনেছি।'

নিচে নেমে এসে দেখি, ছেঁড়া ময়লা শাড়ি পরে শুকনো চেহারার
এক স্ত্রীলোক। সঙ্গে এণ্ডাগণ্ডা। মা বললেন, 'চিনতে পারছিস নে—

আমাদের মরুনী রে !'

আমাদের নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। যদি সত্যিই মরুনীদি হয়, তো এ কি চেহারা হয়েছে মরুনীদির !

মা পরে আমাদের বলেছিলেন। কালীঘাটের কাঙালীরা যে দিক-টাতে ভিড় করে থাকে, সেখান থেকে হঠাৎ মাকে দেখতে পেয়ে মরুনীদি মা-র কাছে আসেন।

আমরা নওগাঁ থেকে চলে আসার পরই মরুনীদির স্বামী হঠাৎ এক-দিন শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। অথচ স্বামীর হাতে বোনকে ছেড়ে দিতে ভাইরা একেবারেই রাজি ছিল না। মরুনীদিই নাকি জোর করে চলে আসেন।

তারপর আর কী ? দুজনে বস্তিতে এসে ওঠে। স্বামী চেয়েচিন্তে য পায় নেশা করে ওড়ায়। বছর বছর ছেলে বিয়োনো আর তাদের অন্নের যোগাড় মরুনীদিকেই করতে হয়। ঘরে বসে সারাদিন ঠোঙা বানায় এই করেই চলে।

সেই থেকে আমাদের বাড়িতে কাগজ জমিয়ে রাখা হত, মরুনীদি এসে এসে নিয়ে যেতেন। এলে ছেলেপুলে নিয়ে একবেলার খাওয়াট মা-র কাছেই হত।

এইভাবে যেতে যেতে এসে গেল পঞ্চাশের মন্বন্তর। বেশ কিছুদিন মরুনীদির খোঁজ নেই। অসুখবিসুখ করল না তো ? মা ছুটলেন বস্তিতে খবর নিতে। মরুনীদি যে ঘরে থাকতেন, সেখানে গিয়ে মা দেখেন অন্য ভাড়াটে। ওরা নাকি মাসখানেকের ভাড়া বাকি পড়ার পর একদিন বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে অন্য কোথাও চলে গিয়েছে।

মা কালীঘাটের হেন জায়গা নেই যেখানে ওদের খোঁজ করেন নি। এমন কি লজ্জার মাথা খেয়ে নিষিদ্ধ পাড়াতেও যেতে ছাড়েন নি।

মরুনীদিকে কে আবার ফুসলে নিয়ে চলে গেল ? মৃত্যু, না জীবন ?

সে প্রশ্নের আজও হদিশ পাই নি।

১০

চল্ সরষে, কামাখ্যা যাই

রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর ঢোলগোবিন্দরা শুয়ে পড়ে। মা-কাকিমা খাবে সবার শেষে। আঁচানোর পরই তো আর ওদের শুতে গেলে চলে না। ঘর-সংসারের শেষ কাজ কিছু বাকি থেকে যায়। কিছুটা ঝাঁটপাট, দু-চারটে এঁটো বাসন ধুয়ে রাখা, তারপর দরজা জানলা দেওয়া। সব সেরেসুরে আঁচলের চাবি খুলে পান মুখে দিয়ে একটু দম ফেলে নেওয়া। ব্যাস, মা-র সেদিনকার মতন ছুটি।

খিড়কিতে হুড়কো দেওয়ার শব্দে ঢোলগোবিন্দর কাঁচা ঘুম আচমকা ভেঙে গিয়েছিল। বাইরে মা-র গলা।

অবাক হয়ে উঠে পড়ে বাইরের জানলার দিকে ঢোলগোবিন্দ ছুটে গিয়েছিল। আশ্চর্য তো! এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছে মা? মা-র সামনে লণ্ঠন নিয়ে আগে-আগে চলেছে একটা লোক। লোকটার কেমন যেন একটা সেপাই-সেপাই খটরমটর ভাব। মা-র সাদা শাড়ির লালপাড়ে নাচতে নাচতে চলেছে লণ্ঠনের আলো। মাকে সবাই কালো বলে কেন? কী সুন্দর দেখতে রে, মাকে!

এত রাত্রে পাটভাঙা শাড়ি পরে মা কোথায় যায়? ঢোলগোবিন্দর ঠোঁট ফুলে ওঠে।

মা যে কাকভোরে ফিরে আসে, ঘুম ভেঙে গিয়ে ঢোলগোবিন্দর সেটাও দেখা হয়ে যায়। বড়রা কী করে না করে সব কথা জিগ্যেস করতে নেই। তা ছাড়া মা-র এই না-বলে যাওয়াটা তার কাছে একটা অভিমানেরও ব্যাপার বটে।

আরও একটা কথা আছে।

তখন ছিল গরমের ছুটি। দুপুরে মা-র কাছে শুয়েছিল। দাদা মাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে কেবলি 'আমার মা, আমার মা' বলছিল। ভাবটা যেন ওর একার মা। দাদা ওকে খ্যাপাবার জন্যে বলেছিল, 'ওকে তো তুমি বানের জলে কুড়িয়ে পেয়েছিলে, তাই না মা?' দাদা মা-র ঠোঁট দুটো শক্ত করে ধরে থাকায় মা 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বলতে পারে নি।

ঢোলগোবিন্দ ছিটকে চলে গিয়েছিল বাইরে। কড়া রোদের মধ্যে বসে প্রথমে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে, তারপর ডুকরে ডুকরে কেঁদেছিল। তাহলে সত্যিই কি মা-র পেট থেকে সে হয় নি? বানের জলে ভেসে এসেছিল?

মা-র শরীরের সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে সে যে এতদিন মিশিয়ে দিয়ে এসেছিল, সে সবই কি তাহলে ভুল?

ঢোলগোবিন্দ নিজের পেটের নয় বলেই কি মা তার মরা ছোট ছেলেটার জন্যে আজও থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে? আর সমানে শিবোদাস শিবোদাস করে?

মা বলে, কী পাগলা রে তুই? দাদা মিথ্যে করে বলল আর তাই তুই বিশ্বাস করলি?

রোজ রাত্তিরে মা-র চলে যাওয়া আর ভোরবেলায় ফিরে আসার রহস্য ভেদ হল নতুন দারোগাবাবুর বাড়িতে এক রীতিমত খ্যাঁট দিয়ে।

নতুন দারোগা বলতে যতীনকাকাবাবু। দুধেআলতার মতো গায়ের রঙ। গায়ে খাঁকির উর্দি আর হাতে বেটন থাকলে গোলগাল সাহেব বলে মনে হত। অবশ্য মুখ না খুললে।

মুখ খুললেই খুলনার বাঙাল বেরিয়ে পড়ত। তাই নিয়ে আমাদের সব কী হাসাহাসি। খাত্তি নাত্তি বেলা গেল হুতি পারলাম না।

যতীনকাকাবাবুর চোখ দুটো ছিল ডুমো ডুমো। একটু লালচে। *হাসিটা ছিল এত মিষ্টি যে, দারোগা বলে মনেই হত না।*

তাঁর এক ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলে অনিলদা আমার দাদার চেয়ে সামান্য বড়। মেয়ে খুকি আমার চেয়ে সামান্য ছোট।

বদলি হয়ে আসার পরই কাকিমার হয়েছিল টাইফয়েড। সে সময়ে নার্সিং ছাড়া টাইফয়েডের কোনো চিকিৎসা ছিল না। রাতভর মাথায় বরফ আর হাতপাখার বাতাস। জল আর জলপটি।

একটা মাস যমে-মানুষে টানাটানি। ডাক্তারের মেয়ে বলেই হোক বা স্বভাবজাত কারণেই হোক, রোগীর শুশ্রূষা আর সন্তানপ্রসবের ব্যাপারে মা-র হাতযশের কথা মুখে মুখে কিভাবে যেন রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল।

বাবাই বোধহয় কালো বউয়ের এই গুণের কথা বন্ধু-মহলে ঢাক পিটিয়ে বলে থাকবে। নইলে নতুন দারোগাই বা তা জানবে কী করে?

রোগিণীর শিয়রে রাত জাগার ভারটা মা-র ওপর পড়েছিল শুধু মেয়ে বলে নয়, এ রোগে রাত্তিরটাই সবচেয়ে ভয়ের হয় বলে।

দিনের বেলা পালা করে ডিউটি দিত শহরের পরহিতব্রতী ছোকরার দল। ওদের বেশির ভাগই ছিল শহরের দামালো ছেলে। ওদেরই ছিল যে-কোনো বিপদে মাথা পেতে দেওয়ার হিম্মত। কারো ছাগল চুরি গেলে লোকে ধরেই নিত—ওই আঁটকুড়োর ব্যাটারাই বৃষ্টির মধ্যে কোনো খালি বাড়িতে ঢুকে কচি পাঁঠার মাংস রেঁধে ফিস্টি করে খেয়েছে। লোকে বলবে কী, মড়া পোড়াতে গেলে ওই ড্যাকরাদেরই তো ডাকতে হয়। কলেরা রুগীর সেবা করতে আর কোন্ ভালমানুষের পো আছে যে খবর পেলেই ছুটে আসবে? কোথাও বন্যা হলে গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে 'ভিক্ষা দাও গো, নগরবাসী' বলে চাল কাপড় তোলা, শহরে মায়ের দয়া কি ওলাউঠা হলে হৈ হৈ করে নগরসংকীর্তন বার করা—ওরা ছাড়া এসব করবার আর আছে কে?

কী সব ছেলে। বইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, পাবলিক লাইব্রেরির পাণ্ডা। শান্তিনিকেতনের ওপর বুড়োরা চটা বলে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে অনবরত ভুল সুরে রবিঠাকুরের গান গায়। সাইডে সঁথি কাটে। বড়ো বড়ো চুল রাখে। ঢোল্লা পাঞ্জাবি পরে।

মাস্টারের ছেলে একজন। কী ছেলে, বাবা! একসের জিভে গজা

বাজি রেখে পরনের কাপড় খুলে বগলদাবা করে দিনেদুপুরে একগাদা লোকের সুমুখে চৌমাথা পেরোয়।

তবে এটাও লক্ষ করো, ঢোলগোবিন্দ ! ওদের বাবারা কেউই সরকারি চাকুরে নয়। উকিল-মোক্তারের ছেলে সব। বাবাদের সুবাদে হাকিম-হুকুমতকে কেয়ার করে ওদের চলতে হয় না। ওদের বাপদের কথায়-কথায় চাকরি চলে যাওয়ার ভয় নেই।

এরপর এক অবাক কাণ্ড !

দিদির বিয়ের পর মা-র যে কী পাখা গজিয়েছে মা-ই জানে।

টানা একটা মাস মা তো রাতভর হাওয়া। আমাদের যে একটু বলে বুঝিয়ে যাবে তাও নয়। আমরা নাকি বড় হয়ে গিয়েছি। দাদা সম্বন্ধে বলে তো বুঝি। দাদা যা ঢ্যাঙা হয়েছে। লম্বা লম্বা ঠ্যাঙের জন্যে রাস্তায় ছেলেরা দাদাকে ফড়িং বলে ডাকে। কিন্তু আমি ?

না-ছোট না-বড় ঢোলগোবিন্দর রাগ হয়। নিশ্চয় সে বানের জলে ভেসে এসেছিল। মা অবশ্য বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ঢাকার চেষ্টা করে। কিন্তু নিজের মা কখনও তার ছেলেকে রোজ রাত্তিরে একা ফেলে যায় ?

তাও শুধু রাতটুকু হলে কথা ছিল।

এবার তো একনাগাড়ে সাতটা দিন আর সাতটা রাত্তির। 'চল্ সরষে, কামাখ্যা যাই' বলে একেবারে হাওয়া।

ঢোলগোবিন্দ ঘুমোচ্ছিল বলে জানতেও পারে নি।

মা-র ফিরে আসাটাই শুধু সে স্বচক্ষে দেখেছিল।

প্রকাণ্ড একটা বাস বাড়ির সামনে এসে থেমে পড়ে হর্ন বাজিয়েছিল।

বাসের জানলায় যাদের মুখ দেখা গেল, তাদের একজনকেও ঢোলগোবিন্দ কস্মিনকালেও দেখে নি।

দু-একজন বাস থেকে নেমে মা-র পোঁটলাপুঁটলিগুলো বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল। যাবার সময় তারা আমার আর দাদার মাথার

চুলগুলো একটু এলোমেলো করে দিয়ে বলে গেল, পরে আসব।

মা আমাদের জন্যে কী এনেছে দেখার জন্যে তখন আমরা ভেতরে ভেতরে মরে যাচ্ছি। অন্য কোনো দিকে নজর দেবার মতন মনের অবস্থা ছিল না।

মাকে দেখে আমরা অবাক।

বরাবরই মা-র ছিল একটু মোটার ধাত। মাত্র এক হপ্তার বাস-যাত্রাতেই মা তার শরীরমনের ভার এতটা কমিয়ে দিয়ে এমন ঝরঝরে হয়ে ফিরবে আমরা কেউ ভাবতেই পারি নি। মাকে এমন হাসিখুশি আগে কখনও দেখা যায় নি।

পরপুরুষদের সঙ্গে মা-র হুট করে চলে যাওয়াটা ঠাকুরদা গোড়ায় ভালো চোখে দেখেন নি। কিন্তু বউয়ের যাওয়ার ব্যাপারে খোদ স্বামীই যদি বাধা না দেয়, ছেলের কানে মাঝেমধ্যে লাগানি-ভাঙানি ছাড়া গলগ্রহ বুড়ো শ্বশুর আর কীই বা করতে পারে। হয়কে নয় করবার এক্তিয়ার তো তার নেই। অবিশ্যি বড়-বউমা না থাকায় কচি মেজো-বউমার ওপর কর্তৃত্ব করবার একটু বেশি সুযোগ পাওয়া যাবে, তাতেও সন্দেহ নেই। তা ছাড়া সংসারের ঝক্কি-ঝামেলা থেকে বড় বউমাও দুটো দিন ছুটি পেয়ে বাঁচবে। সেইসঙ্গে তীর্থদর্শনের পুণ্যি সেটাও কম কথা নয়।

মা-র চাবির থলো কাকিমার আঁচলে উঠে কাকিমার চলা-বলার ঢঙ কি কিছু পালটে গিয়েছিল? গিন্নির মুকুটও যে কাঁটায় সেটা কাকিমার বুঝতে দেরি হয় নি। পুরনো বলে মা তবু সামলে সুমলে চলতে পারতেন। কিন্তু নতুন বউকে দেখে সংসারের নেই-নেই দাও-দাও ভাব যেন চতুর্গুণ বেড়ে গিয়েছিল। একদিন যেতে না যেতেই শ্বশুর শুরু করে দিলেন, 'আহা, এই মাছ বড় বউমার হাতে পড়লে! সে মাছের হত আলাদা তার। যোগমায়া, তোমাদের দেশ কোথায় ছিল?'

দাদার আর ঢোলগোবিন্দর এসব ভাল লাগত না। ওইটুকু বউ সংসারটা যে মাথায় তুলে নিয়েছে, এই না কত। তা ছাড়া কাকিমা

থাকায় মাছের বড় টুকরোগুলো এখন ওদেরই পাতে পড়ছে।

মা না থাকায় বাবারও পাশাখেলার সময়টা রাতের দিকে একটু বেড়ে-বেড়ে যাচ্ছিল। তারপরও রাত জেগে আবার আইনের বই পড়া।

ফলে মা ফিরে আসতে বাড়ির সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দম চলে গিয়ে ঘড়িটা যেন অচল হয়ে গিয়েছিল। মা এলেন যেন ঘড়িতে দম দেওয়ার চাবি।

এতদিন ছিল বাবার চাকরির গণ্ডি দিয়ে বাঁধা আমাদের জগৎ। সেখানে এমনকি ছোটদের মধ্যেও আমরা ঠিক সমানে-সমান হতে পারতাম না। হোমরা চোমরাদের ছেলেরা খেলায় হেরে গিয়ে ঠোঁট ফোলালে ভয়ে কেমন যেন সিঁটিয়ে যেত ঢোলগোবিন্দ। আবার চাপরাশিদের ছেলে হলে কোথায় যেন একটা রেষারেষি ভাব এসে যায়। অকারণে লাগিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

ঢোলগোবিন্দর বাবা যেটা পারেন নি, সেটা ওর মা সম্ভব করলেন। শহরের বন্ধ দরজা একটানে যেন খুলে গেল।

উকিলপাড়া মোক্তারপাড়া। অচেনা সব বাড়ির দেউড়িগুলো হাট হয়ে খুলে যায়।

সারা শহর এখন ঢোলগোবিন্দদের মুঠোয়। সরকারি মহলের হাত পৌছয় না সেখানে। কথায় কথায় 'স্যার' নেই, কুর্নিশ নেই।

গণ্ডি কি তাই বলে একেবারে ঘোচে ? একটু বড় হয়, এই যা।

নইলে ডাকঘর ছাড়িয়ে দক্ষিণে গলিঘুঁজির মধ্যে যে বাজার এলাকা, তার পুরোটাই তো ঢোলগোবিন্দর নাগালের বাইরে। ওরই কাছেপিঠে বাবার চাপরাশি খয়রুল চাচার বাড়ি। সেই সুবাদে দু-চারদিন পর পর খয়রুল চাচা মাকে বাজার করে দিয়ে যায়।

সিঙি মাগুর বেলেট্যাংরার পেট থেকে ঘুনির বড়শি কত যে বার হত বলার নয়। আমাদের কী মজা। একটু সুতো পেলেই কঞ্চির মাথায় বেঁধে দিব্যি ছিপ হয়ে যেত। তারপর ভাঙা নারকোলের মালায় কেঁচো

জুটিয়ে সামনের পুকুরে বসে টপাটপ ফেলো আর তোলো।

বাজার থেকে যেসব মাছ আসত, তার মধ্যে একটা ছিল টেঁপা মাছ। পেটে ফুঁ দিলেই বেলুনের মতন ফুলে উঠত।

ল্যাটা মাছ এনে মাকে একদিন খয়রুলচাচা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। কেমন করে সাঁটিবেগুন রাঁধতে হয়।

দিদির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর উঠোনে তরিতরকারির চাষে আমরা সবাই নেমে পড়েছিলাম।

মা যে আমাদের ওস্কাতেন, তার একটা বড় কারণ ছিল বৈষয়িক। সংসারে তাতে কম সাশ্রয় হত না। লাউ কুমড়ো লঙ্কা আর নটে বড় একটা কিনতে হত না। মরশুমে হত পেঁয়াজকলি বরবটি শিম শশা বেগুন। কী নয়। টমেটো বা কপি, শালগম বা মুলো হত কি?

ঢোলগোবিন্দর মনে পড়ে না। সত্যি বলতে কি, মনে পড়ে না তো অনেক কিছুই।

আবগারি কোয়ার্টারগুলোর পেছনে ফুটবল খেলার যে মাঠ, তার উত্তর-পশ্চিমে হালফ্যাশানের একটা দোতলা বাড়ি উঠেছিল না? ও-বাড়ির লোকদের ছিল বড্ড বেশি দেমাক। শহরের বাকি লোকদের নাকি ওরা মানুষ বলেই মনে করত না। খেলতে খেলতে বাড়িতে ছেলেরা বল ফেললে চব্বর বেধে যেত।

হালে ঢোলগোবিন্দ শুনেছে, ওই বাড়িরই এক ছেলে ইঞ্জিনিয়ারের মোটা মাইনের চাকরির মাথায় ঝাড়ু মেরে আদিবাসী শ্রমিকদের ভাগ্যকে নিজের করে নিয়েছে। বিষয়বৈভব বংশগৌরব পদমর্যাদা— কোনো কিছুই তাকে পেছনে টেনে রাখতে পারে নি।

বেশ হয়েছে! ভালো হয়েছে!

ঢোলগোবিন্দ যেন মনে মনে ছোট্টটি হয়ে গিয়ে বল-পড়ে-যাওয়া সেই নাকউঁচু বাড়িটার কাছে গিয়ে আঙুল মটকাতে থাকে।

বাজারে বড় বড় চিংড়ি উঠলেই যতীনকাকাবাবুর বাড়িতে আমাদের

নেমন্তন্ন।

না, মশাই। ওসব ছাড়ানো-ছড়ানো পাঁশুটে চিংড়ি নয়। আঁশসুদ্ধু ভাজা কালচে লাল। লোহার কড়াইতে ঝোল হবে কালো। তবে না হবে কাকিমার চিংড়ি।

সবরে-সবরে যাওয়া চাই। সকালে থানায় যাওয়ার আগে যতীনকাকাবাবু আমাদের সঙ্গে বসে চা খেয়ে নেবেন।

কাকাবাবু চলে যেতে মাতে-কাকিমাতে রান্নাঘরে বসে খুন্তি নাড়তে নাড়তে রাজ্যের গল্প।

অনিলদাকে দিয়ে দাদা তার অঙ্ক কষিয়ে নিচ্ছে। দেখে মনে হয় না দাদার মাথায় কিছু ঢুকছে। দাদা অঙ্কে একেবারে ডাব।

খুকি এই সাতসকালে হারমোনিয়াম নিয়ে বসে প্যাঁ-পো প্যাঁ-পো করে পচা ভাদ্রে 'শারদ প্রাতে আমার রাত পোহাল' গাইছে। ওর সঙ্গেই বা আমার কী। ও তো, মেয়ে।

তা ছাড়া সেজোকাকা উকিলপাড়ায় টহল দিয়ে এখুনি এসে পড়বে। আর তারপর শুরু হয়ে যাবে খুকিকে গান শেখানো। শেখানো না ছাই। একবার হারমোনিয়াম টেনে নিলে সেজোকাকার হাত থেকে তার আর ছাড়ান নেই। একটা গান শেষ করতে না করতে আরেকটা। বাড়া ভাত জুড়িয়ে যাবে তবু উঠবে না।

সেজোকাকা আসার আগেই ঢোলগোবিন্দ খিড়কি দিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে কেটে পড়ে।

পাশেই যমুনা নদী। থানার এ ঘাটে চ্যাভ্যা নেই। কম লোক আসে।

নদীটা চওড়া বটেক।

তবে এ যে কেষ্টঠাকুরের যমুনা নয় ঢোলগোবিন্দ তা বিলক্ষণ জানে। যমুনা নামের নদী এদেশে আকছার। অত কথা কী, নওগাঁই কি এদেশে শুধু একটা? এ তো শুধু একটা মহকুমা। আসামে তো গোটা একটা জেলারই নাম নওগাঁ। ঢোলগোবিন্দ ভূগোল পড়ে এসব জেনেছে।

নদীর মাঝখান দিয়ে ছপছপ করে নৌকো যায়। কোনোটা জেলে-

নৌকো, কোনোটা কিস্তি। সরকারী বোট গেলে পাড়ে ঢেউয়ের শোর-গোল ওঠে। একটা হাতে রোদ আড়াল করে ঢোলগোবিন্দ জল দেখছিল। বর্ষার ভর-ভরন্ত নদী। এত জল কোথা থেকে আসে? কোথায় যায়?

উঁকি দিয়ে দেখবে ভেবে হাতটা অজান্তেই নামিয়ে নিয়েছিল।

কী মজা, গাছতলায় বসে রতনকাকা। জলে ফেলা রয়েছে দু-দুটো ছিপ। দেখতে হয়। ঢোলগোবিন্দ পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল।

রতনকাকা। মানে, যতীনকাকাবাবুর ছোটভাই। ছুটিতে এসেছে বেড়াতে।

ঢোলগোবিন্দ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছিপ দুটো দেখল। হাতলের কাছে দুম্বো দুম্বো চাকা। তাতে মুগা সুতো জড়ানো। বাপ রে!

এবার ঢেউয়ের মধ্যে ফাতনাটা নজর করার চেষ্টা করল। একটা হাত কপালের কাছে ঠেকাল। দূরে কাছে, গোড়ায় এক নজরে, তারপর ধরে-ধরে ফাতনাটা ঠাহর করার চেষ্টা করল। শুয়ে না দাঁড়িয়ে? চোখ-দুটোকে চরকির মতো ঘুরিয়েও যখন ফাতনাটা পাত্তা করতে পারল না, তখন ওর মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে এল, 'দুটো ফাতনাই ডুবিয়েছে। টানুন, টানুন।'

রতনকাকা চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন ঢোলগোবিন্দ। তারপর হো হো করে হাসতে লাগলেন। 'ফাতনা কোথায় রে, বোকা!'

রতনকাকা বুঝিয়ে দিল নদীতে মাছ ধরতে গেলে ফাতনার কোনো কাজ হয় না। টান-করে-রাখা সুতোর সরা-নড়া দেখে মাছ খেল কিনা বুঝতে হয়।

মা ঠিকই বলেন। ঘরের বাইরে পা দিলে কত অজানা জিনিস যে জানা হয়ে যায়। এই যেমন নদীতে ছিপ দিয়ে মাছ ধরার ব্যাপারটা। মা-র কথা মনে করে ঢোলগোবিন্দ তাই একা-একা প্রায়ই মনে মনে বিড়-বিড় করে—চল্ সরষে, কামাখ্যা যাই।

কথাটা প্রথম সে শুনেছিল অক্ষয়দের বাড়ি।

সেদিনের সন্ধেটার কথা মনে পড়লে আজও ওর গায়ে কাঁটা দেয়। সন্ধের পর এক প্রহরও গড়ায় নি। ছুটতে ছুটতে এসে একজন খবর দিয়ে গেল কুট্টিদিকে সাপে কেটেছে।

শোনামাত্র আমি আর দাদা একটা লণ্ঠন টেনে নিয়ে দে ছুট। বর্ষায় ওদের বাড়িতে বেশ খানিকটা ঘুরপথে যেতে হত।

সাপ মানেই তো সাক্ষাৎ যম।

আমাদের বুকের মধ্যে তখন ধড়াস ধড়াস করছে। হেই মা কালী, আমাদের হয়ে মা পাঁচ সিকের পুজো দেবে। কুট্টিদিকে আমাদের বাঁচিয়ে দাও।

দিদির বন্ধু কুট্টিদি। দিদির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর দিদির জায়গা নিয়েছিল কুট্টিদি। আমাদের কী যে ভালোবাসত।

ছুটতে ছুটতে চোখে জল এসে যাচ্ছিল। হাতার খুঁটে মুছে নিতে হচ্ছিল। দাদারও তাই।

অক্ষয় আমার খেলার সঙ্গী বটে, কিন্তু পড়ত দু ক্লাস ওপরে। ওর ছোট ভাই অমর ওর সঙ্গেই পড়ত। দুজনেই ছিল আমার বন্ধু। পড়াশুনোয় ভালো অমর আর খেলাধুলোয় চৌকস অক্ষয়। খেলার পর জল খেতে যাওয়া। জলের সঙ্গে একটু বাতাসা কিংবা গুড়। কুট্টিদির হাসিটা ছিল আরও মিষ্টি।

দাওয়ার ধারে বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে কী সুন্দর ছড়া বলত কুট্টিদি—

লেখা জানে না পড়া জানে না
খুদা এক হাকিম।
ঢয়া নাই বাটখারা নাই
আজিমদ্দিন এক দোকানদার।
ঢাল নাই তরোয়াল নাই
শরপা এক যোদ্ধা,
দোয়াত নাই কলম নাই
ভরুল্ল্যা এক লেখক।

(লিখতে লিখতে ঢোলগোবিন্দ বিষম খায়। অনেকদূর থেকে কুট্টিদির গলায় কেউ কি বলে উঠল : গোবিন্দি, তুই কি এলায় ভকল্ল্যা হচিস্ ?)

ভেতরে ঢুকে দেখি উঠোনে টাল-লাগা ভিড়।

এক ওঝা এসেছে। শুরু হয়ে গেছে তার বিষঝাড়ার মন্ত্র।

বিষ বিষ ওরে বিষ গোখুরা খোরে।
তোরে রাখিনু আমি কাপড়ে ঢাকিয়ে।
গরুড় গরুড় তোমার পাহাড়ে যে বাস।
উপরে থাকিয়া তুই নিচে একবার চাস।
ওরে বিষ তোরে বাঁধিলাম মনসার বরে
ছুমাস থাক তুই আঁচল ভিতরে।
কার আজ্ঞে ?
বিষহরি মায়ের আজ্ঞে।
কার আজ্ঞে ?
বিষহরি রাইয়ের আজ্ঞে।

কুট্টিদি বেঁচে গিয়েছিল। সে কি ওঝার গুণে ?

ছাই!

ঢোলগোবিন্দ এখন জানে মানুষকে মারতে পারে এমন বিষ ধরে খুবই কম সাপ। তেমন সাপ কুট্টিদিকে কামড়ায় নি।

কিন্তু সে যাই হোক। সাপে কামড়ানোর পর কুট্টিদি নিজের মধ্যে কেমন যেন গুটিয়ে গিয়েছিল।

ঢোলগোবিন্দ খুব মনে করার চেষ্টা করল ছেলেবেলার সেই ওঝার কথা।

সরষের কথা কি ছিল তার মন্ত্রে ?

থাকতেই পারে না। ওটা তো ছিল সাপের বিষ কাটানোর ব্যাপার। তার সঙ্গে সরষের কী সম্পর্ক ? কামাখ্যাই বা আসে কোথা থেকে ?

পাঠকের কাছে ঘাট চাও, ঢোলগোবিন্দ। বলো, তোমার স্মৃতিশক্তি মাঝে-মাঝেই তোমাকে ছেড়ে চলে যায়।

স্মৃতি তোমার দুষ্টু স্ত্রী। তাকে বশে রাখার জন্যে এই সেদিন একজন তোমাকে সরষেপড়ার মন্ত্র শিখিয়ে গেছে, সেটাও তুমি বেমালুম ভুলে বসে আছ। বলো তো, কী?

চল্ সরষে কামাখ্যা যাই,
আছে সেথায় সাঁওতাল বুড়ি।
তার খোলাতে সরষে ভাজি।
সরষে করে চড়বড়।
স্মৃতির মন করে ধড়ফড়।
কার আজ্ঞে?
কামাখ্যা মায়ের আজ্ঞে।
আর হাঁড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।

তাই বলে রতনকাকা আমাকে বোকা বলবে?

ব্যাস, ঢোলগোবিন্দ আর সেখানে দাঁড়ায়? হোক না ঢেউ-গড়গড় নদী, আর সেই নদীর পেটে মোচড় দিক গে মাছ।

পাশেই থানা।

থানায় ঢুকবে কি, বারান্দায় ওঠার সিঁড়ি পর্যন্ত এসে ঢোলগোবিন্দ নিচে দাঁড়িয়ে পড়ে।

এ কী মূর্তি যতীনকাকাবাবুর! খাঁকির হাফপ্যান্ট হাফশার্ট পরা ভীষণ রাগী এক দারোগাবাবু দাঁত কিড়মিড় করে নাক দিয়ে অদ্ভুত সব শব্দ বার করে একটা নিরীহ লোককে সমানে কিল চড় ঘুষি মেরে চলেছে। লোকটা পা ধরতে যাচ্ছিল, যতীনকাকাবাবু এবার তাকে সজোরে এক লাথি মারলেন।

ঢোলগোবিন্দ স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে। যে যতীনকাকাবাবু তাকে অত ভালোবাসতেন, কোলে বসিয়ে বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দেন—তাঁর মধ্যে কী করে এত হিংস্রতা লুকিয়ে থাকে!

দারোগার বেশে যতীনকাকাবাবুকে তার দেখা এই প্রথম আর এই শেষ।

ঢোলগোবিন্দর দিকে হঠাৎ চোখ পড়ে যাওয়ায় যতীন মজুমদার মশাই লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে হাজতে পুরে দিতে বলেন।

যতীনকাকাবাবুর ডাক শুনে নিশিপাওয়ার মতো আস্তে আস্তে ঘরের ভেতরে গিয়ে বসে ঢোলগোবিন্দ এদিক-ওদিক জুল-জুল করে তাকায়। পাশেই বড় বড় লোহার শিক-দেওয়া হাজতঘর।

টেবিলের ওপর শোয়ানো মোটা মোটা রুল আর লিকলিকে বেত। দেয়ালেব গায়ে ক্যালেণ্ডারের ওপর পেরেকে ঝোলানো লোহার হাতকড়া। তাকগুলোতে ভরতি ফাইলের স্তূপ।

যতীনকাকাবাবু একটু চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে তারপর চাপা গলায় বললেন, 'এখানে কে তোকে আসতে বলেছিল? আর যেন কোনোদিন এর ত্রিসীমানায় তোকে না দেখি।' যতীনকাকাবাবুর চোখমুখ তখনও লাল।

উঠে পড়ে যখন চলে আসছি, পেছন থেকে ডাকলেন, 'শোন্।' তাকিয়ে দেখলাম ঠোঁটের কোণে এবার একটু হাসি। পকেট থেকে মনিব্যাগটা বার করতে করতে বললেন, 'যাবার সময় মোড়ের দোকানটা থেকে এক হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে যাবি। কাকিমাকে বলবি আমার যেতে একটু দেরি হবে।' তারপর পেছনে না ডাকার ভান করে বললেন, 'সঙ্গে একজন সেপাই দিচ্ছি, যাবার পথে অমনি জেলখানাটাও একবার টুক করে দেখে যাস।'

লাফাতে লাফাতে চলে গেলাম জেলখানার ফটকে।

ঢোলগোবিন্দর মনে মনে তখন 'কেল্লা মার দিয়া' ভাব। দাদা যে দাদা, ফড়িঙের মতো ঠ্যাং ফেলে সারা শহর যে চষে বেড়ায়, সেও আজ ঢোলগোবিন্দকে হিংসে না করে পারবে না। এক জায়গায় একসঙ্গে এত চোর ডাকাত খুনী দেখতে পাওয়া কম ভাগ্যের কথা!

ফটকের বাইরে গরাদ ধরে ঢোলগোবিন্দ দাঁড়িয়ে থাকে।

ভেতরে খরখর করে বেড়াচ্ছে ডোরাকাটা ফতুয়া আর ইজের পরা কয়েদীর দল। কুয়ো থেকে জল তুলছে কেউ, একদল ঘানি ঘুরিয়ে তেল

বার করছে। পায়ে লোহার বেড়ি বাঁধা অবস্থায় একজন ঘুরছে।

ঢোলগোবিন্দ এই ভেবে অবাক হয়ে গেল যে, মাত্র হাত কয়েক তফাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। অথচ চোর ডাকাত খুনীদের দেখে তার একটুও ভয় করছে না। দেখে মনেই হচ্ছে না যে, কোনো অন্যায় করে ওরা তার ফল ভোগ করছে।

ভারি সুন্দর মুখচোখ একজন কয়েদীর। নিজের মনে একটার পর একটা শানকি মেজে-মেজে সে পরিষ্কার করছিল। কাজ হয়ে যেতে হঠাৎ তার নজরে পড়ে ফটকের ওপাশে ঢোলগোবিন্দ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে দাঁত বার করে হেসে শরীরের এমন একটা জায়গায় হাত চালিয়ে দিল যে, তা দেখে লজ্জায় কান লাল করে ঢোল-গোবিন্দ পালাতে পথ পেল না।

মা-র পায়ের নিচে এখন সরষে।

বাস ভাড়া করে পাড়ার গিন্নিরা চলেছে শহর ছেড়ে শ্মশানকালীর মন্দিরে। মহাদেবপুরের রাস্তায়।

রাস্তার দুপাশে টানা চলে গেছে রেনট্রী গাছ। তারপর এক জায়গায় পাকা রাস্তা ছেড়ে বাস চলল বাঁধ-রাস্তায়। সেখান থেকে নেমে যেখানে পৌঁছুনো গেল, সেখানে বিশাল বিশাল গাছ আর লতাপাতায় ঢাকা জঙ্গল। সেখানেই ছোট্ট মন্দির। সামনে মাটিতে ত্রিশূল পুঁতে বাঘছালের ওপর বসে আছে রক্তাম্বরপরা জটাধারী এক ঘোরদর্শন তান্ত্রিকবাবা। আশপাশে গাঁজার ধোঁয়ায় বসে তার কিছু লক্ষ্মীছাড়া সাঙ্গোপাঙ্গ। থেকে থেকে হুঙ্কার উঠছে : 'ব্যোম কালী'; 'মা তারা ব্রহ্মময়ী'।

জঙ্গলের শুঁড়িপথে সামনেই হি-হি করছে ছোট মতন একটা শ্মশান। তার পাশ দিয়ে ওটা নদী, না খাল?

দাদার হাত ধরে চুপটি করে এক জায়গায় বসে ছিল ঢোলগোবিন্দ। ভয়ে তার গা ছমছম করছিল। মা কি আর জায়গা পেল না বেড়াতে যাবার?

ঢোলগোবিন্দ তাকিয়ে দেখছে এখানে ওখানে একরাশ মড়ার খুলি ছড়িয়ে রয়েছে। কয়েকটা খোদার-খাসী কুকুর দাঁত খিঁচিয়ে লোকের পায়ে পায়ে ঘুরছে।

ঠিক একটা ব্লটিং পেপারের মতো চারদিকের সেই ভয়গুলোকে ঢোলগোবিন্দ নিজের মধ্যে যেন শুষে নিয়েছিল।

স্মৃতিকথার চক্করে পড়তে ঢোলগোবিন্দ কোনোদিনই রাজি ছিল না। কেননা নিজের দৌড় সে বিলক্ষণই জানত। যার স্মৃতিশক্তি বলতে নেই, সে কোন্ মুখে স্মৃতিকথা লিখতে বসে?

আমি ঢোলগোবিন্দকে বলি সাধ করে হোক আর ঠেলায় পড়েই হোক, নাচতে যখন নেমেছ তখন আর ঘোমটা রেখে কী হবে? ডালে ডালে পাতায় পাতায় ভুল, তা তো একটু হবেই।

যারা বাঘা বাঘা লোক, তাদের হয় না?

এই যেমন মা-র ন্যাওটা ছেলেছোকরাদের সঙ্গে দল বেঁধে ট্রেনে করে পাহাড়পুর দেখতে যাওয়া। আসলে ছুতোনাতায় বাড়ির বার হওয়া। ঠাকুরদা কি সাধ করে বলতেন—বড় বউমার কোল খালি বলেই বাড়িতে মন বসে না।

পুরাতত্ত্বটত্ত্ব কিছু নয়। মা তার কীই বা জানে। আমাদেরও ক-অক্ষর গোমাংস।

ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে তবু উঠেছিলাম ধ্বংসস্তূপের তিনতলায়।

তখনই একটা ঘটনা ঘটেছিল। পায়ের তলায় একটা জীর্ণ পুরনো ইঁট খসে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি একটা অশত্থের চারাগাছ মুঠো দিয়ে ধরে ফেলেছিলাম। তারপর কী কষ্টে যে উঠে পড়ে তক্ষুনি নিচে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছিলাম, সে আর বলার নয়। আমার সেই পা ফসকে যাওয়ার ব্যাপারটা কেউ জানতে পারে নি। উঁচু তিনতলা থেকে সটান নিচে পড়ে গেলে আমার মাথাটা কি ইঁট-পাথরে লেগে থেঁতলে যেত?

ভয় পাবে বলেই মাকে সেকথা আমি কোনোদিন বলি নি।

বানের জলে ভেসে আসা মা-র কোলের ছেলেটি সেদিন যদি অক্কা পেত, তাহলে কী হত ?

বলা যায় না। মা-র কোল আলো করে হয়ত আর কেউ আসত। না, শিবোদাস নয়। ওকে আমি আসতে দিতাম না। ওকে হিংসে করেই সেদিন আমি প্রাণ পণ করে বেঁচে গিয়েছিলাম।

১১

দর্শনা, সুদর্শনা

এই যাঃ, আমার জেবার চোটে বুড়োটা টেঁসে গেল নাকি ? কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলি : ও ঢোলগোবিন্দ ! ও ঢোলগোবিন্দ !

ঢোলগোবিন্দ নড়েও না, চড়েও না।

ইদানিং এমন উলটোপালটা বলছিল যে, শুনে তখনই বোঝা উচিত ছিল ওর হয়ে এসেছে।

এদিকে আমি কলমটলম বাগিয়ে উনুনে হাঁড়ি চড়িয়ে বসে আছি। একবার মুখ ফসকে বলে ফেলেছে, 'আহা, মরণের কী আমার ঢোল-গোবিন্দর আত্মদর্শন !'

আর যায় কোথায় ! হঠাৎ শুনি : 'দর্শনা'। 'দর্শনা'।

ফেন গালবার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে।

দর্শনা।

অজ পাড়াগাঁর সেই ছোট্ট স্টেশন। প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছাড়া আর কিছুই সেখানে থামে না।

ট্রেন থেকে নামে শুধু ঢোলগোবিন্দরা কজন। প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা। পুবে টিমটিম করে ছোট্ট একটু রেলবাজার। আমরা যাব লাইন পেরিয়ে পশ্চিমে।

ছোট ছোট এই যে সব ইস্টিশান, একটার সঙ্গে আরেকটার কোনো ফারাক নেই। সব এক ছাঁচে ঢালা। শুধু নামেই যা তফাত।

স্টেশনে গরুর গাড়ি নিয়ে আসত—পেটে আসছে মুখে আসছে না—জাবেদচাচা। আবার একটা নাম ঢোলগোবিন্দ নির্ঘাত বানিয়ে বলল। বলুক। নাম বই তো নয়। নামে কী আসে যায় !

শুধু নাম? কোনটা আগে কোনটা পরে, আছে নাকি ওর সে খেয়াল? সন তারিখের ধার ধারে না। এদিকে কী আস্বা!

তো জাবেদচাচা। জোয়ান বয়স অবধি দেখে এসেছে দর্শনায় নেমে প্রথম হাসিমুখ জাবেদচাচার। চাচার কোলে চড়ে যখন রেললাইন পার হত, তার পেটে তখন ভুঁড়ির খাঁজ ছিল না। ফলে, তার ঘেমো গায়ে অনবরত পিছলে যেত।

সেই জাবেদচাচা পরে চেহারাটি যা বাগাল! ইয়া ভুঁড়ি। চোখ দুটো লাল লাল। লুঙ্গির উপর সেই গামছা বাঁধা। কিন্তু গা যেমন তেল-চকচকে, লুঙ্গিরও কী চেকনাই।

দেশে আমরা যেতাম ছুটিছাটায়। ঠাকুরদা চলে যেতেন আগে আগে। আমরা কবে আসছি চিঠিতে তা জানবামাত্র জাবেদচাচার কাছে খবর চলে যেত। যাবার আগে ঠাকুরদার কাছ থেকে বসবার সতরঞ্চি নিয়ে যাওয়া ছিল দস্তুর।

জাবেদচাচার তো আর সওয়ারি বওয়ার গাড়ি নয়। ওতে হয় মাল আনা-নেওয়ার কাজ। তবু গাড়িতে তার একটা ছই ছিল। গোলার গায়ে সেটা হেলান দেওয়া থাকত।

স্টেশন থেকে আমাদের আনার আগে গাড়ির ওপর ছই তুলে খড় বিছিয়ে তাতে সতরঞ্চি পাতা হত। হলে হবে কী। গোরুর গাড়িতে চড়া যে কী পেড়ার বলার নয়। ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে বাবার নাম ভুলিয়ে দেবে। স্টেশন থেকে লোকনাথপুর কতটুকুই বা রাস্তা। দেড়-দু ক্রোশের বেশি নয়। সারা রাস্তা নাচতে নাচতে চলো। বারো মাস রাস্তার চেহারা যেন চষা ভুঁইয়ের মতন। বর্ষায় মাটি যেন চিটে গুড় আর শীতে ধুলো উড়বে কুয়াশার মতন।

গাড়ি চড়ার মজাও যে ছিল না তা নয়। এক তো জাবেদচাচার টাকরা আর আলটাকরায় জিভ ঠেকিয়ে বিচিত্র সব আওয়াজ করে হুকুম দাবড়ানো। কিংবা গোরু দুটোর ঝিম ধরলে পাঁজরে গুঁতো মেরে কিংবা ল্যাজ মুড়ে দিয়ে দুদ্দাড়িয়ে ছোটানো। সেসব কত বায়নাক্কা।

আর বেশ ছায়ায় ছায়ায় যাওয়া যেত। রাস্তার দুপাশে তখন গাছ ছিল কত। ডালে বসে ডাকত কত রকমের হরবোলা পাখি।

জাবেদচাচাকে তো সে কম দিন দেখে নি। ঠাকুরদার প্রজা। সেই সুবাদে খাজনাটা গাড়ি চড়াতেই শোধ হয়ে যেত। মা অবশ্য জাবেদ-চাচাকে জল খেতে দিতে কখনও ভুলতেন না।

মোট কথা, জাবেদচাচা আমাদের বেশ পছন্দই করত।

আমাদের গ্রামটা ছিল শুকনো খটখটে। ঝোপঝাড় বিশেষ ছিল না। ডোবাপুকুরের পাট না থাকায় ধোপারও পাট ছিল না। দক্ষিণে ছিল মরা নদীর একটা খাত। সেখানে হত ধান আর আখের চাষ।

একটু বড় হয়ে গোরুর গাড়িতে আর উঠি নি। তখন আমি আর দাদা রামনগর থেকে নলগাড়ির ওপর দিয়ে আলে আলে এসে ঠেলে উঠতাম কলমের আমবাগানে। বাগানে বেড়ার কোনো বালাই ছিল না। তবে গাছের আমি গাছের তুমি যথেষ্টই ছিল। কার কোনটা সেটা নাম দিয়ে চিহ্ন করা থাকত। আমাদের ছিল পাছাবেঁকা, মধু-কুলকুলি। তবে যে পাড়ত সে-ই খেত।

আম পাড়া হত ঢিলিয়ে নয়। হয় গাছে উঠে, নয় এড়ো মেরে। এড়ো বলতে ডালভাঙা ছোটো ছোটো হেতের। তেমন লাগসই করে ছুঁড়তে পারলে এক ঘায়ে দুটো-তিনটে পড়ত।

জল বলতে গ্রামের উত্তরপ্রান্তে ছিল বিল। আমাদের চোখের সামনে একদিন সেই বিল শুকিয়ে গেল।

বিলের পুবশিয়রে ছিল একটু উঁচু ঢিবিমতন জায়গা। আগে নাকি সেখানে ছিল নীলকরদের কুঠি। ঝোপঝাড়ের মধ্যে কিছু ভাঙা ইঁটকাঠ ছাড়া আমরা তার কিছুই দেখি নি।

সেই ঢিবি পেরিয়ে আমরা যেতাম ডুগডুগির হাটে। সেটা ছিল খাঁ-খাঁ করা একটা জায়গা। গা ছমছম করত বলে হাট থেকে আমাদের বেলাবেলি ফিরতে হত।

হঠাৎ সেখানে লোকে এসে আস্তানা গাড়তে লাগল। জাবেদচাচার

একদিন কী করে কপাল ফিরল কে জানে। ওখানে এসে চারদিকে কচা-গাছের বেড়া দিয়ে টিনের চালের একটা বাড়ি তুলল। বামুনপাড়ার লোকে বলতে লাগল, 'ওই জাবেদ তো। জানা আছে। ওর যে এখন অত বিষয়-আশয়, সব তো ডাকাতি থেকে।'

আমাদের কাছে জাবেদচাচা কিন্তু সেই রকমেরই থেকে গিয়েছিল। ঠাকুরদার সামনে কখনও গলা তুলে কথা বলত না। স্টেশনে যেতে, স্টেশন থেকে আসতে আমাদের বরাবরের নির্ভর সেই জাবেদচাচা। হাট থেকে ফেরার পথে গুড়মুড়ি না খাইয়ে ছাড়ত না।

জাবেদচাচা কি ডাকাত ছিল? হবেও বা। চোখ দুটো ওর লাল ছিল। কেন? রাতে ঘুমুত না বলে?

ঢোলগোবিন্দর ঠাকুরদার দাদামশাইয়ের অবস্থা কেমন ছিল জানি না। তবে বাড়িটা ছিল তিনমহলা। এক সময়ে দোতলাতেও ঘর ছিল। সে সব অনেকদিন সাফ। দক্ষিণের মহল ভেঙে পড়েছিল অনেক কাল আগে। উত্তরে শেষ পর্যন্ত ভাঙো-ভাঙো হয়ে টিঁকে ছিল এক-দেড়খানা ঘর। সেখানে থাকত এক গরিব ব্রাহ্মণ পরিবার। সে বাড়ির ছেলে করুণাদা আর দয়াময়।

করুণাদার বাবাকে আমরা বলতাম জ্যাঠামশাই। তাঁর চুল সাদা হওয়ার ঢের আগেই দাঁতগুলো সবই পড়ে গিয়েছিল। জেঠিমাকে দেখে কেন জানি না খুব কষ্ট হত। গায়ের রঙ ফরসা, কিন্তু রক্তহীন ফ্যাকাশে চেহারা। পান খেতেন না ব'লে ঠোঁটদুটো শুকিয়ে থাকত। হাতে শুধু সাদা শাঁখা।

জ্যাঠামশাইয়ের মাথায় ছিল টিকি। জলচৌকিতে বসে স্নান করার সময় আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে খুব মন্ত্র আওড়াতেন আর দেখিয়ে দেখিয়ে মাথার চুটকির খুব কেয়ারি করতেন।

জ্যাঠামশাইয়ের ছিল যজমানি পেশা। বাড়িতে থাকতেন খুব কম। হঠাৎ হঠাৎ শিষ্যবাড়ি থেকে সিধে নিয়ে ফিরতেন।

ছুটিতে মা এলে এবং জ্যাঠামশাই না থাকলে, জেঠিমা খানিকটা আশ্বস্ত হতেন। চালে ডালে টান পড়লে মা-র হাতে পড়ে ঠিক কুলিয়ে যাবে।

জ্যাঠামশাইয়ের ছিল গাঁয়ের লোককে তাক লাগাবার জন্যে যেমন-তেমন কথায় অনুস্বার বিসর্গ লাগানো। শুনে দাদা হাসত।

করুণাদা পেয়েছিল খানিকটা জ্যাঠামশাইয়ের ধাত। বাবার সঙ্গে কোথায় কোন শিষ্যবাড়িতে গিয়ে কবে কী খেয়েছে, কী সব ধনদৌলত দেখেছে—করুণাদা বলত সেইসব রাজাউজিরমারা গল্প।

সব বিশ্বাস না করলেও, বলাব গুণে আমরা সব হাঁ হয়ে শুনতাম।

দক্ষিণের মহলটা পাঁচিলসুদ্ধু পড়ে গিয়েছিল আমাদের জন্মের ঢের আগে। ইটের ধ্বংসস্তূপটা তখন সাপখোপের বাসা।

যত বিষধর সাপ বেছে বেছে ঠিক জ্যাঠামশাইদের বাড়িতেই আসত। হয়ত ভাঙাচোরা আর ফাটাফুটো ও-বাড়িতেই বেশি ছিল বলে। কিংবা জ্যাঠামশাই সর্ষে পড়া সাপের মন্ত্র এসব নিয়ে বেশি বার-ফাট্টাই করতেন বলে।

পরে মেজোকাকা একবার ছুটি নিয়ে এসে ভেতরের ঘাঁসগুলো সরিয়ে সেরেসুরে চুনকাম করিয়ে বাড়িটার চেহারা ফিরিয়েছিলেন। বাইরের পুজোর দালানটাতে শুধু হাত পড়ে নি। পুরনো ভাঙাচোরা দশাই তার থেকে গিয়েছিল।

বামুনপাড়ায় বাড়ি সাকুল্যে তিনটে। আমাদের পাশের বাড়িটা ডুগুকাকা-দের। ছোট ভাই মোনা ছিল আমার বয়সী। ডুগুকাকা কাজ করত রেলে। থাকত কাঁচরাপাড়ায়। হপ্তায় হপ্তায় আসত। সন্ধের পর যে বাতিটা নিয়ে ওরা বাড়ির বার হত, সে বাতি আসলে রেলের গার্ডদের হাতে থাকে। আমাদের হারিকেন লণ্ঠনের পাশে ওদের সেই বাতিটা জব্বর দেখাত।

বুড়ো বামুনদের দাঠাকুর বলা কিংবা লোকবিশেষের নামের সঙ্গে

ঠাকুর জোড়া—এসব ছিল তখনকার প্রথা।

মোনা যে সারা গাঁয়ে মোনাঠাকুর হয়ে গিয়েছিল, সেটা খানিকটা ঠাট্টার ছলে। মোনার ছিল একটু রগচটা ভাব। বুদ্ধিটাও ছিল একটু ম'টো। একেবারেই রসিকতা বুঝত না। নিশ্চয় আলজিভেরও দোষ ছিল। নইলে কথা বলতে গিয়ে গলা অত ফুলে উঠবে কেন?

ও আরও হাসির পাত্র হয়ে উঠল পৈতে হওয়ার পর।

কলকাতার কালীঘাটে ওর পৈতে হওয়ার গল্প ওর মুখে শুনেছিলাম ছুটিতে গ্রামে এসে।

ততদিনে আমি ভুলে মেরে দিয়েছিলাম কলকাতার স্মৃতি।

মোনাঠাকুরের কথাগুলো ভাসাভাসাভাবে মনে পড়ে। মোনাঠাকুর গদগদ হয়ে বলেছিল: সে কী শহর রে ভাই, ব্যস্ রে! এ-বগল দিয়ে ট্রাম চলে যায়, ও-বগল দিয়ে বাস। সে যা দেখলাম রে, ভাই—কওয়া না যায়। পিড়িক করে কল টিপলে চিড়িক করে আলো জ্বলে। আর কল ঘোরালেই জল। রাতগুলো সব দিন হয়ে যায় আর দিনগুলো যেন আলাদিনের আলো। দোকানে গিয়ে মুখ ফুটে শুধু বলবে। যা চাও তাই পাবে। শহরটাকে উঠিয়ে নিয়ে এসে যদি দেখাতে পারতাম, গাঁয়ের লোকের তবে পেত্যয় হত কী যে দেখে এলাম, সে আর কওয়া যায় না। গায়ে গায়ে পেল্লায় বাড়ি। আশ নেই পাশ নেই। মাটি নেই ঘাস নেই। খালি শানবাধানো পাথর। রাস্তায় গিশগিশ করছে লোক। এদিক থেকে এ টানে, বলে এসো। ওদিক থেকে ও টানে, বলে এসো। আমি বাবা সেয়ানা। শক্ত করে ধরেছি মা-র আঁচল। ওরা সব ফুল শুঁকিয়ে ঝোলায় পুরে ফেলে। ছেলেধরা। এমনিতে বেশ আছে শহরটা। হঠাৎ হঠাৎ বিগড়ে যায়। মাথায় খুন চড়ে। রাস্তা শুনশান। মোড়ে মোড়ে লাঠি সোঁটা আর শরকি-কাটারি। এ বলে, জয় মা কালী। তো ও বলে আল্লা হো আকবর। ধর্মশালায় রাত্তিরে ঠকঠক করে আমরা কেঁপেছি। যেই না রাত ফরসা হওয়া ছ্যাকরা গাড়ির জানলা এঁটে সেখান থেকে দে ছুট। সোজা এসে উঠেছি শেয়ালদার ট্রেনে। খুরে খুরে দণ্ডবৎ, ভাই—

ও শহরে আর যাই !

শুনে আমারও মন খারাপ হয়, বাপু। কী শহর রেখে এসেছিলাম। তার আজ এই হাল ?

মোনাঠাকুরের সঙ্গে আমার বেশ ভাবই ছিল বলতে হবে। সারা হপ্তা অত বড় দোতলা বাড়িতে মা আর ছেলে দুটো প্রাণীতে ওরা থাকত। ওর বাবা বোধহয় রেলের গার্ড ছিলেন। দেয়ালে ছবি বলতে সব বাড়িতে যেমন হয়। ঠাকুরদেবতাদের বাঁধানো শিবকাশীর কিছু রঙিন প্রিন্ট। সেইসঙ্গে কিছু গ্রুপফটো আর ওর টেকো বাবার একটা সাদায় কালোয় আঁকা ছবি। নিশ্চয় ফটো থেকে এনলার্জ করে তারপর তাতে তুলি বোলানো হয়েছে।

ওদের বাড়িতেই প্রথম দেখি নরকযন্ত্রণার সচিত্র বিবরণ। বড় বড় কড়াইতে ফুটন্ত তেলে যমদূতের দল পাপীতাপীদের ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। শাস্তির কত রকম যে নারকীয় ব্যবস্থা ! পাপে যেমন লঘুগুরুভেদ আছে, সাজারও তেমনি আছে কমবেশি। ক্যালেণ্ডারের মতো দেওয়ালে সেটা টাঙিয়ে রাখা যায়। পাপ করবার আগে মানুষ যাতে তার ফলাফলের কথা দুবার ভাবে।

মওকা পেলেই ওদের ওই ভূতুড়ে বাড়িটাতে বসে আমরা গোলকধাম খেলতাম। মোনাঠাকুর ন্যালাখ্যাপা সেজে থাকলেও কী করে কী করে যেন ছক্কা চেলে ঠিক গোলকধামে উঠে যেত। আমি বেচারা পাতালে পড়ে নাকানিচোবানি খেতাম।

একদিন ওদের আলমারি থেকে টেনে বার করেছিলাম মজার একটা বই। 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন'। ওই ঘুঁজঘুঁজে চিমসেপড়া বাড়িটাতে সেই একবারই যা নিজের মনে খিলখিল করে হেসেছিলাম।

পৈতের পর মোনাঠাকুরের রাগের যেন আরও বৃদ্ধি হল। রাস্তায় যারই সঙ্গে চটাচটি হয় তাকেই ও পৈতে উঁচিয়ে শাপ দেয়।

ভেতরে ভেতরে বামুনপাড়ার ওপর রাগ তো কম নয় পাড়ার লোকের। ওকে দেখলেই ছেলের দল পেছনে লাগে :

ও মোনাঠাকুর,

নারদ ! নারদ !

যাও কম্‌নে ?

পাগলা গারদ ॥

শোনামাত্র পেছন ফিরে শুরু হয়ে যায় মোনাঠাকুরের 'তোদের এই-হবে সেই-হবে' বলে সমানে শাপমুন্যি।

সেজোমা-র কথা তো এখনও বলি নি। মোনাঠাকুরের মা। ক্রমশ ও হয়ে উঠছে একেবারে উপরোনো সেজোমা।

সেজোমা যেখানে রাঁধতেন, সেটা ওঁদের সামনের উঠোন পেরিয়ে একেবারে সদর রাস্তার কাছাকাছি। গেরস্থবাড়িতে কখনই এটা হওয়ার কথা নয়। নাকি ওটা ছিল কখনও ওঁদের ঠাকুরঘর ?

আগেকার কালে বেগমদের নাকি নিজস্ব একটা করে গোঁসা-ঘর থাকত। সেখানে তাদের মান ভাঙানো হত।

সেজোমা-র ব্যাপারটা ছিল আলাদা। রাঁধতে রাঁধতে সেজোমা কাঠের আঁচে মেজাজটাকে তাতিয়ে নিতেন। তারপর উনুনে ভাতের হাঁড়িটা চাপিয়েই ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতেন। ওঁদের রান্নাঘরের ঠিক পেছনেই আমাদের বাইরের বাড়ির উঠোন।

সেজোমাকে সেই ফাঁকা জায়গাটাতে এসে দাঁড়াতে দেখলেই আমি আর দাদা নাটক দেখার ভাব নিয়ে জানলায় এসে দাঁড়াতাম। সেজোমা প্রথমে থুক করে মুখের মিশিটুকু ফেলে সোজা গাছকোমর হয়ে দাঁড়াতেন। তারপর গলাটা ঝেড়ে নিয়ে শুরু করতেন ওঁর পালাকীর্তন।

ওরে ও ড্যাকরা। ওরে আঁটকুড়োর ব্যাটা। ওরে ও আবাগী, হাভাতের মা। মুখপুড়ি ভাতারখাগী। অলপ্পেয়ে অলবড্যে। ব্যস, চলল গাড়ি। প্রথমে মেল, মাঝে প্যাসেঞ্জার। তারপর গলা শুকিয়ে এলে মালগাড়ির মতন টিকিস টিকিস।

উদ্দিষ্ট ব্যক্তি ধারেকাছেও নেই। কিন্তু একটু কান পেতে গোটাটা

শুনলে বোঝা যাবে কী কে কবে কেন।

ইতিহাস বলে, মানুষের শোকের কান্না থেকে নাকি গান এসেছে। তা যদি হয়, তাহলে এই শাপমুন্যি আর গালাগালি থেকে কী এসে থাকতে পারে? ঢোলগোবিন্দ ভেবেছে অনেক। কিন্তু কূলকিনারা পায় নি কোনো। কেচ্ছা বা কিস্-সা কি?

সেজোমা-র সময়জ্ঞান ভারি নিখুঁত। হাতে ঘড়ি না থাকলেও ঠিক জানে ভাত হয়ে গিয়ে কখন ঠিক ফেন গালতে যেতে হবে। হাজার শাপমুন্যি করলেও ঠিকেয় কখনো ভুল হয় না।

কিছুক্ষণের জন্যে পাড়া এবার ঠাণ্ডা। সেজোমা দাঁতে আরেকবার মিশি দিয়ে নেবেন। তরিতরকারিগুলো কেটে-কুটে নিয়ে কড়াই চাপাবেন। তারপর ঘটির জলে হাত ধুয়ে নিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে রান্নাঘরের পেছনে গিয়ে রণরঙ্গিনী বেশে দাঁড়াবেন।

শুরু হবে সেজোমা-র শাপমুন্যির দ্বিতীয় পর্ব।

ভাত তো নয়। উনুনে এখন তরকারি। কাজেই সময়টা কম লাগবে। মুখ দিয়ে কথা বার হবে তোড়ে। কোমর বেঁকে গিয়ে ঘাড়টা একবার করে নামবে আর উঠবে।

পাড়ার লোকে সেজোমাকে বলে খাণ্ডারনী বুড়ি। হতে পারে। কিন্তু সেজোমা তো দাদাকে আমাকে বেশ ভালোবাসে। ডেকে ডেকে এটা-সেটা খাওয়ায়। পায়ে পা বাধিয়ে যে ঝগড়া করে তাও নয়। কিন্তু তাই বলে তুমি সেজোমা-র ল্যাজে পা দেবে আর সেজোমা আদর করে তোমার গালে চুমো খাবে, তেমন বাপের বেটি সেজোমা নয়। কারো সঙ্গে কথাকাটাকাটিতে সেজোমা নেই। সেজোমা-র হাত খালি হলে গোঁসার জায়গায় দাঁড়িয়ে সেজোমা তার ধুড়ধুড়ি নেড়ে দেবে। একদিনে না হয় তো দশদিন ধরে চলবে সেজোমা-র শাপমুন্যি।

বামুনপাড়ার শেষ বাড়িটা আশু দাদামশাইদের। কাস্টমস থেকে কাঁচাপাকা চুলে সবে রিটায়ার করে দেশে এসে আছেন। নির্বিরোধ

শান্তিপ্রিয় ঘরকুনো মানুষ। বাঙাল ঠাকুমা তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। দুপক্ষের অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। ফকিরকাকা বড়, মেজো কাবুকাকা। এ পক্ষের সব এণ্ডাবাচ্ছা।

ঠাকুমা যতই ঢাকবার চেষ্টা করুন, কথার টানে ঠিক ধরা পড়ে যান। নাতি সম্পর্ক তো। আমরা তাই অনায়াসে ঠাকুমার পেছনে লাগতে পারি।

হাজুকাকা-খটিকাকারা হলেন ওবাড়ির আরেক শরিক। বাবার ছেলেবেলার বন্ধু হাজুকাকা। কলকাতায় হাওয়া-আপিসে কাজ করেন। পরিবারের সবাই দেশের বাড়িতেই থাকে।

গাঁয়ের ভদ্রলোকদের তখন নেই নেই করেও দেশে বেশ খানিকটা জায়গাজমি ছিল। বাজার থেকে ধানচাল কেনার দরকার হত না। চুলকাটা, মাল বওয়া, দুধের যোগান, মায় রোজকার মাছ অবধি প্রজাদের ঘাড় ভেঙে উশুল হত। বাবুর শহরে মেসে থাকতে আর সপ্তাহান্তে রেলভাড়াটুকুই যা খরচ। গাঁয়ে থেকে ছেলেদের লেখাপড়া যা হওয়ার হত। ও নিয়ে বড় একটা কেউ মাথা ঘামাত না। মেয়েদের বেলায় ভাবনা ছিল শুধু বিয়ের।

লোকনাথপুরে নামকরা লোক বলতে ছিলেন দুজন। ওপাড়ার ঘোষবাড়ির এক বড় চাকুরে। বাবা তাকে মিতে বলে ডাকতেন। তিনি গাঁয়ে আসতেন কালেভদ্রে। এলে বাবাই খবর পেয়ে তাঁর বাড়িতে দেখা করতেন।

ওপাড়া-এপাড়ার মধ্যে একটা চাপা মনকষাকষি ছিল। ওপাড়ায় ছিল ফুটবলের মাঠ। সেই সুবাদে এপাড়ার জোয়ান ছেলেরাই শুধু ওপাড়ায় যেত। তা ছাড়া এপাড়ার বামুনদের যে একটা হামবড়া ভাব ছিল, সেটা ওপাড়ার অনুচ্চবর্ণের ভদ্রলোকদের একেবারেই বরদাস্ত হত না।

শিক্ষাদীক্ষা চাকরিবাকরিতে সুযোগ সুবিধে পেয়ে অবস্থাপন্ন তপশীলীদের ঘরের ছেলেরা তখন চড়চড় করে ওপরে উঠছিল। তাদের

মাটির বাড়ির ভিটেয় উঠছিল পাকা দালান। পড়ন্ত বামুনদের কী চোখটাটানি।

আমাদেরই গাঁয়ের খটিকাকা তখন বাঙলার এক বিখ্যাত লোক। 'পল্লীব্যথা'র কবি। উপাসনা পত্রিকার সম্পাদক। গোলপুকুরে ছাপাখানা। স্বরাজ্য পার্টির বড়ো বড়ো নেতাদের সঙ্গে তাঁর মাখামাখি। ছাখো নি খটিকাকাকে ? সর্বাঙ্গে খদ্দর।

খটিকাকা বললে আর কটা লোক চিনবে! বলতে হবে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। তখন সবাই অবাক হয়ে বলবে—ও, উনি বুঝি তোমার কাকা হন? হ্যাঁ, আমরা এক-গাঁয়ের লোক। আমাদেরই জ্ঞাতিগুষ্টি।

ঢোলগোবিন্দরা সোজা লোক নাকি ?

কেন, খটিকাকার কবিতা পড় নি ? 'নলগাড়ি নয়, চিত্রা নদী সে, এদিকে দোহার বিল। দেয়াড়ের জমি লোকনাথপুরে, সেথা চাষ হত নীল।' বেথুয়াগাড়ি, ছুধপাতিলা, কদমতলার হাটও খটিকাকার হাত ধরে বাঁচার একটা রাস্তা করে নিয়েছে। দেখেছ, কলমের কী জোর ?

সামনের উত্তরমুখো রাস্তাটা খানিক এগিয়ে হঠাৎ ডাইনে মোচড় দিয়ে চলে গেছে দোহার বিল আর দেয়াড়ের দিকে।

সেইখানে ঠিক মোড়ের মাথায় কামারবাড়ি। সকাল সন্ধে সারা গাঁয়ের সবচেয়ে বড় আড্ডাখানা।

আরেকঘর কামারের বাস আরেকটু পশ্চিমে। আমাদের বাড়ির বরাবর। ঘটা কামার। বয়সে অর্বাচীন। সন্ধে হলেই ঝাঁপ বন্ধ করে সে সিঙ্গল-রীডের হারমোনিয়াম বার করে সুর ভাঁজে।

ঘটা কামার লেখাপড়া না জানুক, তার ছিল গান বাঁধার ক্ষমতা। বছরে একবার গাঁয়ে কী একটা নাকি পরব হত। সেখানে সারা বছর গাঁয়ে কী ঘটেছে না ঘটেছে, গানের ভেতর থাকত তার সাল-তামামি। ঢোলগোবিন্দ কখনও শোনে নি। কিন্তু তাতে নাকি থাকত বহু বাড়ির হরেক রকমের কেচ্ছা। আর বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি সব কথা। ওটা ছিল দেশাচার। তাই ঘটা কামারের ছিল সাতখুন মাপ। কিন্তু বছরে ওই

একদিনই। হলে হবে কী, সেসব কেচ্ছা অনেকদিন অবধি লোকের মুখে মুখে ফিরত। আর ঠোঁটকাটারা তার সুযোগ নিত।

রথের কাছাকাছি অম্বুবাচীতে হত মেটেরির মেলা। কোনো এক পীরের দরগায়।

দু মাস আগে থেকেই কামারবাড়িতে, কুমোরপাড়ায় আর ছুতোর-বাড়িতে পড়ত সাজো-সাজো রব। কাজ হত রাত জেগে।

এই সময়টা কামাররা দম পেত না। আড্ডাও তেমন জমত না। আড্ডা মানে তো সব সময় ভদ্দরলোকদের সম্বন্ধে কিটিয়ে-কিটিয়ে কথা বলা আর পেছনে কাঠি দেওয়া।

ঢোলগোবিন্দর মোটেও তা শুনতে ভালো লাগে না! ওর যে গায়ে বেঁধে।

মেলার আগে এই সময়টা মুখে সবার ছিপি আঁটা থাকে। আর ঢোলগোবিন্দ যখন হাতুড়ি তুলে নিয়ে সাঁড়াশিতে ধরা গনগনে লোহাটাকে পেটায় কিংবা হাপর টেনে টেনে লোহাগুলোকে লাল টকটকে করে তোলে, কিভাবে যেন ওদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারে। সন্ধের পর লোহাচুরগুলো ও যখন আগুনে ফেলে ফুলঝুরি বানায় ওর ছেলেমানুষি দেখে অবনীশদা হেসে ফেলে।

অবনীশদার আবার একটা চোখ। অন্য চোখটা গরম লোহার কুচি পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

অবনীশদার বাবা ছেলেবেলায় আমার বাবার সঙ্গে পাঠশালায় পড়েছে। খেলাধুলোও করেছে একসঙ্গে। কেউ কাউকে নাম ধরে ডাকে না। 'বন্ধু' বলে ডাকে।

লোকনাথপুরে সাদাচুলের অনেকেই বাবাকে 'ক্ষিতু' বলে ডাকত। তার মানে বাবারও একটা ছেলেবেলা ছিল।

মুখে 'ক্ষিতু' বললেও সম্পর্কগুলো কিন্তু ঠিক আগের মতো সহজ থাকে নি। অবস্থার তারতম্যই শুধু নয়, শিক্ষাদীক্ষা আর জাতের

বালাইটাও ক্রমেই মাঝখানে উঁচু হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ঢোলগোবিন্দ তো বোকা নয়। দু-পক্ষেরই কষ্ট ওর চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ত।

তারপর নিজের কথা ভাবত। বড় হয়ে জয়দেব আর কাশীরামের সঙ্গে তার সম্পর্কেও কি এমনি টান পড়বে?

ছুটিতে দেশে গেলেই ব্রহ্মপুর থেকে রোজ কাঁসার একটা ঘটে করে আমার জন্যে দুধ নিয়ে আসত এক বিধবা। আমাকে সে বলত ধর্মবাপ। ঠিক এপাড়া ওপাড়া তো নয়। অনেকখানি পথ তাকে হেঁটে আসতে হত। মেয়েটি ছিল মুখচোরা লাজুক। তার নামধাম, কেন কিভাবে আমি তার ধর্মবাপ হয়েছিলাম—সেসব কিছুই আমার মনে নেই। কোনোরকম স্বপ্ন দেখার ব্যাপার ছিল কি?

খালি ঘট নিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় তার চোখে-মুখে উপচে পড়ত একটা স্বর্গীয় আনন্দ। অথচ এমন নয় যে সে আমাদের ঠাকুরদার প্রজা। এতটা রাস্তা ঠেঙিয়ে আমাকে দুধ খাওয়াতে আসার এমনিতে কোনো দায়ই তার থাকার কথা নয়। যতক্ষণ সে থাকত, আমার কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত। তার ধর্মবাপ লজ্জা-লজ্জা মুখ করে তার গা ঘেঁষে দাঁড়াত। অথচ গাঁয়ে তার কে আছে কী বৃত্তান্ত—একবার জিজ্ঞেস করবে তো? কোনোদিন তা করে নি।

আর ধাড়ি হয়ে ঢোলগোবিন্দ যার কোলে চড়ে বেড়াত তাকে আদর দিয়ে বাঁদর করেছিল যে—সেই শরৎপিসি? জন্মের পর যার বাপ মরেছিল আর বিয়ের পর ভাতার?

গোয়ালার ঘরে জন্মালেও আপন পিসির চেয়েও আমরা বেশি ভালোবাসতাম শরৎপিসিকে। এক ভাই ছাড়া তার তিনকুলে আর কেউ ছিল না। ভাইয়ের সংসারটা সে-ই মাথায় করে রেখেছিল।

মা যখনই দেশের বাড়িতে আসতেন, শরৎপিসি হত মা-র হাত-নুড়কুত। যাবতীয় কাজ হাসিমুখে করবার ক্ষমতা ছিল ওই এক শরৎ-পিসির। আমার অন্য পিসিরা এলে তো সব ভার মা-র ঘাড়ে চাপিয়ে

গা এলিয়ে দিয়ে বসে থাকত।

শরৎপিসির গায়ের রং ছিল গৌরবর্ণ। চুল ফেলে দিয়ে এসেছিল নবদ্বীপে। তাতেও মুখের লক্ষ্মীশ্রীটুকু যায় নি। সাদা ঝকঝকে দাঁত। পান-তামাকের কোনো নেশা ছিল না। হাসিতে মুখ ভরা থাকলেও ফ্যাকাশে ঠোঁট দুটোতে ছুঁয়ে থাকত জীবনে অনেক কিছু না পাওয়ার শূন্যতা।

কোলে ওঠার সুবাদে শরৎপিসির গায়ের গন্ধগুলো ঢোলগোবিন্দর আজও মনে আছে। শরৎপিসি যখন আসত তখন তার গায়ে লেগে থাকত মাখনতোলা দুধের সুন্দর একটা টক-টক ভাব। আর বেলায় যখন কাজ সেরে বাড়ি যেত, তখন গায়ে মাখিয়ে নিত পেঁয়াজরসুনে মেশা একটা বিচ্ছিরি আঁশটে গন্ধ।

গোরু চরাতে যেত ঘোষেদের বাড়ির যে ছেলেটা, তার গানের গলার কথা মনে আছে কি তোমার, ঢোলগোবিন্দ? সন্ধে হওয়ার মুখে পাঁচন হাতে গোরুর পাল নিয়ে যখন সে গান গাইতে গাইতে ফিরত?

ঢোলগোবিন্দর কানে যায় না সে কথা। চোখে এখন তার গোরুর খুরে-খুরে ওড়া গোধূলি।

আর এই ধুলোগুলো থিতিয়ে গেলেই, সামনের বাঁধানো ইঁদারার পেছনে জিওলগাছের গায়ে পশ্চিমের রোদ পড়ে, একটা রক্তারক্তি কাণ্ড দেখে সে শিউরে উঠবে।

ছায়া যত পূর্বগামী হবে, ততই দৃষ্টিটা তার আরও গুটিয়ে আসবে। বাঁধানো বারান্দাটার কোলে।

দিনে যেখান দিয়ে দুবেলা গড়িয়ে পড়ে আঁচানোর জল, হুঁকোর জল, যেখানে সূর্যের স্তোত্র আউড়ে জল-চৌকিতে বসা ঠাকুরদা ঘটি ঘটি জল গা-মাথায় উপুড় করে দিয়ে ভিজে গামছা নিংড়ে নেন, আর সন্ধের পর বাড়ির বেটাছেলেরা যেখানে অন্ধকারে সাপের ভয়ে মাঠে না নেমে ওপর থেকেই টুকটাক ছোট কাজ সেরে নেয়—সেখানে এঁটো জলে আর অ্যামোনিয়ার সারে দিদির হাতের লাগানো গোলাপগাছে থরে-থরে

কত ফুল ফুটেছে, ছাখোসে।

আর দিদির জন্যে তখন কী যে মন কেমন করে, বলার নয়।

ঢোলগোবিন্দ সেজোকাকার সঙ্গে দাদার হাত ধরে কাল গিয়েছিল ডুগডুগির হাটে। পাকাপাকি দোকানঘর আছে তুটো-চারটে। এক তো বেনেমশলার দোকান। টুকিটাকি মনিহারি জিনিসের এক পাইকার। পা-কল নিয়ে টিমটিম করছে এক দরজি।

গামছা কাপড় মেলে হাটে। ময়রা বসে বাতাসা-কদমার ডালা সাজিয়ে। হিম পড়লে সবজি-আনাজের ঢল নামে। নাপিতরা চুল ছাঁটে, দাড়ি কামায় এক কোণে বসে।

রসগোল্লা-রসমুণ্ডির দোকানও ছিল একটা নিশ্চয়। নইলে অতটা পথ ঠেঙিয়ে এমনি এমনি কি আর ডুগডুগির হাটে যেতে চায় ঢোলগোবিন্দ ?

আমাদের গ্রাম থেকে ডুগডুগির হাট যতটা, আর মাত্র ততটা গেলেই দিদির শ্বশুরবাড়ি। জয়রামপুর।

সঙ্গে সঙ্গে দাদা ঢোলগোবিন্দর মাথায় গাঁট্টা মারে। এই, বারণ করেছে না ও-নাম বলতে ? বলবি, বড়গাঁ।

হ্যাঁ, বড়গাঁ। জয়রামপুর বললে নাকি হাঁড়ি ফাটে। অমঙ্গল হয়। শুনে মন খারাপ হয় ঢোলগোবিন্দর। হাজার হোক, ওটা তো দিদি-জামাইবাবুদের গ্রাম।

ডুগডুগির হাটে পৌঁছেই ঢোলগোবিন্দর মনে হয়েছিল—ইশ্, আরেকটু গেলেই তো দিদির শ্বশুরবাড়ি। একবার চট করে গিয়ে দেখা করে এলেই হয়। দিদি নিশ্চয় শুনেছে যে, আমরা এসেছি। দিদিও তো একবার এসে আমাদের দেখে যেতে পারে। মাকে দেখতে ওর ইচ্ছে হয় না ? ওর অত সাধের গোলাপগাছ ? আঃ, কী ফুল ফুটেছে রে, দিদি!

দাদা আবার গাঁট্টা মারে। ভেঙিয়ে বলে—দিদি দিদি দিদি! জানিস নে, দিদি এখন পর হয়ে গেছে ? হুট বললেই কি আর এখন

দিদির বাড়িতে যাওয়া যায়? মনে রাখিস ওটা আমাদের কুটুমবাড়ি। দিন ঠিক করে আগে থেকে জানিয়ে যেতে হবে। খালি হাতে গেলে তো চলবে না। ভালোমন্দ কিছু না নিয়ে গেলে দিদির আবার মাথা হেঁট হবে। উঠতে-বসতে শাশুড়ির মুখনাড়া খেতে হবে।

ঢোলগোবিন্দর উৎসাহে আস্তে আস্তে জল পড়ে। অনেক কথা তার মনে পড়ে যায়।

দিদির বিয়ের পর থেকে বাবার মনে আর শান্তি নেই। কিছুদিন পর-পরই দিদির শাশুড়ির কাছ থেকে আসে শেল-বেঁধানো একটা করে চিঠি। বিয়েতে অমুকটা দেওয়া হয় নি, তমুকটা দেওয়া হয় নি, জামাইষষ্ঠীতে এবার এটা দিতে হবে, সেটা দিতে হবে।

সেই সঙ্গে আসে দিদির করুণ চিঠি। মা যেন বাবাকে বলে জামাইয়ের জন্যে একটা গরদের পাঞ্জাবি আর একসেট সোনার বোতাম অবিশ্যি-অবিশ্যি পাঠিয়ে দেয়। দিদির আর সহ্য হচ্ছে না উঠতে-বসতে শাশুড়ির বাক্যযন্ত্রণা।

মা অতটা উতলা হন না, যতটা বাবা হন। বাবা ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, খুকি যদি সহ্য করতে না পেরে গলায় দড়ি দেয়, কি বাড়ির পুকুরে ডুবে মরে?

তুমিও যেমন! বলে মা গম্ভীর হয়ে উঠে পড়েন।

দিদির শ্বশুরবাড়ি যেমনই হোক, জামাইবাবুটি ঢোলগোবিন্দর খুব পছন্দ। ময়ূরছাড়া কার্তিকের মতো চেহারা। টকটকে রঙ। চুমরানো সরু গোঁফ। এসরাজ বাজান। শিকারে যান। খুব মাইডিয়ার জামাইবাবু।

জমিদারের ছেলে তো। তাই করেন না কিছু। একমাত্র দোষ, বিধবা মা-র ভারি বাধ্য।

আর হবি তো হ, জামাইবাবুর ছোট ভাই মুরারিদার সঙ্গে ডুগডুগির হাটেই দেখা হয়ে গেল।

মুরারিদা ভারী আত্মীস্বয় মানুষ। বললেন, চলো, চলো, দিদির

সঙ্গে দেখা করে আসবে।

সেজোকাকার পক্ষে সেটা কাটিয়ে দেওয়া কঠিন হয় নি। গেলে বাড়ির লোক সত্যিই ভাবত। তা ছাড়া ঠাকুরদা পিঠের চামড়া তুলে দিতেন না! দেশের বাড়িতে তো ঠাকুরদাই কর্তা।

ফেরার একটা টানও ছিল। সেজোকাকা বড়ো দেখে একটা উবি কিনেছে। মা রাঁধবে। আঃ, খেতে যা হবে ভাবা যায় না।

ফিরে গিয়ে একটা নৃশংস ব্যাপার হবে উবিটাকে নিয়ে। কাটা হবে না। খড়নুড়ো জ্বেলে আগে ওটাকে পুড়িয়ে মারা হবে। কিন্তু ঢোলগোবিন্দ তার ধারেকাছে থাকবে না। ওর আবার খুব নরম মন। কারো কষ্ট দেখলে ও সহ্য করতে পারে না। তা সে মানুষই হোক আর জন্তুজানোয়ারই হোক।

অথচ পাতে মাংস পড়ুক, চেটেপুটে খাবে। তখন বুঝি মনে পড়ে না উবিটাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল? যতক্ষণ নড়ছিল, ততক্ষণ বুকের মধ্যে কী হাঁচড়পাঁচড়। জীবে কী দয়া। রান্না হয়ে যাবার পর তখন নোলা সপসপ করবে! জিভের কাছে আর তখন লেশমাত্র দয়ামায়া নেই। ঢোলগোবিন্দর সঙ্গে ওর দাদার এইখানেই তফাত। দাদার মধ্যে পেটে ক্ষিধে মুখে লাজের কোনো ব্যাপার নেই। ঢোলগোবিন্দকে যতই ভালোবাসুক, ওর ন্যাকামি ভণ্ডামিগুলো দেখলে দাদা পেছন থেকে এসে কঁ্যাৎ করে এক লাথি মারে।

দাদার একটু বাড়াবাড়ি। না, শুধু উবি বলে নয়। দেশের বাড়িতে এলে ঢোলগোবিন্দ মুখে সব-কিছুর একটা নতুন স্বাদ পায়।

ডুগডুগির হাটে কেনা শাকসব্জির স্বাদই আলাদা। তা ছাড়া মাটির হাঁড়িতে ভাত আর কাঠের জ্বালের ঢিমে আঁচে রান্না।

বিলের জল মরে আসছে। কুঁজো হয়ে মাথা ডোবাতে হয়। আর নদী তো সেই মাথাভাঙা। কুড়ুলগাছির রাস্তায়। অনেকটা দূর।

কাজেই গাঁয়ে মাছের খুব আকাল। চুনোচানা মাছ মালো মেয়েরা খালবিল ছেঁচে মাঝেমধ্যে বাড়িতে দিয়ে যায়।

গ্রামের কেউ কখনও-সখনও পাঁঠাখাসি মেরে ভাগা হিসেবে বিলিবাঁটা করে।

মুসলমান পাড়ায় দেশি মুরগির ছানাগুলো চরে বেড়াত। হিন্দুরা তার সামনে দিয়ে নাক সিঁটকে হেঁটে যেত। হিন্দুরা বলত রামপাখি। তার মাংস বা ডিম তাদের হেঁসেলে ঢোকা বারণ।

ভোরবেলা জিরেন কাটের রসের কথা মনে আছে তোমার, ঢোলগোবিন্দ? নলগাড়ির কাছে মাঠের মধ্যে সেই অষ্টাবক্র মুনির মতো সব ত্যাড়াব্যাঁকা কাঠখোট্টা খেজুরগাছ। সেইখানে ছিল জয়নালের বান। মুখের ওপর বড় বড় কড়াই চাপানো উনুনের আগুনে সন্ধেবেলায় হিম-পড়া অন্ধকার চমকে চমকে উঠত। গায়ে দোলাই টেনে আমরা উবু হয়ে বসতাম হাতে একটা করে পাতা নিয়ে। জয়নাল লম্বা একটা হাতা দিয়ে তার ওপর আলতো করে ছেড়ে দিত ফুটন্ত নলেন গুড়। পাতার পরিধিটুকুর মধ্যে জিভে জল গড়িয়ে টলমল টলমল করছে কাঠের বুকচেরা অনির্বচনীয় স্বাদেগন্ধে ভরা গরম আগুনের মতো সেই রস। মুখ দিতে পারছে না পুড়ে যাওয়ার ভয়ে। বেশি ফুঁ দেওয়াও যাবে না, পাছে তাতা রস জুড়িয়ে জল হয়।

ঢোলগোবিন্দ তার জীবনটাকে আজও যেন জয়নালের সেই বানে ঠাণ্ডা গরমের এক উভয়সংকটের মধ্যে পাতা হাতে হা-পিত্যেশে বসিয়ে রেখেছে। হ্যাঁ, জয়নালের সেই বানে।

ভুলি, ও ভুলি

গলায় একটা কাটার দাগ। ঢোলগোবিন্দর পাসপোর্টে শনাক্তকরণের শূন্যস্থান ওই দিয়েই পূর্ণ করা হয়েছে।

ভাঙা দাঁতের কথা গোড়াতেই বলা হয়ে গেছে। সে তো বেশ ধাড়ি বয়েসে। গলা কাটা যায় তারও ঢের আগে।

কাবুকাকাদের বাড়ির সামনে ছিল একটা বিলিতি আমড়ার গাছ। টকমিষ্টি সেই আমড়া, তার স্বাদগন্ধের—আঃ, তুলনা হয় না। দাদা আর কাবুকা পাকা-পাকা আমড়া পাড়ছিল। এড়ো মেরে। এড়ো জানেন না? গাছের ডালের হাতপ্রমাণ ছোট-ছোট খেঁটে। শুধু ছুঁড়লেই হল না। হাতের টিপ চাই।

আমি ছিলাম কাবুকার ঠিক পেছনে। কাবুকার এড়োতেই বোধহয় ন্যাকড়ার জায়গাটা একটু উঠে ছিল। তাতে ছিল ছুরির ধার। কাবুকা পেছনে হাতটা ঘুরিয়ে সপাটে ছুঁড়তে যাচ্ছিল।

হঠাৎ সবাই দেখল, গলায় হাত দিয়ে আমি মাটিতে বসে পড়েছি। আমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলগল করে বেরোচ্ছিল রক্ত।

খবর পেয়ে মা ছুটে এসেছিলেন গাঁদাগাছের একমুঠো পাতা হাতে নিয়ে। তাতেই কাজ হয়েছিল। আইয়োডিন নয়, বেনজইন নয়—স্রেফ গাঁদাফুলগাছের পাতা। কাটলে, ছড়ে গেলে তার মোক্ষম দাওয়াই।

পা মচকে গেলে চুনহলুদ গরম করে লাগানো। পেট কামড়াচ্ছে? নাই-তে চুন লাগাও। পেট ফাঁপলে দু-চারটে চাল গালে ফেলে জল দিয়ে গিলে নাও। ঘাড়ে ফিক লেগেছে তো বালিশ রোদ্দুরে দাও। এইসব ছিল মা-র টোটকা।

ভাগ্যিস, বাবা নেই। নইলে ডাক্তার বদ্যি ডেকে এনে চব্বর বাধিয়ে দিতেন।

কাটার ঘা শুকিয়ে গেছে। বাঁধাছাঁদা শেষ।

দিদি এসেছিল। দুদিন থেকে গেছে। যাবার সময় কী কান্না। শাশুড়ি পই-পই করে বলে দিয়েছে। ঠিক দুদিন।

দাদার সঙ্গে ঢোলগোবিন্দ গিয়েছিল দিদিকে আনতে। জাবেদের গাড়িতে। অনায়াসে হেঁটে যেতে পারত। দিদি এখন চৌধুরীবাড়ির বউ। রাস্তা দিয়ে কখনও হেঁটে আসতে পারে? গাঁয়ের লোকে ছি-ছি করবে। পালকি হলেও চলে। কিন্তু লোকনাথপুরে আবার পালকির পাট নেই। দিদিরও পালকি অপছন্দ। মনে হয় এই পড়ে যাব, এই পড়ে যাব। অগত্যা জাবেদের গাড়ি। ল্যাজ মলা দিয়ে তার হুর্‌র্‌ হুর্‌র্‌ আর টাকরায় জিভ উলটে কিম্ভূতকিমাকার সব শব্দ—সেও বরং ভালো। পালকির দুলুনি অসহ্য।

ঢোলগোবিন্দ শিখে গিয়েছে। আর জয়রামপুর বলে না। বলে বড়-গাঁ। লোকনাথপুরে বনজঙ্গলের পাট নেই। রাস্তার দুপাশে শুধু কচা-গাছ রাংচিতা আর আশশেওড়া। একটাও ডোবাগর্ত নেই। অথচ বড়-গাঁ আর কতটা পথ? দেড়-দু ক্রোশ? কিন্তু সেখানে দেখো, ব্যস্‌ রে, হাই উঁচু সব গাছ, তাতে লতাপাতার কী ঠাসবুনট! ডোবাপুকুরের ছড়াছড়ি।

লাফিয়ে নেমে থমকে যাই। সামনের ঘরে এক বুড়ো গোমস্তা বসে ঢুলছে। মনে মনে ভেবে এসেছিলাম গাড়ির চাকার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ পেয়ে দিদি বাইরে বেরিয়ে লাফাতে লাফাতে এসে আমাদের নিয়ে যাবে।

আমাদের বসতে হল। বৈঠকখানায় বড় একটা তক্তপোশ। তার ওপর একটা মোটা শতরঞ্চি পাতা তাতে প্রজারা এসে বসে।

ভেতরে খবর গেছে। আমরা বসে আছি।

না, বেশ আদর করেই আমাদের ভেতরে ডেকে নিয়ে যাওয়া হল।

হাজার হোক, আমরা হলাম এ বাড়ির—কী যেন বলে, দাদা? হ্যাঁ, কুটুম। আত্মীয় আর কুটুমে তফাত আছে। ঢোলগোবিন্দ তা বিলক্ষণ জানে। আর জ্ঞাতি হল আরও দূরের।

মাঝখানে বড় একটা উঠোন। তার মধ্যে টিমটিম করছে বাঁধানো একটা তুলসীর মঞ্চ। না একটা ফুলগাছ, না লাউয়ের কোনো মাচা। দিদিটা কী?

নওগাঁয় আমাদের ওইটুকু উঠোন। সেখানে দিদির লাগানো গাছে এখনও কত ফলফুল হয়। লোকনাথপুরে রোয়াকের নিচে তিন-তিনটে গাছে এখনও কত গোলাপ ফোটে। দিদিটা কী? এত বড় ফাঁকা উঠোন পেয়েও কিছু করে নি?

দিদির মাথায় ঘোমটা। বাপের বাড়ি যাওয়ার আনন্দ তাতে ঢাকা পড়ে নি।

শাশুড়ি বড় রাশভারি। চুল ছোট করে ছাঁটা। রান্নাঘরের দাওয়ায় পিঁড়ি পাতা। তাতে বসতে না বসতে শুরু হয়ে গেল ওঁর গল্প। 'হ্যাঁ গো কোন্ কেলাসে পড়ো? আমার তো বাবা নেকাপড়া হয় নি। হবে কোথেকে? আমাদের কালে মেয়েদের কি আবার হাতে-খড়ি হত? আর হবেই বা কী করে? গাল টিপলে যখন দুধ বেরোয়, তখন থেকেই তো ঘাড়ে পড়েছে সংসারের এই জোয়াল। কাজ হল তো বিয়োনো। আর নাম কী? না, গব্বধারিণী। আহা, আমার প্রথম বেটাটা যদি থাকত। তাহলে কি আর আমার হাড়ে এমন দুব্বো গজাত? রানীমা হয়ে আজ আমি সোনার খাটে গা রুপোর খাটে পা দিয়ে থাকতে পারতাম। তোমাদের তালুইমশাইয়ের তৌজিমৌজা কম ছিল? হাতের নোয়াও ভাঙল, আমার কপালও পুড়ল। সব তো তখন গেঁড়ি-গুগলি। একটার পর একটা মেয়ের বিয়ে দেওয়া। ছেলেদের মানুষ করা। সব তো ওই জমি বেচে। তোমাদের জামাইবাবুও হয়েছে সেই পদের। লেখাপড়া করতে করতে ছেড়ে দিল। বলল জমিদারি দেখবে। দেখছে তো কত। এসরাজে ছড় টানছে আর আশুর ডাক্তার-

খানায় বসে রাজা উজির মারছে। আজ সারা সকাল তো দেখলাম বসে বসে কেবল বন্দুক পরিষ্কার করল। বললাম পুকুরে একটু জাল ফেলার ব্যবস্থা কর। তা রামগঙ্গা কিচ্ছু না বলে বেরিয়ে গেল। আর বউমাই বা কী! আমরা তো জানি: 'শশা খেয়ে যেমন জলকে টান, তেমনি ভাইয়ের বোনকে টান; চিনি খেয়ে যেমন জলকে টান, তেমনি বোনের ভাইকে টান।' ওসব ছিল পুরনো দিনে। এখন তো শহর থেকে বউ হয়ে আসে কাঠ-কাঠ ধিঙ্গি মেয়ে। দেখো না, দুটি ভাই এতটা রাস্তা এসেছে, তাদের যে একটু করে ক্ষীরের সঙ্গে কাঁঠাল ভেঙে দেবে—সে হুঁশটুকুও নেই। ঘরে গিয়ে দেখো, যাবে বলে এখন থেকেই সাজগোজ শুরু হয়ে গেছে। কথায় বলে, মা-র পেটের ভাই কোথায় গেলে পাই।....'

দেখে মনে হয়েছিল রাশভারি। বাপ্‌রে, এ যে দেখি ডাকগাড়ি। জংশন না এলে থামাথামি নয়। কথা বলছেন, না মধুর কলসি ভাঙছেন —বোঝার জো নেই।

দেখার আগে অব্দি ঢোলগোবিন্দ দূর থেকে মনে মনে ওঁর যে ছবি এঁকেছিল, কাছে এসে এখন দেখছে সেটা ঠিক নয়।

ঢোলগোবিন্দ এখন বুঝতে পারে, কোনো মানুষকেই একরঙাভাবে দেখাটা ঠিক নয়। সেকেলে লোক। জগৎটাও তো ওঁর খুব বড় নয়। পুরনো জটগুলো মন থেকে ছাড়ানো কি অতই সহজ? ওঁর ব্যথার জায়গাগুলোর খবরই বা কে অত রাখে?

উনি তো লিখতে জানেন না। কিন্তু বাবার নামে দিদির বিয়ের দেনাপাওনার ব্যাপারে কিটিয়ে-কিটিয়ে লেখা ওঁর চিঠিগুলো? সে তো আর উনি নিজে লেখেন নি। তবে কি, যে লিখেছে তারও মনের মাধুরী তাতে মেশানো ছিল? যেই দাঁত ফোটাক, তাতে বিষ ছিল। এবং বিলক্ষণ বিষ।

এক ফাঁকে আমরা বাড়ি দেখার ভান করে উঠে গিয়েছিলাম। বেশ বড় দোতলা বাড়ি। পেছনে আম-কাঁঠালের বাগান। এক কোণে একটা

গন্ধরাজ লেবুর গাছ।

ওপর নিচে। এ-ঘর ও-ঘর। দিদি কোথায়?

শেষকালে পাওয়া গেল ঢেঁশ্‌কেলে। একজন ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছিল। আর গর্তে হাত চালিয়ে চালিয়ে কোটা চিঁড়েগুলো দিদি বার করে আনছিল। আমরা দুজনে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছি। দিদি করছে কী? চালে একটু ভুল হলেই যে পাঁচটা আঙুলই চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে যাবে!

এর নাম ঘরে বসে সাজগোজ? বাপের বাড়ি যাবে বলে নেচে ওঠা? মাউইমা নিশ্চয় চোখে কম দেখেন।

এমন সময় হৈ হৈ করে বাড়িতে এসে ঢুকলেন—কে? জামাইবাবু। এক হাতে বন্দুক। আরেক হাতে দড়িতে ঝোলানো তিনটে বালিহাঁস আর একটা ঘুঘু।

আমাদের গাঁয়ের দুই ডুমুরের ফুল।

এক তো পশ্চিমের ঘরের জ্যাঠামশাই। দয়াময়ের বাবা। বছরে দশ মাসই বাড়ির বাইরে। শিষ্যবাড়িতে যজমানি করে বেড়ান। ফেরেন রীতিমত ছাঁদা বেঁধে। দক্ষিণা যা পান এমন কিছু নয়। আসল হল দানসামগ্রী। ওইসব বেচেবুচে জ্যাঠাইমা কায়ক্লেশে দিন চালান।

ঢোলগোবিন্দর এখন মনে হয়, জ্যাঠামশাই তো ছিলেন কুলীন বামুন। এখানে-সেখানে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের ভার লাঘব করতে হয় নি তো তাঁকে!

আরেক ডুমুরের ফুল তারিণী দাদামশাই। আমাদের গাঁয়ে জমিদার বলতে ওই একজনই। এ পাড়ায় ওই একটা বাড়িতেই যা দুর্গোৎসব হয়।

একে বেঁটেখাটো। গায়ের রং বেশ কালো। হাঁটুর ওপর কাপড়। অষ্টপ্রহর মুখে থেলো হুঁকো। সঙ্গে ফতুয়া থাকলেও দাদ চুলকানোর জ্বালায় সে ফতুয়া গায়ে উঠতে বড় একটা দেখা যেত না।

নারদের যেমন ঢেঁকি, তারিণী দাদামশাইয়ের তেমনি ছিল নিজস্ব গোরুর গাড়ি। গাড়ি করে ছাড়া আমরা কখনও তাঁকে বাড়ির বাইরে বেরোতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

বিরাট বাড়ি হলে হবে কি, সংস্কার অভাবে একটা দিক তখন ভেঙে পড়ার উপক্রম।

জমিদারি পড়ন্ত বলেই কি তারিণী দাদামশাইকে খাজনার তাগাদায় অমন হোট্টো হোট্টো করে ঘুরে বেড়াতে হত ?

তারিণী দাদামশাইয়ের প্রথম পক্ষের বউকে আমরা দেখি নি। দেখবার কথাও নয়। কারণ, দ্বিতীয় পক্ষের দুই ছেলে নীলু আর দেবু— ওরা দুজনেই তো ছিল আমার খেলার সাথী।

নীলু-দেবুর মা-কে আমরা ঠাকুমা বলতাম। হাত পুড়িয়ে রান্না করা থেকে সেলাই-ফোঁড়াই পর্যন্ত বাড়ির সব কাজই ঠাকুমাকে করতে হত। তারিণী দাদামশাইয়ের সঙ্গে বয়সেরও ছিল অনেক তফাত।

কাঠের ধোঁয়া বোস-ঠাকুমার গায়ের রং পোড়ালেও ষোলো আনা চেপে দিতে পারে নি। এই বয়সেও বোস-ঠাকুমাকে সবাই বলত রূপসী।

বোস-ঠাকুমার মা-বাবা যে কী দেখে তারিণী দাদামশাইয়ের মতন পাত্রের হাতে মেয়েকে তুলে দিয়েছিলেন, শুধু ঢোলগোবিন্দ কেন, গাঁ-সুদ্ধু লোক তা ভেবে পেত না। একে তো পাত্রের ওই ছিরি, তার ওপর আবার দ্বিতীয় পক্ষ। তাও যদি তেমন নামডাকওয়ালা জমিদার হত কিংবা জামাইটি সেরকম গুণের হত। অমন সুন্দরী বউ, হেঁসেল ঠেলে আর ছেলেমেয়ে বিইয়ে তার যে হাড় কালি হয়ে যাচ্ছিল—চোখের মাথা খেয়ে তারিণী দাদামশাই কি তা দেখতে পেতেন না ? আর ওঁর অন্য ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানোর ব্যাপারটা ? সে খবরও গাঁয়ের লোক বিলক্ষণ রাখত। নইলে ওই বয়সে ঢোলগোবিন্দদের কানেই বা সে খবর গেল কেমন করে ? মেয়ে তো নয়, একেকজন রূপের ধুচুনি। বোস-ঠাকুমার পাশে তারা কেউ পেত্নি, কেউ শাঁকচুন্নি। তবু ও-বাড়িতে কী তাদের

দাপট!

বলিহারি দিতে হয় বোস-ঠাকুমার মা-বাবাকে। এমন নয় যে তাঁরা খুব দীনহীন। সব জেনেশুনেও হাত-পা বেঁধে মেয়েকে জলে ফেলে দিতে হয়েছিল। ওঁরাও ছিলেন হুগলীর এক ভারী জমিদার। কলকাতায় নিজেদের বাড়ি। বোস-ঠাকুমার ভাইরা সব নামীদামী ব্যারিস্টার। কী এমন নবাব তারা যে, দিদিকে তারা একবারও দেখতে আসতে পারে না? কলকাতা থেকে দর্শনা কী আর এমন বেশি দূর! পঁচাত্তর মাইলও তো নয়।

খুব অসহ্য হলে বোস-ঠাকুমাই বরং ছেলেমেয়েদের ট্যাঁকে গুঁজে মাঝে-মধ্যে দু-চারদিনের জন্যে কলকাতায় বাপের বাড়িতে চলে গিয়ে একটু জিরিয়ে আসেন। নীলু-দেবুদের মুখে ঢোলগোবিন্দ শুনেছে, ওর মামারা নাকি খুব ভালো লোক। মামীরাও ওদের খুব যত্নআত্তি করে। মোটরগাড়িতে চড়ায়।

তবু একটা খটকা ঢোলগোবিন্দর মন থেকে যায় না। বোস-ঠাকুমা অতই যদি আদরের বোন হবে, ওঁর গায়ে একটুও সোনাদানা নেই কেন? বোস-ঠাকুমা কি তবে ছিলেন ওঁর বাপের দুয়োরানীর মেয়ে?

তারিণী দাদামশাইয়ের যত দোষই থাক, বউয়ের গয়নাগুলো বেচে দিয়েছিলেন—এ অপবাদ কেউ দিতে পারে না। গাঁয়ের কোনো লোক সে অপবাদ দেয়ও নি।

এইখানেই মুশকিল তারিণী দাদামশাইকে নিয়ে।

তারিণী দাদামশাইয়ের নানা রকম খুঁত কাড়লেও একথা কেউই বলত না যে, তারিণী বোস বদমায়েশ ছিলেন। মুখে চোটপাট করলেও খাজনা ছাড় দিয়েছেন, বিপদে সাহায্য করেছেন—হাতে মারলেও কখনও কাউকে ভাতে মারেন নি। সংসারে তাঁর আঠা ছিল না সত্যি, নারদের ঢেঁকিতে চড়ে সম্বৎসর নিজের মহালে চক্কর দিয়ে বেড়াতেন—কেন কিজন্যে কেউ জানত না। ঢোলগোবিন্দর কেবল মনে হত, তারিণী দাদামশাই খুব ছোট্টবেলায় সাপের মাথার মণির মতো কিছু একটা

হারিয়েছিলেন, বাকি জীবনভর সেটাকেই তিনি অন্ধকার হাতড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তারিণী দাদামশাইয়ের ওপর ঢোলগোবিন্দর খুব মায়া হত।

ঢোলগোবিন্দরা চলে যাবে শুনে তারিণী দাদামশাই এসে হাজির। ওর হাতে আর ওর দাদার হাতে একটা করে রুপোর টাকা দিয়ে দুজনকে কোলের মধ্যে নিয়ে তারিণী দাদামশাই যখন চুমো খাচ্ছিলেন, দুই ভাইয়েরই তখন মনে হচ্ছিল—মা বলেছিলেন না, দাদ জিনিসটা বড্ড ছোঁয়াচে ?

নৌকো নিয়ে পদ্মায় পাথর ফেলার কাজে গেছে ক্ষ্যাপাদা।

যাওয়ার আগে নিজের হাতে আমাকে তৈরি করে দিয়ে গেছে এক-জোড়া ভারি সুন্দর রণ্‌পা। বলেছিল, যখনই ইচ্ছা হবে এই রণ্‌পা করে ছুট্টে চলে আসবি।

বোসবাড়ির ঠিক সামনে ছোট্ট একটা মাঝিপাড়া। সেখানে রাস্তার ঠিক ধারেই ক্ষ্যাপাদাদের বাড়ি। খড়ের চাল। মাটির উঁচু দাওয়া। এইটুকু মনে আছে। বাড়িতে আর কে ছিল না ছিল কিচ্ছু মনে নেই।

ছিপছিপে চেহারা ক্ষ্যাপাদার। নাকমুখচোখের গড়ন এমন যে, দেখলেই বোঝা যায় ঘটে বুদ্ধি ধরে। অথচ জীবনে কোনোদিন পাঠ-শালায় যায় নি। নিজের নামটা অব্দি সই করতে জানে না।

ক্ষ্যাপাদা কথা যে বেশি বলে তা নয়। কিন্তু যা বলে তা অন্যদের শোনাবার মতন ক্ষমতা রাখে।

এ গাঁয়ের যত ছেলে-ছোকরা আমরা সবাই ক্ষ্যাপাদার চেলা। ক্ষ্যাপাদা যেখানে যায় আমরা ল্যাজ হয়ে তার সঙ্গে ঘুরি।

আমাকে ক্ষ্যাপাদা একবার শুধু গুলতিই দিয়েছিল তা নয়। সেই সঙ্গে মাটির ছোট ছোট গুলি বানিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিল। পোড়ামাটির সেইসব গুলি খেয়ে তাগড়াই কুকুররা পর্যন্ত কেঁউ-কেঁউ করে পালাতে পথ পেত না।

গুলি গুলতি রণ্‌পা—এসব তৈরি তো কিছুই নয়। ক্ষ্যাপাদার

ছিল অসাধারণ হাতের কাজ। ছোটো ছোটো মূর্তি তৈরি করত এমন যে তার কাছে কোথায় লাগে ঘূর্ণির পুতুল। নিজের রং নিজেই বানিয়ে নিত। নীলু-দেবুদের একবার গড়ে দিয়েছিল সরস্বতীর ছোট্ট প্রতিমা। ওরা সেটাকে পুজো করেছিল।

ধারালো ছুরি দিয়ে কাঠ খুদে খুদে মজাদার সব মূর্তি বানাত ক্ষ্যাপাদা।

তারপর বর্ষার ঠিক আগে নৌকো নিয়ে চলে যেত পদ্মায়। পাথর ফেলার কাজে। ফিরে আসত আমাদের জন্যে ঝুলিভরতি গল্প নিয়ে। তাতে কী থাকত না? ব্রহ্মদত্যি মাম্‌দোভূত পেত্নী শাঁকচুন্নি হুরী পরী—থাকত সব কিছুই। আমরা হাঁ করে গিলতাম।

ক্ষ্যাপাদার আসল টান ছিল অন্য জায়গায়। ওর ছিল ভাসানের দল। ক্ষ্যাপাদা ছিল তার অধিকারী।

ঢোলগোবিন্দর আজ এই ভেবে আপসোস হয় যে কেন সেই সময় টেপ রেকর্ডার বা ভিডিওর চলন হয় নি। আজকের লোকে তাহলে দেখতে পেত কেমন ছিল ক্ষ্যাপাদার সেই ভাসানের দল।

চাঁদের আলোয় বানভাসি হওয়া শুক্লপক্ষের রাত। আমরা বসেছি আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে ঘাসে ছাওয়া উঠোনে। গোটা কয়েক বাঁশ পুঁতে তাতে ঝোলানো হয়েছে লণ্ঠন।

মাঠে যারা গোরু চরায় তাদের নিয়েই গড়া হয়েছে ভাসানের এই দল। পুরোটাই পালাগান। কি মিষ্টি ছিল সবার গানের গলা। ফাঁকা মাঠে গেয়ে-গেয়েই বোধ হয় গলা অমন খোলতাই হয়।

যে ছেলেটার গলা একটু ভাঙা ভাঙা, ক্ষ্যাপাদাকে একদিন দেখেছি মহড়া দেবার সময় তাকে একদিন চড় মারতে। 'একশো দিন না বলেছি তোকে গুড়ুক খাওয়া কমাতে? তোকে হাজার বলেও কোনো কাজ হয় নি।'

গোয়ালাবাড়ির এক গা-ভারী ছেলে সাজত বেহুলা। সেজেগুজে কালোর মধ্যে ভারি সুন্দর দেখাত তাকে।

পেছন দিকে একটা চাদর টাঙিয়ে বসে ক্ষ্যাপাদাই সবাইকে মেকাপ করত। সে জায়গাটায় হত আমরা যারা ছেলেছোকরা তাদের যত ভিড়। বাড়ির বড়রা তো সব বাবুর দল। তারা বসত রোয়াকে। ছোটলোক চাষা-ভূষোদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে।

ঢোলগোবিন্দর অভিজ্ঞতা বলে, ছোটরা ভারি বিচ্ছু। যতদিন বয়স কম থাকে, বাড়ির বাবুদের চেয়ে—বরং, যারা সব সময় মনিবদের দাঁতে-দাঁতে থাকে, লাথিঝাঁটা খায় সেই সবার নিচে সবার পিছে থাকা কাজের লোকদের ওপরই তাদের বেশি টান থাকে। একটু বড় হোক, অমনি তোমার-আমার আপন-পর ইতর-ভদ্র ভাবগুলো ছাপিয়ে উঠতে থাকবে। সমাজ না বদলালে এসব যাবে না।

ক্ষ্যাপাদার ব্যাপারে ঢোলগোবিন্দর কাছে শেষ খবর ছিল এই: দর্শনায় যখন চিনির কল হল, তখন আমাদের গ্রাম থেকে নাকি সর্বপ্রথম ক্ষ্যাপাদাই গিয়ে সেখানে কলের কুলি হয়।

ক্ষ্যাপাদা চিনিকলের মজুর হয়েছে শোনার পর মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তখন আমিও বড় হয়েছি। শুধু আখ নয়, আখের মতো মজুরদেরও কলের মালিকেরা যে নিংড়ে নিয়ে ছিবড়ে করে দেয়—এটা সবে বুঝতে আরম্ভ করেছি।

যতদূর মনে হয়, ক্ষ্যাপাদাকে মজুর হতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। যুদ্ধের সময় জাপানিদের এসে পড়ার ভয়ে মাঝিদের নৌকোগুলো যেভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, তাতে ক্ষ্যাপাদার আর কীই বা করবার ছিল?

ক্ষ্যাপাদার রস নিংড়ে নেওয়ার ছবি দূরে বসেও মনশ্চক্ষে আমি যেন দেখতে পাচ্ছিলাম।

কুলুঙ্গিতে মাকড়সারা নিশ্চয় জাল বুনেছিল। তাতে আড়াল পড়ে গিয়েছিল ক্ষ্যাপাদার আস্তে আস্তে রঙ-চটে-যাওয়া পোড়ামাটির সব পুতুল আর খোদাই-করা কাঠের ছোট-ছোট মূর্তি।

দর্শনার ওপর দিয়ে যুদ্ধের বছরগুলোতে ঢোলগোবিন্দ কত বার গোয়ালন্দ গিয়েছে। বেছে বেছে সে গিয়েছে মেলগাড়িতে। পাছে

প্যাসেঞ্জারে গেলে দর্শনায় নেমে পড়বার ইচ্ছে হয়।

গেলে থাকবারও তেমন অসুবিধে হত না। মেজোমামা তখন একটার পর একটা ব্যবসায় লালবাতি জ্বেলে শেষ পর্যন্ত দর্শনায় লাইসেন্স নিয়ে একটা দেশী মদের দোকান খুলে বসে আছেন।

কেউ-কেউ দেখে এসে বলেছে, এ দোকানও ওঁর লাটে উঠবে। ওঁর কোনো খেয়াল আছে? সকাল থেকেই তো রং চড়িয়ে থাকেন। যে দুটো লোক রেখেছেন, তারা দিব্যি আঙুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছে। লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাবে না কেন? একবার করে বন্দুক নিয়ে বেরোন। দুটো একটা পাখি মেরে আনেন। নিজে রেঁধে অন্যদের খাওয়ান। সন্ধে হলে ইংরিজি-মিংরিজিতে কিসব গড়-গড় করে বলেন। দোকানের খদ্দেরের চেয়ে রুগীর ভিড়ই ওঁর কাছে বেশি হয়। বিনা-পয়সার ডাক্তার। অবস্থাবিশেষে ওষুধের পয়সাও ওঁর পকেট থেকেই যায়। গ্রামের লোকে ধন্য ধন্য করে। বলে, মানুষ তো নয়, দেব্‌তা।

রামনগরের ভদ্দরলোকেরা আমার লক্ষ্মীছাড়া মেজোমামাটিকে দুচক্ষে দেখতে পারত না। একে শুঁড়ি তায় মাতাল। আর মদ যখন খায় তখন চরিত্রহীন না হয়ে যায় না।

মেজোমামা লোকচরিত্র বিলক্ষণ বুঝতেন।

মা যখনই লোকনাথপুরে যেতেন কিংবা নওগাঁয় ফিরতেন মেজোমামা ইস্টিশানে এসে দেখা করতেন। থার্ড ব্র্যাকেটের মতো ইয়া ঝোলা গোঁফ। ভাঙা গাল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। আধময়লা ধুতি আর শার্ট সত্ত্বেও লম্বা চেহারায় একটা ডোণ্ট-কেয়ার ভাবের হাসি মেজোমামাকে ভিড়ের মধ্যেও ঠিক চিনিয়ে দিত।

আমাদের গ্রামের বাড়িতে মেজোমামা ইচ্ছে করেই যেতেন না। ভাইয়ের কথা তুলে পাড়ার লোকে পাছে মাকে কিছু বলে। বাবা-কাকা-দের কথার আড়ে ওই রকমের একটা নাকতোলা ভাব আমাদের নজর এড়ায় নি।

স্টেশনে এলেই মা যেন দুটো কান খাড়া করে থাকতেন 'ভুলি'

ডাকটা শোনার জন্যে। শ্বশুরবাড়িতে কেই বা আর মা-কে ও-নামে ডাকবে। কী একটা কাগজে মাকে একবার নামসই করতে হয়েছিল। মা গোটা গোটা অক্ষরে লিখেছিলেন : যামিনীবালা দেবী। নইলে ওই 'যামিনী' নামটাও চট করে আমরা জেনে উঠতে পারতাম না।

মেজোমামাকে মনে মনে আমরা দু ভাই-ই খুব ভালোবাসতাম।

যুদ্ধের সময় কতবার গোয়ালন্দে গিয়েছি। মন করলে অনায়াসে দর্শনায় নেমে টুক করে মেজোমামার খবর নিয়ে আসতে পারতাম। কে কী বলবে ভেবে পারি নি। আমি না হয়ে দাদা হলে ঠিক পারত।

বাড়ির লোকেদের চটাবার সাহস আমাদের দু ভাইয়ের মধ্যে এক-মাত্র দাদারই ছিল।

আমাদের গ্রামে একটা নাটক সবে যখন জমে উঠেছে, তখনই গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে বলে মনটা খারাপ লাগছে।

ব্যাপারটা পেকে উঠেছে ফকিরঠাকুরকে নিয়ে। মানে, আমাদেরই পাড়ার ফকিরকাকা।

ফকিরকাকা বরাবরই একটু ডানপিটে গোঁয়ার-গোবিন্দ। অমন নামী বাড়ির ছেলে, লেখাপড়াতেও ইস্তফা দিয়ে বসল যখন ওর শহরে গিয়ে কলেজে পড়বার কথা হল।

বামুনপাড়ার লোকে বলে, ছেলেটা বখে গেছে। দিনরাত্তির যতসব ছোটলোকদের সঙ্গে মেশে। কামারপাড়া ঘোষপাড়া জেলেপাড়ার লোকগুলো চুপচাপ শোনে আর ঠোঁট টিপে টিপে হাসে। ওদের ভাবখানা, ফকিরঠাকুরকে ভাংচি দিয়ে হাত করে বামুনপাড়ার ওপর খু একহাত নেওয়া গেছে।

ফকিরকাকা দুবেলা দুটো খেতে আসত। ব্যস, বাড়ির সঙ্গে আর কোনো সম্বন্ধ ছিল না।

কামারপাড়ায় ঘরামিদের সঙ্গে নিজে হাত লাগিয়ে কম পয়সা একটা চালাঘরও বানিয়ে নিয়েছে। বাড়ি ছেড়ে ওখানেই বোধহ

ফকিরকাকা পাকাপাকিভাবে গিয়ে থাকবে।

আমাদের চোখের ওপর ফকিরকাকার চেহারাটা দিন-দিন বদলে যাচ্ছে। রাত ফরসা হতেই কচাগাছের একটা ডাল ভেঙে দাঁতন করতে করতে মাঠের কাজে চলে যায়। খালি গা, হেঁটোয় ওঠা ধুতি, কোমরে গামছা বাঁধা। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে গায়ের রঙ যা হয়েছে, কে বলবে বামুনপাড়ার ছেলে। পৈতেটা ছাড়তে পারে নি। তবে এখন আর সেটা কাঁধ থেকে তেরছা হয়ে ঝোলে না। দো-ফেরতা করে কণ্ঠির মতো সেটা গলায় পরে। আর সব সময় সঙ্গের সাথী তার নিজের হুঁকো। এইভাবে বামুনদের জাত বাঁচানোতে গাঁয়ের চাষাভুষোদেরও একটা সায় ছিল।

ফকিরঠাকুরের বামুনের ভেখগুলো না থাকলে ওর জাত মারাটা চাক্ষুষ হবে কেমন করে?

বামুনপাড়ার লোকেরা ফকিরকাকার জাত খোয়ানোর ব্যাপারটা নিয়ে ভেতরে ভেতরে তখন বেশ চটিতং। তাদের দৃঢ় ধারণা, মেয়েমানুষ কিংবা নেশাভাং দিয়ে ছোটলোকেরা বামুনের ছেলেটাকে ফুসলে নিয়েছে। গোপনে তদন্ত করে তাদের সন্দেহের কোনো প্রমাণ যোগাড় করতে না পেরে তাতে অস্বস্তি আরও বাড়ছিল।

ঢোলগোবিন্দর কাছে ফকিরকাকা আজও এক রহস্য।

কলকাতায় এক সময় এক ব্যারিস্টারের ছেলেকে সে দেখেছে সিনেমায় শখ করে গেট-কীপারের কাজ করতে। ট্রামে-বাসে যখনই সে উঠত, কক্ষনো সীটে গিয়ে বসত না; দরজায় দাঁড়িয়ে ঘন্টি বাজাত।

পরে রাজনৈতিক জীবনে ঢুকেও সে দেখেছে, কিভাবে মধ্যবিত্ত ঘরের গ্রাজুয়েট ছেলে আন্দোলন করতে গিয়ে অশিক্ষিত আদিবাসী জীবনে নিজেকে নিঃশেষে মিশিয়ে দিয়েছে। 'নিচে নেমে যাওয়া', না 'হাত ধরে টেনে তোলা'—এই কঠিন প্রশ্নটার আজও সে কোনো সহজ সরল জবাব খুঁজে পায় নি।

এদের কারো সঙ্গে কারো সমস্যার মিল হবে না।

ফকিরঠাকুরের ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা। ফকিরকাকার কাছে মাথার কাজের চেয়ে মাঠের কাজের টানটাই ঢের বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। তার জাতবদল শখ করে বা আদর্শের টানে নয়। শিকড়ে ফেরার জন্যে।

ঢোলগোবিন্দ মাঝে-মাঝে নিজেকে বলে: ভুলে যেও না, ইতর থেকেই একদিন ভদ্র হয়েছিলে। জুতো সেলাই থেকে শুরু করে তবে তোমার পূর্বপুরুষেরা চণ্ডীপাঠে পৌঁচেছিল। পা থেকে মুণ্ডু, মুণ্ডু থেকে পা —এমনি করে ধমনীতে চলে রক্তের চক্কর।

সকালেও এসেছিল ডুগডুগির হাট থেকে আন্না পাগলী। সেই একভাবে। চাল চিবোতে চিবোতে।

কথার অর্ধেকটা গিলে ফেলে বলে ওর সব কথা বোঝা যায় না। বেশিটাই আন্দাজে ধরে নিতে হয়।

মা-র কাছে আন্নার যত আবদার। মা ওকে কখনও পুরনো কাপড় দেয়। কখনও বসিয়ে খাওয়ায়।

আন্না জানে না, হাটে যে বোষ্টমীটা থাকত—এক ছোকরা বোষ্টমকে ভাগিয়ে এনে এ-গাঁয়ের মাঝিপাড়ায় একটা আখড়া বানিয়ে যে থাকছিল —আজ এক সপ্তাহ হল সে ওলাউঠা হয়ে মারা গেছে।

বোষ্টমীর দাঁতগুলো ছিল মিশকালো। শুধু মিশিতে দাঁত অত কালো হয়? মুখশ্রীটা ছিল ভালো। গানের গলাটা ছিল একটু ভাঙা ভাঙা। ডুগডুগির হাটে যখন থাকত, হপ্তায় একদিন এসে গান শুনিয়ে যেত।

কিন্তু এ গাঁয়ে আসার পর থেকে ওর বাড়ি-বাড়ি ঘোরা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যেদিন যার দেবার কথা ভক্তরা নিজেরাই সিধেগুলো আখড়ায় পৌঁছে দিত।

মা-র কাছে যখন খবর এসে পৌঁছুল তখন বেশ বেলা। এ গাঁয়ে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো একজনই। আমার মা।

মা-র কাছে ছোটলোক বড়লোক নেই। তা ছাড়া গরিব-গুরবোদেরই

মা-কে বেশি দরকার। ওদের তো আর ডাক্তার-বদ্যি ডাকার মুরোদ নেই।

মালোপাড়ায় প্রসব করাতে যাওয়া নিয়ে ঠাকুরদার সঙ্গে মা-র একটু লেগেছিল। 'নোংরা ছোটজাত, একেবারে অতটা ওদের গায়ে গা না ঠেকালেই কি নয়?'

মা কোনোরকম তর্কে না গিয়ে 'বাবা, আমি আসছি' বলে লণ্ঠন হাতে নিয়ে চলে গিয়েছিল। একবার নয়। দুবার। সেই দুবারই আমি ঠাকুরদাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ঠাকুরদারই শেখানো দোঁহা আওড়েছিলাম :

যবলগ নাতা যাতকা
তবলগ ভক্তি না হোয়।
নাতা তোড় ভক্তি করে
ভক্ত কহাওয়ে সোয়॥

যতক্ষণ জাতের বালাই, ততক্ষণ ভক্তি নেই। বালাই যে কাটায় তাকেই বলে ভক্ত।

নিকিরিরা এর পর থেকেই মাঝে-মাঝে জোর করে আমাদের বাড়িতে মাছ দিয়ে যেত। পয়সা দিতে গেলে দু কানে হাত দিয়ে জিভ কেটে পালাত। সেই মাছে ঠাকুরদার মন ভিজেছিল। বলত, জাতে ওরা ছোট হলেও মনগুলো ওদের বড়।

হয়ত সেইজন্যেই পরের বিপদে মা-র বুক পেতে দেওয়ার ব্যাপার-টাতে ঠাকুরদার আপত্তির ভাব বেশ কমে এসেছিল।

কিন্তু ওলাউঠা রোগটা অত সহজভাবে তো আর নেওয়া যায় না। ছেলেপুলের বাড়ি। কোত্থেকে কী হয়ে যায় কে বলতে পারে?

মা ঠাণ্ডা মাথায় জানালেন, ময়লাগুলো সব পুড়িয়ে ফেলা হবে। সঙ্গে হাত ধোবার কারবলিক সাবান আছে। বাড়িতে লায়জলের জলে সব ভিজনো হবে। এতে ভয়ের কিছু নেই। 'তাছাড়া নওগাঁয় সেবার পশুপতিমামাদের বাড়িতেই তো কলেরা হয়েছিল। সেখানেও তো আমিই সেবাশুশ্রূষা করেছিলাম। আপনার মনে নেই?'

ঠাকুরদাকে দেখে মনে হল না মা-র কোনো যুক্তি ওঁর মনে ধরেছে।

মা-র সে রাত্তিরে বাড়ি ফেরা হয় নি। কলেরা রুগীর সেবা করতে যাওয়াটা আমাদের কাছেও একটু বাড়াবাড়ি ঠেকেছিল। সেই সঙ্গে ভয়ও হয়েছিল—মা-র যদি কিছু হয়।

আপন-পর ভাবটা খুব ছোটতেই এসে যায়। কোল বাছাবাছি দিয়ে তার শুরু। আরেকটু বড় হলে হয় ইতর-ভদ্রবোধ। স্বজাতি স্বদেশী — এসবও বড় হওয়ার আগেই মনের মধ্যে ঢুকে যায়।

ভোর হতে না হতেই ঢোলগোবিন্দ মাঝিপাড়ায় ছুটে গিয়েছিল। বেড়ার ধারে এসে দেখে উঠোনে কিছু ছেলে-ছোকরা ভিড় করে আছে। ক্ষ্যাপাদা ছুটো বাঁশের সঙ্গে একমনে কাতার দড়ি বেঁধে চলেছে। মা দাওয়ায় বসে। চোখ ছুটো লাল। মুখ দেখে মনে হল কিছুক্ষণ আগে কেঁদেছে।

ঠাকুরদার কথাগুলো ঢোলগোবিন্দর কানে তখনও বাজছে। কোথা-কার কে বোষ্টুমী। জাতের ঠিক নেই। তার জন্যে ...

সত্যিই তো। যে আমাদের কেউ না। বাড়ি-বাড়ি ভিক্ষে করে বেড়ায়। তার জন্যে অত কিসের?

ঢোলগোবিন্দ খবরটা দেবার জন্যে ছুটতে ছুটতে চলে এসেছিল বাড়িতে। পুজোর দালানের সামনে এসে হঠাৎ তার বুকের মধ্যে ধ্বক করে উঠল। দিদির লাগানো গোলাপ গাছগুলোর সামনে কে দাঁড়িয়ে? কাঁধে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে সেই বোষ্টুমী! খঞ্জনী বাজছে। 'হরি, তোমার পায়ে সঁপেছি মন'। আগেকার শোনা গান নয়। গলাটাও কেমন যেন অন্যরকম।

ঢোলগোবিন্দ লাফিয়ে পৈঁঠেগুলো ডিঙিয়ে বারান্দার ওপরে এল। মুখের দিকে তাকাতেই বুঝতে পারল এ অন্য লোক। দাঁতগুলো সাদা। বয়সও কম।

হঠাৎ কেন যে ওর কান্না পেল ও নিজেই জানে না। মোটেই সেই বোষ্টুমীর জন্যে ও কাঁদছে না। ও কাঁদছে মা-র জন্যে।

ভাগ্যিস, বাড়ির বড়রা কেউ তখনও ওঠে নি।

গোরুর গাড়ির ছইতে থেকে-থেকেই মাথা ঠুকে যাচ্ছে। গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে বলে ঢোলগোবিন্দর মন ভালো নেই। নইলে নলগাড়ির রাস্তা দিয়ে বৈঁচিফল খেতে খেতে দাদার সঙ্গে হেঁটে যেত। বাঁদিকে পড়ত জয়নালের বান। ডানদিকে আদিগন্ত আখক্ষেত। তারপর ঠেলে উঠত রামনগরের রাস্তায়।

পেছনে কত কী ফেলে যাচ্ছে ঢোলগোবিন্দ।

বর্ষা এল যখন বড় বড় ঢেউ ভেঙে নৌকোয় ভারি ভারি পাথর নিয়ে পদ্মা পাড়ি দেবে, হে মা রক্ষেকালী, ক্ষ্যাপাদাকে তুমি দেখো।

নীলু-দেবুদের পুরনো বাড়িতে বড় বেশি সাপের উৎপাত, হে মা মনসা, তুমি ওদের নিরাপদে রেখো।

যে কেন্নোগুলোকে টোকা মারলেই টাকার মতন গুটিয়ে যায়, তারা যেন দয়াময়ের মা-র সামনে না আসে। জ্যাঠাইমা কেন্নো দেখলেই ভয়ে কেমন যেন কেঁচোর মতন হয়ে যান।

জিওলগাছের সেই রক্তাক্ত ব্যথার জায়গাটাতে ফুঁ দেওয়ার মতো করে হাল্কা হাওয়া যেন বয়ে যায়।

কাঁচপোকা, তোমরা থেকো। দিদি বাপের বাড়ি এলে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে দুপাশের রগে ভিজে গামছা চেপে ধ'রে চুলে পাতা কেটে কপালে পরবে আমারই ধরে দেওয়া কাঁচপোকার টিপ।

দিদির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকে প্রজাপতিগুলোর যে কী হয়েছে, এখন আর কারো গায়ে এসে বসে না। দেওয়ালে বসে রংতামাসা করে।

ইঁদারার পাশে ঝোপগুলোতে সন্ধে হলেই আকাশের তারার মতন ঝিকমিক করবে জোনাকির দল। করবে কি? যদি তাদের দেখার কেউ না থাকে, তাহলেও?

গাড়ির দুলুনিতে ঘুম আসে।

বনকালীতলায় গাঁসুদ্ধ লোক এক পঙক্তিতে বসেছি। বছরে একদিন বনভোজন। এই একটা দিন জাতপাত নেই। ইতরভদ্র নেই। কেন এই একটা দিন সম্বৎসর হয় না?

কামারবাড়ি চুপচাপ। কুমোরপাড়ায় চাক ঘুরছে না। ছুতোরবাড়ি ভোঁ-ভাঁ। ঝেঁটিয়ে মেটেরির মেলায় গেছে।

মা গো দেখ, সুদর্শন পোকা! সুদর্শন। যে দেখে তার কপাল ভালো।

ছইতে ঠুকে গেল কপাল।

চোখ তাকিয়ে দেখি দর্শনা স্টেশন। প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে কে? চেঁচিয়ে ডাকছে—ভুলি! ও ভুলি!

কে আবার? আমার লক্ষ্মীছাড়া মেজোমামা। দেখে মনে হচ্ছে, সকাল থেকেই চড়িয়েছে।

১৩

লাল-নীল হলদে-কাগজ

প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে যাওয়া। মেজো-মামার সেই ছবিটাই মনের মধ্যে আজও দাঁড়িয়ে আছে।

ট্রেনে চড়ার আগে বাবা পই পই করে বলবেন, জানলা দিয়ে ঝুঁকো না।

এসব যাতায়াতপর্বে বাবা তো আর সঙ্গে থাকেন না। মা-র কাছে সব সাতখুন মাপ। জানলার পাশে বসা নিয়ে দাদার সঙ্গেই যা একটু খুনসুটি হয়।

লাইনের ধারের গাছপালা আর লোহার থাম্বাগুলো কেন যে পেছনে ছোটে, আয়নায় ডান-বাঁয়ের উলটো ছাপ পড়ার মতোই আজও সেটা যে রহস্য সেই রহস্যই থেকে গেছে। কিংবা রেললাইনের স্লিপারে দাঁড়িয়ে দূরদিগন্তে সমান্তরাল তুটো রেখার ক্রমান্বয়ে মিলিয়ে যেতে দেখা।

বড় বড় সব ইস্কুলেই ম্যাগাজিন বেরোয়। ঢোলগোবিন্দ সেসব ম্যাগাজিনের পোকা। বিশেষ করে, ভ্রমণকাহিনীগুলো সে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়ে। কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই তার মাথায় ঢোকে না। একটা লোকের কথা সব লেখাতেই থাকে। সে হল পানিপাঁড়ে। যে স্টেশনই আসুক, পাঁড়েজী হাজির। একই সঙ্গে এতগুলো স্টেশনে একই লোক হাজির থাকে কেমন করে?

এইসব ভ্রমণকাহিনীর লেখকেরা সবাই ছুটিতে মা-বাবার সঙ্গে হাওয়া বদলাতে যেত পশ্চিমে। শিমুলতলা দেওঘর মিহিজাম ঝাঁঝা গিরিডি মধুপুর। এইসব নামের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় ইস্কুল ম্যাগাজিনের পাতায়।

ঢোলগোবিন্দ জানত অসুখ করলে তবেই লোকে হাওয়া বদলাতে যায়। ঢোলগোবিন্দর অসুখ করে না কেন?

পদ্মা ছিল তার কাছে যেন ব্যাডমিণ্টনের একটা নেট। ঠুকুস-ঠুকুস করে তার ওপর দিয়ে একবার সান্তাহার আর একবার দর্শনা। এই তার রেলভ্রমণের দৌড়।

সাড়া ব্রিজ এলেই ধুম পড়ে যাবে তামার পয়সা ফেলার। মা জপ করতে থাকবেন দুর্গানাম।

ঈশ্বরদিতে পৌঁছে সোরাবজীর চা। সত্যি সে চায়ের তুলনা ছিল না।

নাটোরে এসে কাঁচাগোল্লা।

মাঝে কোথাও মাটি দাবড়ে হাওয়ায় ঝড় খেলিয়ে সাঁইসাঁই করে ছুটে চলে যাবে দারজিলিং মেল।

যে বড়পিসিকে কখনও দেখি নি, বনগাঁ থেকে তাঁর মৃত্যুর খবর এল। বড়পিসিমা ছিলেন ঠাকুরদার প্রথম সন্তান। বাবা ছিলেন দ্বিতীয়।

ঠাকুমা না থাকায় বিয়ের পর থেকেই মা-র ওপর এসে পড়েছিল ছোটদের মানুষ করার ভার। সেজোকাকা ছোটকাকাও মা-রই আওতায় বড় হন।

যৌথ পরিবার থাকা অবস্থায় আমার যে সব খুড়তুতো ভাইবোনেরা জন্মেছিল, তারা সবাই আমার মা-র কোলেই মানুষ হয়।

মেজোকাকার বড় ছেলে মণ্টুই আমার মা-কে 'আম্মা' বলা শুরু করে। মুসলিম প্রতিবেশীদের প্রভাবে নয়, কথাটা ছিল 'আমার মা'-র সংক্ষিপ্ত রূপ। ভাইবোননির্বিশেষে ওরা সবাই সেই থেকে আমার মা-কে 'আম্মা' বলে আসছে।

অনেক পরিবারেই দেখেছি এই রকমের বিশেষ একেকটা ডাক চালু হয়ে যায়।

মণ্টু হওয়ার পর আমি আর দাদা গেলাম ছিটকে। তারও আগে অবশ্য মা-র শূন্য কোল কিছুদিন জুড়ে বসেছিল মঞ্জু। দীনেশ জ্যাঠা-

মশাইয়ের মেয়ে।

বড়পিসেমশাইয়ের ছিল চার ছেলে তিন মেয়ে। সবার বড় বুলিদি। তারপর বোদনদা আর হরিদা। তারপর দুই বোন লিলি আর কেষ্ট। শেষ দু ভাই ভন্তু আর নিতু।

বাড়িতে দেখার লোক নেই বলে লিলি, কেষ্ট আর ভন্তু চলে এল আমার মা-র কাছে। নিতুর ভার নিলেন বুলিদি। নিতু এখন লা মার্টি-নিয়ারে পড়ায়। ওর বউ শুভা কদিন আগে রাত্তিরে রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়িচাপা পড়ে মারা যায়। শেষ জীবনে বোদনদা সংসারত্যাগী হয়ে মারা গেছেন সাধুদের এক আশ্রমে।

বাবার ছিল অদ্ভুত স্বভাব। সবার সব ভার নিজে যেচে ঘাড়ে নিতে বাবার জুড়ি ছিল না। সংসার কিভাবে চলবে সে হিসেব বাবার মাথায় আসত না। বাবার ভরসা ছিল মা টেনেবুনে কোনোরকমে চালিয়ে দেবেন।

মা-র হাতে ছিল কি হরিদাদার দইয়ের ভাণ্ড? তাহলে?

এই তাহলেটাই ঢোলগোবিন্দর জীবনের বিস্ময়। বাবা যে জীবনে এক কানাকড়িও ঘুষ নেন নি, লোকে কি মনেপ্রাণে তা বিশ্বাস করত?

দিদির বিয়ের আগে অবধি সংসারটা ঠেলাগোঁজা করে চলত। দিদির বিয়ের পরই যা মুখ থুবড়ে পড়ার অবস্থা হয়েছিল। বিয়েতে মা যা সোনাদানা পেয়েছিলেন তার সবটাই চলে গিয়েছিল দিদির বিয়ে দিতে। তাও তো পুরো পাওনা মেটানো যায় নি। তাই নিয়ে দিদির শাশুড়ির কিটিয়ে-কিটিয়ে লেখা কত চিঠি।

বড় গোছের ধার ছিল দুর্গাঠাকুরের কাছে। মারোয়াড়ি মহাজন হয়েও মানুষটি ছিলেন হৃদয়বান। আস্তে আস্তে মাসে মাসে ওঁর টাকা যেমন শোধ হচ্ছিল হচ্ছিল, তার জন্যে কখনও তাড়া দেন নি।

মুদিখানায় মাসকাবারির টাকা শোধ করা নিয়েই হচ্ছিল জ্বালা।

বাইরের লোকে এসব জিনিস জানতও না। আমি হওয়ার পর দাদা হয়ে যায় সাবালক। দুধ ছাড়িয়ে তাকে চা ধরানো হয়। মন্টু হওয়ার পর

সাবালক হয়ে যাই আমি।

ঢোলগোবিন্দদের বাড়ির এই ছিল ধারা।

মা-র সাদাসিধে চেহারায় সেই দৈন্যদশার বিলক্ষণ ছাপ থাকলেও, বাবাকে দেখে সেসব বোঝবার জো ছিল না। পোশাকি হোক বা আট-পৌরে হোক, বাবা যাই পরতেন কোনোটাই খেলো জিনিস হত না। জামা-কাপড় সংখ্যায় কম। কিন্তু বাড়িতে কাচা হত বলে বাবা সব-সময়ই থাকতেন ধোপদুরস্ত। এদিক থেকে বড় হয়ে দাদা পেয়েছিল বাবার স্বভাব, আমি পেয়েছি মা-র।

এর মধ্যেই কলকাতা থেকে বাবা শখ করে কিনে আনলেন একটা নতুন সাইকেল। অবশ্যই ধারের টাকায়।

নতুন সাইকেল পেয়ে বাবাকে এত খুশি হতে কখনও দেখি নি। রোজ ধুয়েমুছে সাইকেলটাকে বাবা ঝকঝকে তকতকে করে রাখেন।

অদৃষ্টের চোখে বাবার এই সুখ বোধহয় সয় নি। কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখি আস্তে আস্তে বাবার ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে গেছে। রোজই সাইকেলের একটা না একটা খুঁত ধরা পড়ছে। হঠাৎ এক জায়গার রঙ চটে গিয়ে ধরা পড়ল একটা লম্বা চিড়-ধরা দাগ।

বাবাকে সেই প্রথম ছেলেমানুষের মতন কাঁদতে দেখেছিলাম।

সেদিন সকালেই মুদির দোকানের কেউ এ-বাড়ির কাউকে বোধহয় কড়া করে কিছু বলেছিল। আমরা ইস্কুলে যাবার আগে খামে একটা চিঠি এসেছিল। তাতে ছিল জয়রামপুরের পোস্টাপিসের ছাপ। নিশ্চয় দিদির শাশুড়িঠাকরুনের চিঠি।

আমরা বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখি হৈ-হৈ কাণ্ড। কাকারা বাবাকে আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরে সামলাচ্ছে। কাকিমার হাতে কেড়ে-নেওয়া একটা ছুরি।

বাবা নাকি ছুরিটা নিজের গলায় বসাতে গিয়েছিলেন।

আমাদের বাড়িটা তখন কামাখ্যা-থেকে-ফেরা মা-র হাত ধরে নওগাঁ

শহরে বেশ খানিকটা নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে।

মেসবাড়িতে লোক আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। কেউ থাকেন সপরিবারে অল্প মেয়াদে। কেউ কেউ ক্ষণিকের অতিথি।

বাইরের লোকদের বেশির ভাগই বদলির চাকরি। আমাদের লাইন বরাবর কোয়ার্টারগুলোও অনবরত এই খালি এই ভরতি।

আজ ভেবে অবাক লাগে, সেকালে সাধারণ গ্রাজুয়েট হওয়াকে লোকে যেখানে তিনটে পাস দেওয়া বলত—সেই সময়ও এম. এ. পাস করে শুধু নয়, ডক্টরেট হয়েও কোন্ হিসেবে লোকে আবগারি দারোগার চাকরিতে ঢুকত?

কলেজ তখন কটাই বা ছিল? কিছু সরকারি, কিছু বেসরকারি আর কিছু মিশনারি। কলেজের চাকরির চেয়ে সরকারি কাজে কি মাইনে বেশি ছিল? নাকি বেশি ছিল চাকরির নিরাপত্তা?

স্কটিশে ইংরিজির অধ্যাপক ছিলেন সিদ্ধেশ্বর চৌধুরী। ছেড়ে দিয়ে কোন্ দুঃখে তিনি হতে গেলেন আবগারির ইনসপেক্টর? কিংবা ইতিহাসে ডক্টরেট পাওয়া যোগেন কাকাবাবু? তিনি তো হয়েছিলেন সামান্য দারোগা। এঁরা কেউই ঘুষ নেওয়ার পাত্র ছিলেন না।

এটা আজও আমার মাথায় ঠিক ঢোকে না।

কিংবা রবীন্দ্রসাহিত্যে সুপণ্ডিত সমবায়ের রেজিস্ট্রার সুকুমার চাটুজ্জে? কিংবা তাঁর ভাই অঙ্কের বাঘা ছাত্র খদ্দরধারী অ্যাকাউণ্টাণ্ট জেনারেল বসন্ত চাটুজ্জে?

আবগারিতে আর-একজন ছিলেন, নাম ভুলে যাচ্ছি। বাবা তাঁকে দাদা বলতেন। মাঝে-মাঝে উদয় হতেন মেসবাড়িতে। ভোরবেলায় তাঁর বাজখাঁই গলার 'রমেশ চা কর' ডাকে আমাদেরও ঘুম ভেঙে যেত। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ছিল তাঁর প্রাণ। তখন বোধহয় মহাস্থানগড় নিয়ে খুব কাজ চলছিল। একেকবার আসতেন আর গদগদ হয়ে বলতেন পুরনো সেইসব দিনের কথা। সরকারি চাকুরে হয়েও মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন গবেষক। চাকরির ছুতো করে একবার রাজশাহী একবার মালদহ

ঘুরে বেড়ানো ছিল তাঁর কাজ।

দেশের প্রতি এঁদের ভালোবাসার অন্ত ছিল না। তা সত্ত্বেও কেন তাঁরা সাধ করে সরকারি চাকরির শেকলে নিজেদের বেঁধেছিলেন, সেটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। নাকি আমাদের স্বদেশী আন্দোলনেই মাথামোটা ভাবটা এত প্রবল ছিল যাতে জ্ঞানবুদ্ধির চর্চা আর সূক্ষ্ম চারু-বোধ রাজনীতির দিকে তেমন ঘেঁষে নি। একজন নজরুল আর একজন মুকুন্দদাসকে ঠেকিয়ে দিয়ে এদিকের মস্ত ঘাটতিটা ঠিক পূরণ হয় না।

যোগেনকাকাবাবু ছিলেন কিছুদিন আমাদের প্রতিবেশী। ঘরকুনো মুখ-চোরা গোছের ভালোমানুষ। বইয়ের পাহাড় দেখে লোকে বুঝত পণ্ডিত-মানুষ। তার ওপর অবিবাহিত বলে পারলেই লোকে ওঁর পেছনে লাগত। কারো সাতেপাচে থাকতেন না বলে কারো মনে খুব একটা ছাপ ফেলতে পারেন নি।

পরে এলেন নিখিলকাকাবাবু। ওঁর ছোট ছেলে খোকা। লোকে যাকে সিনেমার অভিনেতা দিলীপ রায় বলে জানে। সেই খোকা তখনও হয় নি। বড় ছেলে শিবু ছিল আমার সমবয়সী।

পাশাপাশি থেকে আমাদের দুটো পরিবার আত্মীয়ের মতো হয়ে গিয়েছিল। তার পেছনে ছিল মা আর কাকিমার হলায়-গলায় বন্ধুত্ব।

কাকিমা আর মা-র চেহারার মধ্যেও বেশ খানিকটা মিল ছিল। দুজনেরই রঙ ছিল কালো। পরনে লালপাড় সাদা শাড়ি। প্রায় শাঁখা-সর্বস্ব হাত। কাকিমার কপালের লাল সিঁদুরের টিপটা শুধু হত মা-র টিপের চেয়ে আকারে বড়ো।

নিখিলকাকাবাবুর সঙ্গে বাবারও খুব ভাব হয়ে গেল। যদিও দুজনের দু-রকমের স্বভাব। নিখিলকাকাবাবু ছিলেন দিলদরাজ ফুর্তিবাজ মানুষ। খরচও করতেন দুহাতে।

ও-বাড়িতে ভালোমন্দ যা হত, আমরাও তার ভাগ পেতাম।

শিবুর এক মামা ছিলেন। বোধহয় অমূল্যমামা। ক বছর আগে

শেষ দেখা হয় আনন্দবাজারে। তার আগে একবার হঠাৎ শেয়ালদায়। বানপুরের ট্রেনে তাঁর এক দাদাকে তুলে দিতে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন অমলেন্দু দাশগুপ্ত আর বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের বাবা। আলাপ হয়ে কী ভালো যে লেগেছিল বলার নয়। ফিরে এসে সেদিন খালি কাকিমার কথা মনে হয়েছে।

পরে কলকাতায় ফিরে আবার দেখা হয়। কাকিমা মা-কে একটা বড় টেবিল ফ্যান দিয়েছিলেন। সেও কি আজকের কথা? বছর বাহান্ন আগে। খোকা তখন কাকিমার কোলে। টুলু, পরিতোষ, খুকী—সবাই তখন ছোট। বড় হয়ে ক্যারিকেচারে নাম করেছিল পরিতোষ।

কলকাতায় ছেলেবেলায় বাড়িতে আমরা কখনও পাখার হাওয়া খাই নি।

তাতে খুব একটা কষ্ট হত বলে তো মনে পড়ে না। তার হয়ত দুটো কারণ ছিল। প্রথমত কলকাতায় তখন এত বাড়ি হয় নি। চারপাশে গাছপালা ডোবা-পুকুর খোলা জায়গা তখন বিস্তর। অন্তত দক্ষিণ কলকাতায় তো বটেই। ফলে, রোদেপোড়া এত ইঁট আজকের মতন এভাবে শহরের মানুষকে দগ্ধে মারত না। দ্বিতীয়ত, ক্রমবর্ধমান কলকাতায় অন্তত ভবানীপুর পর্যন্ত মশার কোনো উপদ্রব ছিল না।

আমাদের বাড়িতে খানিকটা মোটার ধাত ছিল বলে মা-ই যা একটু গরমে হাঁসফাঁস করতেন। কাকিমাদের বাসাটা ছিল লেক প্লেস আর সরদার শঙ্কর রোডের মোড়ে ও-অঞ্চলের শেষ বাড়ি। কাকিমাদের বাড়িতে গিয়ে পাখার নিচে বসেই মা বলতেন 'আঃ, বাঁচলাম।' কাকিমার সেটা নজর এড়ায় নি।

কাকিমার দেওয়া সেই টেবিল ফ্যান খুলে ক-বছর আগেও দিদিকে হাওয়া খেতে দেখেছি। পুরনো সেইসব জিনিসের কী জান ছিল!

নওগাঁয় কাকিমা-র কাছে এসে থাকা শিবুর কোনো এক কাকার কথাও মনে পড়ে। কী যেন ভালো নাম? নাঃ, মনে পড়ছে না। কাকার বয়স বেশি ছিল না। লেখাপড়া বেশিদূর না হওয়ায় তাঁকে দেওয়া হয়ে-

ছিল মেয়ে-ইস্কুলের বাস চালাবার একটা কাজ। তাই নিয়ে কেউ কেউ হাসাহাসিও করত। তার কারণ, কাকাকে প্রায়ই দেখা যেত, ঘুরে-ফিরে প্রায়ই গোঁফ ঠিক করার ছল করে আরশিতে নিজেকে দেখছেন।

মেসবাড়ির উত্তরদিকের যে ফ্ল্যাটে দীনেশ জ্যাঠামশাইরা থাকতেন, সেখানে পরের পর কত পরিবার এল গেল।

যাঁদের বাড়িতে একজন বাঁদী ছিল। হয় রসুই পাকাত নয় রান্নার যোগান দিত। তার পরনে থাকত অসম্ভব ময়লা শাড়ি, নোংরা গায়ে সব সময় পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ। মেসবাড়ির মাঠে ফেলে-দেওয়া জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো কুড়িয়ে কুড়িয়ে সে খেত।

বাঁদী বলে ওর জন্যে আমার খুব কষ্ট হত। বাড়ির লোকে তাকে খাটিয়ে মারত। কারো কাছে তা নিয়ে যে নালিশ করবে, সে সাহস-টুকুও তার ছিল না।

পরে ও-বাড়িতে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা পশ্চিমবাংলার মুসলমান। তাঁদের চালচলনে একেবারেই কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। আমার বাবাকে বলতেন দাদু। দাদা কথাটাতে আরেকটু আদর মাখিয়ে। ওঁর মেয়ে ডলিদি।

হারমোনিয়াম বাজিয়ে খুব ভাল গান গাইতেন ডলিদি।

একদিনের কথা মনে আছে। ওঁদের বাড়িতে গিয়েছেন স্বামী বাসুদেবানন্দ। একটা ঘরে স্বামীজীর পাশে আমি বসে আছি। ডলিদি হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছেন। কিছু রবীন্দ্রনাথের গান। কিছু মীরার ভজন। গানগুলো স্বামীজীর যে কী ভালো লেগেছিল বলার নয়। রেকাবিতে করে স্বামীজীকে যে খাবার দেওয়া হয়েছিল তিনি তার পুরোটাই চেঁছেপুঁছে খেয়ে নিয়েছিলেন।

একদিকে যেমন হিঁদুয়ানির গরম, তেমনি উঁচুজাত নিচুজাত—এই জ্ঞানটা বড়দের মধ্যে ছিল তখন টনটনে।

তুলসীদাস-কবিরের অতসব উদার মনের দোঁহা আওড়ালেও ঠাকুরদাকে দেখেছি এসব ব্যাপারে একটু টুসকি দিলেই কেন্নোর মতন গুটিয়ে যেতেন। বাবা অত মাটির মানুষ হয়েও এসব ব্যাপারে একটু ঠোকা লাগলেই মাটি খসে ভেতরের খড় বেরিয়ে পড়ত।

আচ্ছা, ঢোলগোবিন্দ বলেছ কি ছেলেবেলা থেকেই চুলকাটাকে কেন ও যমের মতো ভয় করে?

গোড়ায় মাঝে-মধ্যে বাড়িতে এসে যিনি আমাদের চুল কেটে দিয়ে যেতেন, তাঁর চেহারায় ছিল একটা রুক্ষ কড়া ভাব। কথার মধ্যেও তাঁর একবিন্দু রসকস থাকত না। এক তো অনন্তকাল ঘাড় হেঁট করে বসে থাকো, চড়-চাপড় দিয়ে মাথা ঘোরানো। সেইসঙ্গে লোহার চিরুনি আর কাঁচির খোঁচা দিয়ে বাপের নাম ভোলানোর তাঁর ছিল অদ্ভুত ক্ষমতা!

কিছুদিন পরে শুনি বাড়ি বয়ে আর তিনি চুল কাটতে আসবেন না। চুল কাটতে হবে তাঁর বাড়িতে গিয়ে।

তার কারণ, তপশিলী হওয়ায় তাঁর ছেলে তখন বি.এ. পাস করে ডেপুটির চাকরি পেয়েছে। ছেলের মান রাখার জন্যেই তাঁকে এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।

ওঁদের বাড়ি ছিল ট্রেজারি পেরিয়ে বাজারের কাছাকাছি এক পাড়ায়। চুল সামান্য একটু বড় হলেই বাবা আমাদের সেখানে ঠেলে পাঠাবেন। একে তো অতটা রাস্তা ঠেঙিয়ে যাওয়া। তার ওপর ছেলে পদস্থ হওয়ার পর ওঁর গজগজানিও বেড়ে গিয়েছিল তেমনি। নাকের জলে চোখের জলে হয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে মনে হত—এত বড় শহরে আর কি কোনো নাপিত নেই?

ছেলেবেলায় চুল কাটতে যাওয়ার সেই ভয়টা আজ এই বুড়ো বয়সেও ভূত হয়ে ঢোলগোবিন্দর ঘাড়ে ভর করে রয়েছে। নাপিত দেখলে সাধে সে ডরায়?

বসির সাহেবের বাড়িটা ছিল আরও একটু এগিয়ে। উনি ছিলেন

ও-অঞ্চলের ভোটে-জেতা নতুন এম.এল.সি.। এখন যেমন বলা হয় এম.এল.এ.। ওঁর বাবা ছিলেন গ্রামের এক বিরাট ধনী চাষী। গাঁজার খেতাল তো বটেই, তার ওপর পাট চাষের পয়সা। শহরে বড় পাকা বাড়ি। উঠানে বিস্তর মুরগি।

বাবা কী একটা কাজে গিয়েছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। বসিরসাহেবের বাবা এসে খুব খাতির-যত্ন করে আমাদের বসালেন। কামানো গোঁফ, সেইসঙ্গে বুক পর্যন্ত লম্বা দাড়ি। লুঙ্গির ঝুল হাঁটু ছাড়িয়ে পায়ের ডিম অব্দি নামানো। পান-দোক্তায় কালো হওয়া দাঁত। খুব বিনয়ী স্বভাব। আদর করে আমার থুতনিটা একটু নেড়ে দিলেন।

উঁকি দিয়ে কিছু দেখার উপায় নেই। বাড়ির আষ্টেপৃষ্টে খড়খড়ি, চিক আর পরদা।

বাবার সঙ্গে ব্যবহার আবগারির লোকের সঙ্গে গাঁজার খেতালের যেমনটা হয়ে থাকে ঠিক তেমনি।

বসিরসাহেবের বাবা ভেতরে যেতে বসিরসাহেব ঘরে ঢুকলেন। গায়ের রঙ কালো কুচকুচে। পরনে সাদা সুট। গলায় লাল টাই। পায়ে সাহেববাড়ির চকচকে গ্লেজকিডের দামী জুতো। বাবার সঙ্গে আদাব-বিনিময় হল।

ক্লাস এইট অব্দি পড়া বিদ্যে হলেও বসিরসাহেবের চলনে-বলনে ছিল বেশ একটা শানদার ভাব। রাজধানীর মাঞ্জায় এই দু বছরেই চোখে পড়ার মতন কাজ হয়েছে।

খেতালের ছেলের সামনে বরং বাবাকেই কেমন যেন আড়ষ্ট আড়ষ্ট মনে হচ্ছিল। ছেলেমানুষ হলেও দু পক্ষেরই অস্বস্তি আমি যেন আন্দাজ করতে পারছিলাম। বসিরসাহেব চাইছিলেন ঘাড়টাকে চেষ্টা করে একটু শক্ত করে রাখতে। বাবা চাইছিলেন নিজের শক্ত ঘাড় একটু নরম করতে। দু পক্ষেরই ভয় কোনো একটা দিক পাছে বেশি হেলে যায়। যে দেখে তার পক্ষে খুব মজার।

কথার মাঝখানে ভেতর থেকে এসে গেল চা, বিস্কুট আর ডিমভাজা।

বাবা কেন ডিমভাজা খেলেন না আমি বুঝেছিলাম। ডিমটা মুরগির বলে। তখনও মুরগি কিংবা মুরগির ডিম খাওয়া হিঁদুয়ানিতে বাধত। বাবা একবার আমার দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে ডিমটা ভেঙে আমি মুখে পুরে দিলাম। আমি তো ছেলেমানুষ। কোনটা কিসের ডিম আমি কি ছাই অত বুঝি?

ঢোলগোবিন্দর গুণের ঘাট নেই। এক তো কিছুই তার মনে থাকে না। না নাম, না দিনতারিখ। তবে আর কিসের স্মৃতিকথা কপচায় সে? তাছাড়া উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দেওয়া তো আছেই। ইদানিং আবার গোদের ওপর বিষফোড়া হয়েছে তার একটা কথা ফিরে-ফিরে বলবার ঝোঁক। আর তার চেয়েও মারাত্মক, একই কথা দুবার বলতে গিয়ে কথার খেলাপ হয়ে যাওয়া।

বয়েস হলে এসব মাশুল তো দিতেই হবে।

হ্যাঁ, ভালো কথা। বেলুড় মঠে গিয়ে ওর বাবা মা-র দীক্ষা নিয়ে আসার কথা ঢোলগোবিন্দ বলেছিল কি?

মা-র ইচ্ছায় আর তাগাদাতেই ব্যাপারটা ঘটেছিল, সন্দেহ নেই। এর সূত্রপাত হয় মা-র সম্পর্কিত মামা পশুপতি দাদামশায়ের নওগাঁর মুনসেফ হয়ে আসার পর। পশুপতি দাদামশাই ছিলেন স্বামী বাসুদেবানন্দের দাদা। এমন আত্মভোলা ভালোমানুষ বড় একটা দেখা যায় না।

বাড়িতে অনেক ছেলেমেয়ে। বাবা-মা দাদু-দিদিমা বললেও তাঁদের ছেলেমেয়েদের আমরা দাদা-দিদিই বলতাম। বড় ছেলে পান্টুদা ছিলেন আমার ছোটকাকা-সেজোকাকার বয়সী। গোপালদা আমার দাদার সমবয়সী। জগন্নাথ ছিল আমার বন্ধু। ওঁদের সারা বাড়ি ছিল আমার আর দাদার গান আর আবৃত্তির ভক্ত।

স্বামী বাসুদেবানন্দের ডাকনাম ছিল পটল মহারাজ। বাগবাজারের আশ্রমে থাকতেন। উদ্বোধন-এর সম্পাদক ছিলেন। বেদ-উপনিষদে তাঁর ছিল অসাধারণ দখল। ওঁর আরেক দাদা থাকতেন কলকাতায়। গৃহী

হলেও তাঁর মধ্যেও ছিল প্রবল ধর্মভাব। কলকাতায় ফিরে এসে ছেলেবেলায় তাঁর মুখেই প্রথম লেনিনের নাম শুনেছিলাম।

ঠাকুরদেবতায় ভক্তি মা-র বরাবরই ছিল। একটু বয়স হলেই কারো-না-কারো কাছে মন্ত্র নেওয়া সে সময়ে ছিল রেওয়াজ। বাবা কেন, ঠাকুরদার মধ্যেও ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি রকমের কোনো টান দেখি নি। লক্ষ্মীপূজো, ব্রত-উপবাস—এসব করলেও কারো শিষ্য হওয়ার ইচ্ছে মা-র মধ্যে খুব প্রকট ছিল না।

মা হঠাৎ বাবাকে নিয়ে বেলুড় মঠে মন্ত্র নিতে কেন ছুটলেন তার কারণটা খুলে বলতে কখনও দ্বিধা করেন নি।

"মন্ত্র নিলে মাছ মাংস ছাড়তে হয় বলেই তো এতদিন কোনো গুরু পাকড়াতে চাই নি। পশুপতি মামাই বললেন ও সবের কোনো বালাই থাকে না বেলুড় মঠের শিষ্য হলে। সেইজন্যেই তো—"

বাবা তাঁর বন্ধুমহলে বেশ একটু গর্বের সুরেই বলতেন—

"এ তো তোমার গিয়ে ধুনা-জ্বালানো হেঁজিপেঁজি বাবাজী নয়। আমাদের গুরু হলেন মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী শিবানন্দ। মহাপুরুষ মহারাজ। রামকৃষ্ণ পরমহংসের সাক্ষাৎ শিষ্য। এমন ভাগ্য কজনের হয়?"

কিছুদিন এই চলল।

মেজোকাকা তখন জুট আপিসে চাকরি নিয়ে চলে গেছেন কলকাতায়। বাইরের ঘরের বদলে ওঁদের ঘরটা হয়েছে এখন মা-বাবার শোবার ঘর। এক কোণে আগে যেখানে ভিড় করে ছিল দেবদেবীর ছবি, সেখানে এসে জায়গা জুড়ে বসেছেন রামকৃষ্ণদেব, সারদাদেবী আর স্বামী বিবেকানন্দ।

বাবা প্রাতঃস্নান সেরে মালা জপতে বসেন। আমাদের চোখে কেমন যেন বেমানান লাগে।

বাবার মতন অস্থির মানুষ কতদিন চোখ বুঁজে ধ্যানস্থ হয়ে মালা জপ করেন সেটা দেখবার।

ভক্তির ভাব না কমলেও আসলে বসে থাকার মেয়াদটা আস্তে আস্তে কমে গিয়ে বাবার মালা জপার পাটটাই শেষ পর্যন্ত উঠে গেল। বাবার ধাত যাঁরা বুঝতেন, মা বা পশুপতি দাদামশাই, তাঁরা সবাই একবাক্যে বললেন—ওতে কিছু হয় না। আসলে নাম করা নিয়ে কথা। ঠাকুর বলেছেন, যারা দিনে একবার মনে মনে তাঁকে স্মরণ করে, তাদেরও সমান পুণ্যি হয়।

অর্ধাঙ্গিনী তো। মা তাই নিজের পুজোপাট বাড়িয়ে দিয়ে বাবার এই ঘাটতি পূরণে বেশি বেশি করে মন দিতে শুরু করলেন।

এসে গেল হৈ-হৈ করে পুজো।

সেবার আর দেশের বাড়িতে আমাদের যাওয়া হল না। সামনেই নদীতে দূরপাল্লার সাঁতার। করোনেশন থিয়েটারে আসছে কী এক অপেরা কোম্পানি। গণপতির ম্যাজিক। চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর হাস্য-কৌতুক। বায়োস্কোপ দেখানো হবে 'আঁধারে আলো'।

ঘোড়ার গাড়িতে ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে বিলি হবে বিজ্ঞাপনের লাল-নীল হ্যাণ্ডবিল।

মণ্টু চলে গিয়ে এখন মা-র কোল জুড়ে বসেছে আমার মা-মরা পিসতুতো ভাই ভন্তু। লিলি আমার বয়সী। ও কেমন যেন একটু কাঠ-কাঠ। ছোটবেলায় তেমন আদর পায় নি বলে সবার আদর কাড়তে চায়। কেষ্ট ধীরস্থির মেয়ে। বড়পিসিমা কেন মেয়ের নাম কেষ্ট রেখেছিলেন জানা হয় নি। রঙ একটু ময়লার দিকে বলে কি? অথচ কেষ্টকেই আমরা সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছিলাম।

মা-র কামাখ্যা-ফেরত ছেলেবন্ধুরা আর তস্য বন্ধুতে মিলে আমাদের বাড়ি রীতিমত আড্ডাখানা। তার ফল হল এই যে, আমার সেজোকাকা-ছোটকাকা বিস্তর সমবয়সী বন্ধু পেয়ে গেল।

সে আড্ডার মধ্যমণি আমার মা।

একদল ছিল গানঅন্ত প্রাণ। বাকিরা খেলাধুলো সমাজসেবা আর

দস্যিপনা নিয়ে থাকত। মা-র গলায় সুর ছিল না বলে শেষের দলটার সঙ্গেই ছিল বেশি ভাব। মা ছিলেন তাদের রুগীর সেবায় রাত জাগার সঙ্গী। প্রথম দলে চিত্তকাকা-বিশুকাকারা। দ্বিতীয় দলে ন্যাদনদা-আলুদারা।

চিত্তকাকা কাজ করতেন ব্যাঙ্কে। ওঁর ছিল গানের একটা বাঁধানো খাতা। সেই খাতায় লেখা থাকত গোটা গোটা সুন্দর অক্ষরে রবিঠাকুরের গান। ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়তেন সাঁওতাল পরগণার দিকে। গানের খাতাটাই ছিল ওঁর ডায়রি। তাতে থাকত নানা জায়গার নাম। গিরিডি ডোরাণ্ডা তারগণ্ডা।

কেষ্টঠাকুরের মতো ছিল তাঁর গায়ের রঙ। সাদা খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি। তার ওর থাকত সাদা খদ্দরের একটা চাদর। ফলে, বয়সের তুলনায় একটু বেশি বড় দেখাত। কথা বলতেন খুব নীচু গলায়। চালচলনে ছিল কবি-কবি ভাব। পাশ থেকে আঁচড়ানো লম্বা চুল হাঁ-মুখে এসে পড়ত। সেই চুল দাঁতে কামড়ানো ছিল তাঁর মুদ্রাদোষ। মাঝে-মাঝে চোখ দুটো ওপর দিকে তুলে উদাস হয়ে তাকাতেন।

সব বাড়িতেই চিত্তকাকার ছিল অবারিত দ্বার। আর সেই সঙ্গে অন্দরমহলে ঢোকার অবাধ অধিকার।

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে চিত্তকাকার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না। খদ্দরটা ছিল তাঁর কাছে শুধু শুচিশুভ্রতা আর শুদ্ধাচারের প্রতীক।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য আর রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল ওঁর পরম প্রিয়। সেসব গান উনি কার কাছে শিখেছিলেন ভগবান জানেন। পরে পদে পদে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, সুরগুলো ভুল ছিল। হোক ভুল। তবু সেই ভুল সুরেই মনে মনে সেই সব গান গেয়ে আজও যারপরনাই আমাদের সুখ.

দুটো ছুটিতে লোকনাথপুরে থেকে দুটো জবর জিনিস হারিয়েছি।

এক তো গান্ধীজীর নওগাঁ সফর। ঠাকুরদা বলতেন গাঁধী। ফুটবলের মাঠ নাকি লোকে ভরে গিয়েছিল। ফিরে এসে ওই ভিড় হওয়ার

কথাটুকুই যা শুনেছি। স্বাধীনতার ডাক দিয়ে গেছেন ব্যস ওই পর্যন্ত।

আর এসেছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁর 'চা পান না বিষপান' তখন সারা শহরে লোকের মুখে মুখে ঘুরছিল।

আমাদের পাড়ায় তখন নবাগত অনেকেই। যেমন, সান্টারা। মেসবাড়িতে সুশীল গুপ্ত। সুশীলদার বউ বি.এ. পাস। বিয়ের আগে ছিলেন মাস্টারনি। নিঃসন্তান বলে বৌদির কাছে আমাদের আদরের শেষ ছিল না।

পুকুরের পুবে যে দোতলা কুঠিতে মবিনুদ্দিনসাহেব থাকতেন সেখানে এসেছেন রঞ্জিত চৌধুরী। ওঁর মেয়ে করুণা তখন এইটুকু। ওর কী একটা বড় অসুখে মা রাত জেগে সেবা করেছিলেন; সেই থেকে ওঁরা হয়ে গেছেন আমাদের আত্মীয়ের মতো।

মফস্বল জীবনে এইরকম হয়। আলাপ থেকে আত্মীয়তা জন্মাতে দেরি হয় না।

সুশীলদার বাড়িতেই প্রথম খেয়েছিলাম ভাজা স্নাইপ পাখি। ঠাকুরদা কখনও 'স্বাদ' বলতেন না। বলতেন 'তার'। সেই তার এখনও আমার মুখে লেগে আছে।

সান্টা আমার চেয়ে সামান্য বড়। কিন্তু পড়ে আমার চেয়ে অনেক উঁচুতে। সান্টা আর আমি ছিলাম বউদির সর্বক্ষণের সঙ্গী। আমার মা-র মতন বউদিকে তো আর হেঁসেল ঠেলতে হত না আর নিজের পরের মিলিয়ে একগাদা ছেলেপুলে মানুষও করতে হত না। কাজেই আমাদের সঙ্গে গল্প-গুজব করবার সময় ছিল অঢেল।

আমার ছুটির শেষে ফিরতেই বউদি ডেকে পাঠালেন সান্টাকে। বললেন, আচ্ছা, এবার তোমরা শোনো আচার্য পি. সি. রায়ের বক্তৃতা।

সান্টার বক্তৃতা দেওয়ার সেই ভাবটা আজও আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে। ওর একটা হাত হাফপ্যান্টের বাঁ পকেটে ঢোকানো। মাথাটা এমনিতেই ওর একটু হেলানো থাকত। একবার শুনে টানা অত বড় বক্তৃতা কী করে ও মনে রেখেছিল, আশ্চর্য! শুনতে শুনতে আমাদেরও

মনের মধ্যে সে-বক্তৃতা কিভাবে নাড়া দিয়েছিল বলার নয়।

বাঙালীকে বড় হতে হবে। হ্যাঁ, ব্যবসাতেও। অন্যেরা যা পারে কেন বাঙালীরা তা পারবে না? কেন বাঙালী শুধু চাকরিবাকরি করে মরবে?

আমরা ধরেই নিয়েছিলাম বড় হয়ে সান্টা নেতাগোছের কিছু হবে। জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেবে। ওদের পরিবারে স্বদেশিয়ানার একটা ঐতিহ্যও ছিল। নিদেন পক্ষে হবে একজন স্বাধীন ব্যবসায়ী।

হয় নি। শেষ পর্যন্ত সারা জীবন সরকারি চাকরি করে রিটায়ার করার পর হয়েছিল হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। তারপর একদিন হঠাৎ মারা যায়।

বউদি ছিলেন ঢাকার মেয়ে। আমার মা-কে 'মাসিমা' বলতেন। বউদির 'স'টা ছিল একটু হিন্দিঘেঁষা। তালব্যের চেয়ে দন্ত্য বর্ণের দিকেই বেশি ঝোঁক পড়ত। এই নিয়ে বউদির পেছনে লাগতে আমরা ছাড়তাম না।

বউদি ছিলেন 'প্রবাসী'র গ্রাহক। বিয়ের আগে থেকে। আলমারিতে ছ-মাস ছ-মাস করে পুরনো সব সংখ্যা বাঁধানো অবস্থায় থাকত। পত্রিকার জন্যে মানুষ যে কী অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করে বউদির বেলায় তা দেখেছি।

তখনও আমার ঠিক পত্রিকা পড়ার বয়স হয় নি। তবু নতুন কাগজ এলেই পাতা উলটে উলটে দেখতাম। প্রথম পৃষ্ঠায় রবিঠাকুরের একটা লেখা থাকবেই।

রোজই বউদির কাছে গিয়ে আমার পড়বার কথা থাকত। পড়া শুরু করে বউদিকে গল্পে ফাঁসিয়ে দিতাম। কিংবা অঙ্ক ধরিয়ে দিতাম। বউদি ছিলেন অঙ্কে কাঁচা। কাজেই পড়া ভণ্ডুল হতে দেরি হত না।

কোনো-কোনোদিন সান্টাকে ডেকে নিয়ে এসে আমরা বসতাম প্ল্যানচেটে। বউদির ছিল একটা তিনপায়া টেবিল। আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিতেন সুশীলদার বেকার ভাগনে মণিদা।

প্ল্যানচেট নিয়ে খেলাটা আমাদের বেশিদিন টেঁকে নি। পরলোকের মানুষদের সম্বন্ধে কৌতূহল জাগার সেটা বয়স নয় বলেই বোধহয় ও-ধরনের পাকামিতে মন সায় দিত না।

মণিদা ছিলেন আড়ালের মানুষ। খুব চুপচাপ। এক টিপ নস্যি নিয়ে বসে থাকতেন। মাঝে-মধ্যে দু-একটা মোক্ষমধরনের ফোড়ন কাটতেন।

ওই বয়সেরই ছিলেন আরেকজন। কালুমামা। বাবার কোন্ এক যেন বন্ধুর শালা। খুব পান খেতেন। সেই জন্যেই বাড়ির গিন্নিদের সঙ্গে খুব ভাব জমাতেন। বাড়ি ছিল বোধহয় মদন বাড়াল লেনে। কলকাতার ঘটি বলতে যা বোঝায়। সবাইকে বাঙাল ঠাউরে খুব রাজা-উজির মারতেন। পরে কলকাতায় এসে একবার দেখা হয়েছিল। সরুস্য সরু এক এঁদো গলিতে হাড়জিরজিরে একটা বাড়ির পৈঁঠেয় গায়ে কোঁচার খুঁট জড়িয়ে বসে পাড়ার ধাড়ি ছেলেদের টেনিস বল নিয়ে ফুটবল খেলা দেখছিলেন। আমি 'কালোমামা' বলে ডাকতেই কেমন যেন চুপসে গিয়ে দূর থেকে হাতটা উঁচু করে ক্ষীণ গলায় বললেন, "সব ভালো তো?" মুখটা নামিয়ে নেওয়ায় আমি আর উত্তর দেবার জো পেলাম না।

সে যাই হোক, এই বউদিদিই কিন্তু প্রথম আমাকে লেখার কথা বলেছিলেন।

এই জায়গায় ঢোলগোবিন্দকে একটা জিনিস একটু সমঝে দেওয়া দরকার। দেখো ঢোলগোবিন্দ, এ নিয়ে আদিখ্যেতা করে অনেক জায়গায় তুমি অনেক কিছু বলেছ। দেখা গেছে, সেগুলো হুবহু এক নয়। এখানে আবার বেশি তালিবালি করো না।

ঢোলগোবিন্দ কোনো কথা দেয় না। ঢোঁক গেলে। কেন আমি জানি। ওর স্মৃতিটা ওর কাছে জ্যান্ত জিনিস। সেটা বাড়ে কমে, রোগা মোটা হয়। যেমন মনে রাখে, তেমনি ভুলেও যায়।

আসলে ব্যাপারটা কিছুই নয়। আমাদের ডেকে বউদি একদিন

ছুটির সকালে বললেন, "আচ্ছা, আজ তোরা একটা দেশপ্রেম নিয়ে পদ্য লিখে আন তো।"

পদ্য। হ্যাঁ, সে সময় 'কবিতা' কথাটার মোটেই চল ছিল না।

আমি তো সারাটা দিন বসে বসে মাথার চুল ছিঁড়লাম। মাথায় কিচ্ছু এল না। শেষ অব্দি বউদির কথা রাখতে পরের পর কয়েকটা লাইন সাজিয়ে তাতে আকাশ বাতাস জল মাটি বৃষ্টি শিশির এই গোছের চক্ষুগোচর মোটা মোটা কথা লিখে দিলাম।

কাগজটা উলটে-পালটে বউদি বললেন—এর মধ্যে দেশপ্রেম কোথায় রে? তা ছাড়া এ তো পদ্যও হয় নি।

সেই যে দমে গেলাম, তারপর ছ-সাত বছর আর পদ্য কেন, লেখা-লিখিরই ধারপাশ মাড়াই নি।

এদিকে এক কাণ্ড হল।

নওগাঁয় এলেন এক নতুন এস-ডি-ও। অনেক ছেলে-মেয়ের মধ্যে দুটি মেয়ে ছিল ইস্কুলে পড়ার যুগ্যি।

এস-ডি-ও রায়সাহেব মানুষটি খুব ভালো। কিন্তু তাঁর একটা বায়না কে. ডি. ইস্কুলের হেডমাস্টারকে এমন ঝামেলায় ফেলল বলার নয়।

রায়সাহেবের দুই মেয়েকে ইস্কুলে ভর্তি করে নিতে হবে। তা কি করে হয়? এটা তো ছেলেদের ইস্কুল.

মহকুমা হাকিম বলে কথা। তদুপরি রায়সাহেব। উপরোধে শেষ অব্দি ঢেঁকি না গিলে উপায় রইল না।

ঠিক হল, মেয়েদের জন্যে সামনে বসবার আলাদা ব্যবস্থা হবে।

ঢি-ঢি পড়ে গেল সারা শহরে। ঘোর কলি না হলে এমন হয়? ছেলে-ইস্কুলে মেয়ে পড়বে?

হৈ চৈ থেমে যেতে দেরি হল না। যত যাই হোক, মহকুমা হাকিমের মেয়ে। অত যে কড়া হেডমাস্টার, তাঁকেও নরম হতে হল।

কিন্তু গুজবের মুখে হাত চাপা দেবে কে? আজ এই গল্প। কাল

সেই গল্প।

ক্লাসের যে ফার্স্ট বয়, জানো তো তার খাতা চেয়ে নিয়েছে মহকুমা হাকিমের মেয়ে!

শুধু কি তাই? বাড়িতেও নাকি একদিন ডেকে নিয়ে গেছে।

শুনেছ কাণ্ড? ওই ইস্কুলের একটা ছেলে গলায় দড়ি দিয়েছে? ওদের মধ্যে নাকি চিঠি চালাচালি হয়েছিল। মেয়েটা বেঁকে বসাতেই ছেলেটার মন ভেঙে গিয়েছিল।

আরে, এ খবর জানেন না! ওদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় এবার ফেল করেছে? তাহলেই বুঝুন।

এতদিনে একটা মেয়েঘটিত ব্যাপার পেয়ে শহরের মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। গাঁজাগোলায় তখন মন-মন গাঁজা পোড়ানো হচ্ছে। এক কাহনকে তিন কাহন করতে গিয়ে রাস্তাঘাটে নাকে কাপড় দেবার কথাও তখন আর কারো মনে রইল না।

আর ঠিক এই সময়েই আমাদের বাড়িতে ঘটল একটা নিদারুণ শোকের ব্যাপার।

মাত্র কদিনের টাইফয়েড জ্বরে আমাদের বড় আদরের কেষ্ট হঠাৎ মারা গেল।

যে রাত্তিরে ওর খুব বাড়াবাড়ি অবস্থা, আমাকে সে রাত্তিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল শুভালালদের কোয়ার্টারে।

আমাকে ঘুমোতে হয়েছিল গাঁজার ধোঁয়ায় দমবন্ধ-হওয়া সেই ঘরে। অনেক রাত অব্দি আমি শুধু ভগবানকে ডেকেছিলাম। বলেছিলাম—যা চাও তাই দেব, হে ভগবান, তুমি শুধু কেষ্টকে বাঁচাও।

ভগবান সে কথা কানে তোলে নি। উলটে ধাড়ি বয়সে বিছানাটা ভিজিয়ে দিয়ে আমার মাথাটা লজ্জায় হেঁট করে দিয়েছিল।

তারপর আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল রঞ্জিত কাকাবাবুদের বাড়ি। রঞ্জিত কাকাবাবুর মা আমাকে খুব আদর-যত্ন করে খাইয়েছিলেন।

এক বাটি ঘন দুধ খুব তারিয়ে তারিয়ে খেয়েছিলাম।

হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল কেষ্টর কথা।

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে আমি সেদিন মরমে মরে গিয়েছিলাম।

১৪

সময় হল, নোঙর তোলো

পেছনের খাল পেরোলে ফুটবলের মাঠ। তার পশ্চিম দিয়ে গেছে দূরদূরান্তরে যাওয়ার সেই রাস্তা। ঘাড়ে চিঠির থলি নিয়ে ঘণ্টা ঠুনঠুনিয়ে রোজ বাঁধা সময়ে যায় রানার। মাঝে-মধ্যে আসে জমিদারদের হাতি। উট আসে বক্‌রিদের আগে কোরবানির জন্যে।

উত্তরে একটু এগোলে আশ্রম। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের। তখনও ওঁদের তেমন নামডাক হয় নি।

কী একটা উপলক্ষ থাকায় আশ্রমে লোক আসছিল কাতারে-কাতারে। তার আবার বিশেষ একটা কারণও ছিল।

ঢোলগোবিন্দ থামল। এই প্রসঙ্গে ও একটু আলুদার কথা বলে নিতে চায়।

স্মৃতির পুঁজি যাদের কম, তাদের সকলেরই কিছু ব্যাঙের আধুলি থাকে। আলুদা হল ঢোলগোবিন্দর এমনি এক ব্যাঙের আধুলি। ওর সব স্মৃতিকথাতেই আলুদা ঘুরেফিরে আসে।

গ্রীক পুরাণে শিল্পের দিক্‌পাল দেবী ন-জন। (আমাদের সরস্বতী অবশ্য একাই একশো।) হালে সিনেমাকে অবশ্য দশম স্থানে বসানো হচ্ছে। ফলে দশটা দিকই ভরে ফেলা গেছে। সাহিত্য যে সবার ওপর দিয়ে যায়, এটা গুমর করে বলবার জন্যেই পুরাণের এই অবতারণা। সাহিত্যে দেশকালের বেড়া যখন খুশি টপকানো যায় বলে সাহিত্যের প্রতি ঢোলগোবিন্দর এই পক্ষপাত।

ছাই! আসল কারণটা আমি জানি। বেজায় ভুলো বলে ঢোলগোবিন্দ যখন যেটা মনে আসে সেটা তখন তখনি কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে হালকা

হতে চায়। পরে সুযোগ মিলবে কিনা কিংবা কনুই চালিয়ে জায়গা করে নেওয়া যাবে কিনা কে বলতে পারে।

নওগাঁ থেকে ঢোলগোবিন্দরা চলে আসার পর দু-তিন বছরের মধ্যে একবার বাংলা খবরের কাগজে সেকালের প্রথম বাঙালি বৈমানিকদের ওপর একটা লেখা বেরিয়েছিল। তাতে ছিল আলুদার ছবি। তার নীচে লেখা ছিল কে. এন. চৌধুরী। কৃষ্ণেন্দুনাথ চৌধুরী।

দু বছর আগে বৈমানিকের বেশে আলুদার সেই ফটো শিলিগুড়িতে ওঁর বাড়ির বৈঠকখানার দেয়ালে টাঙানো আছে দেখে এসেছি।

সে যুগে প্লেন চালানো শিখতে বিস্তর টাকা লাগত। আলুদার পক্ষে সেটা খুব বড় রকমের বাধা হয় নি। পুরনো জমিদারি ছিল। কিন্তু অত কাঠখড় পোড়ানোর পরও শেষরক্ষা হল না। তখন ছিল ইংরেজদের আমল। স্বদেশি করে কেউ জেলের চৌকাঠ ছুঁলেই সরকারের কাছে সে হত অচ্ছুত। পুলিস রিপোর্টে সেটা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় আলুদা ওড়াবিদ্যে শিখেও পাইলটের লাইসেন্স পেলেন না।

এরপর মনে-মনে ঢোলগোবিন্দ এক লাফে চলে আসে আজকের শিলিগুড়িতে। মাঝখানের আধখানা শতাব্দী যেন কিছুই নয়।

আলুদার জীবনে তা অনেক কিছু। দেশভাগ হওয়ার পর লাখ লাখ টাকার কারবার বিষয়-সম্পত্তি ফেলে দিয়ে একদিন হঠাৎ রাতারাতি আলুদাকে একবস্ত্রে সীমান্ত পেরিয়ে চলে আসতে হয়েছিল। ধরাশায়ী না হয়ে আলুদা যে আবার মাটি থেকে ঠেলে উঠেছিলেন, সমস্ত ঝড়-ঝাপটা কাটিয়ে এখন যে তিনি শিলিগুড়ির মস্ত লোক, আলুদা বললে লোকে যে এক ডাকে চেনে—হয়ত এটা সম্ভব হয়েছে আকাশের মতিগতি বুঝে শূন্যে ভাসার মন্ত্রটা যৌবনে পা দিয়েই তিনি শিখে নিতে পেরেছিলেন বলে।

বাবুপাড়ায় আলুদার বাড়ির দুই গেটে দুটো মূর্তি।

একটি মূর্তি ঢোলগোবিন্দর চিনতে একটু মুশকিল হয়েছিল। সে

মূর্তি সৌম্যকান্তি এক সাধুর।

আলুদার বাবা। কামদাকান্ত চৌধুরী।

আমরা নওগাঁয় থাকতেই উনি সংসার ত্যাগ করে সাধু হন। আমি ওঁকে একবারই দেখেছি।

সন্ন্যাসী হয়ে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উৎসব উপলক্ষে সেই তাঁর প্রথম নওগাঁয় আসা। সাধুবেশে ওঁকে দেখার জন্যে শহর ভেঙে লোক এসেছিল।

এখনও মনে আছে, বাঁশের বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে আমি আর দাদা ঠায় তাকিয়ে আছি। আলুদার বাবা কামদাবাবু এক জায়গায় আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে চোখ বুঁজে ধ্যান করছেন।

এক সময় এসে হাজির হলেন আলুদার মা। তাঁর চোখের কোণে জল। ভেতরে গিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করলেন। মনে হল, আলুদার বাবা একবার চোখ খুলে তাকালেন। পরক্ষণেই চোখের পাতা বুঁজে গেল। মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। কিছুক্ষণ আঁকা ছবির মতো দাঁড়িয়ে থেকে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে আলুদার মা বেরিয়ে এলেন।

একটু আগে আলুদার বাবাকে দেখে ঢোলগোবিন্দ মনে মনে খুব তারিফ করছিল। আলুদার মা চলে যাওয়ার পরে-পরেই তার সেই মনের ভাব হঠাৎ বদলে গেল। আলুদার বাবার ওপর তার খুব রাগ হতে লাগল। যারা সাধু-সন্ন্যাসী হয়, তাদের নিশ্চয় দয়ামায়া কম।

সাঁতারটা রপ্ত করে চলে গেলাম তার পরের ধাপ সাইকেলে।

বাঁ পা প্যাডেলে রেখে ডান পায়ের ঠেলায় টুক করে গোটা শরীরটা মাটি থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া। ডান কাতে সাইকেলটা থাকবে সামান্য হেলানো। তখন আর মাটিতে পা পড়বে না গর্বে।

এরপর শরীরের ভার সামলে ডান পা-টা আরেকটু উঠিয়ে রডের তলা দিয়ে গলিয়ে খপ করে ডান প্যাডেলটা ধরে নেওয়া। এবার পুরো পাক প্যাডেল ঘোরাতে পারলে আর নামা বা থামা নেই। চরৈবেতি

চরৈবেতি।

মাথায় আরেকটু বড় না হওয়া অবধি এমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলতে থাকে। তারপর সময় আর সুযোগ বুঝে একদিন হ্যাণ্ডেল ছুটো ঝুঁটির মতো পাকড়ে লাফ দিয়ে ঘাড়ে উঠে সিটের ওপর বসে পড়ো।

তখন চলার গতিবেগে এক স্বর্গীয় সুখ। খানাখন্দ মাঠঘাট পেরিয়ে শয়নে স্বপনে চালিয়ে নিয়ে যাবে ছুটো ছুরন্ত ঘুরন্ত চাকা।

ছুটো চড়নদার পায়ের নিচে ক্রমাগত পিছলে যাবে ধুলোয় ধরাশায়ী মাটি।

আর ছেলেবেলার সেই দিনগুলোতে হঠাৎ হঠাৎ যে কারো বাড়ির পৈঠেয় দাঁড় করিয়ে রাখা সাইকেলগুলো চোখের নিমেষে বেপাত্তা হয়ে গিয়ে খানিক পরে যে-কে সেই কখন যে ফিরে এসে যাবে, যার সাইকেল সে হয়ত তা জানতেও পারবে না।

শরীরে কিছু একটা হয়। খেলতে খেলতে ঠ্যাংটা একটু বাড়িয়ে দেওয়া। ডিগবাজি খেয়ে কেউ পড়ে গেলে হাততাল দিয়ে হেসে ওঠা। কে ছুর্বল সেটা বুঝে নিয়ে খুনসুটি করা। চাঁটি মারা। চিমটি কাটা। যাতে সে ব্যথা পায়। যাতে তার লাগে।

পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে। রাগ চড়ে গেলে মনে হয় মেরে ফাটিয়ে দিই। 'কাম অন, ফাইট' হয়ে যায় কথার মাত্রা।

ঢোলগোবিন্দর মনে পড়ে, এক সময় সে কী নিষ্ঠুর ছিল। ছুতো-নাতায় একবার কারো গায়ে হাত তোলা। মেরে হাতের সুখ করা।

তার মধ্যে আত্মরক্ষার কোনো ব্যাপারই ছিল না। হিংস্র জন্তুর মতন আগ বাড়িয়ে শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়া। খেলায় প্রতিপক্ষকে হারাবার জন্যে সে জান লড়িয়ে দিত।

বাইরে প্রকাশ পেত না। ইচ্ছেগুলো থাকত প্রচ্ছন্ন। মনের কোণে লুকোনো।

ছায়াদিদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, কিভাবে মনে নেই।

রায়সাহেব আসার পর থেকেই শহরের হাওয়াটা ঘুরে গিয়েছিল। তার কারণটা শুধু এ নয় যে, তাঁর দুই মেয়ে প্রায় জোর করেই ছেলেদের ইস্কুলে ভরতি হয়েছিল।

শুধু মহকুমার হাকিম তো নন। ইস্কুলেরও চাঁই লোক। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে তাঁর হুকুম নড়াবে?

শুনে মনে হবে, খুব জাঁদরেল লোক। নিশ্চয় খুব জবরদস্ত। একেবারেই নয়।

তার একটা প্রমাণই যথেষ্ট। সামান্য আবগারি দারোগার ছেলে হয়ে আমরা অকুতোভয়ে তাঁকে মেসোমশাই আর তাঁর স্ত্রীকে মাসিমা বলে ডাকতাম। আস্ত একটা মহকুমার হাকিম। সে কি যা-তা কথা?

আগে পরে অনেক হাকিমই এসেছে গেছে। আত্মীস্বয় আর মিশুক বলতে ওই একজনই। রায়সাহেব।

হয়ত এর পেছনে মাসিমারও হাতযশ ছিল। এটা তো ঠিক যে, মেয়েদের উনি আঁচলের তলায় রেখে পুতু-পুতু করে মানুষ করেন নি।

ছায়াদি কণাদি প্রথম দিনই সোজা নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল ওদের খাবার ঘরে।

বাড়িটাও ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম। বাপরে, কী বড় বাড়ি! নদীর দিকে মুখ ফেরানো। কী বড়-বড় ঘর আর বারান্দা। বাগানে কত ফুলের গাছ।

হওয়ারই কথা। হাকিম যে।

মাসিমা খুবই দরাজ মনের ভালোমানুষ। মা-র মতো ভাব আছে, তবু ঠিক মা নয়। মা-র মতোই গা-গতরে ভারী। তবে রং অনেক ফরসা। আঁচলে চাবির ভারটাও অনেক বেশি।

সচ্ছল সংসারের মানুষ যারা, তাদের চালচলন কথাবার্তা আদর-আপ্যায়নের ধরনটাই হয় একটু আলাদা। ঢোলগোবিন্দ লক্ষ করেছিল মাসিমার সোনার চুড়িগুলো একটুও ম্যাড়মেড়ে নয়। কিংবা ক্ষয়ে পাতলা হয়ে যায় নি। হাঁকডাকের মধ্যে ছিল একটা নিঃসংশয় কর্তৃত্বের সুর।

আমার মা-র মতন কালো রঙের মুখে একটা শুকনো খড়িওঠা ভাব কিংবা কপাল-কোঁচকানো কোনো রেখা নেই।

অভাবের সংসারে মানুষ হওয়ার এই একটা মুশকিল। মনটা কখনই খুব একটা নিভাঁজ হতে পারে না। কুঁকড়ে ছোট হয়ে যায়। তুলনা আর প্রতিতুলনার ফেরে পড়ে কিছুই আর সহজভাবে নেওয়া হয়ে ওঠে না।

শুধু ছায়াদিই যা আলাদা।

অরগান বাজিয়ে গান শোনায় ছায়াদি। শুনেই বোঝা যায় চিত্ত-কাকার শেখানো রবিঠাকুরের গান। সেসব গানের কোনো সুরই যে ঠিক নয়, ছায়াদি তা নিশ্চয় পদে পদে ঠেকে শিখেছিল।

ছোটদের যতটা হাবাগোবা ভাবা যায়, আসলে তারা তা নয়। ঢোলগোবিন্দ সেই সময়েও নিজেকে দিয়ে তা বুঝতে পারত। ওরা মিচকে শয়তান। সব বুঝেও না-বোঝার একটা ভান করে।

সব বোঝে, এটা বলা অবশ্য ঠিক হল না। খানিকটা কুকুরের মতো। গন্ধ পায়। একটা কোনো ব্যাপার আছে—এটা বড়দের কথা থেকে আঁচ করতে পারে। স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গের ব্যাপারটাই যে জগতে সবচেয়ে মুখরোচক, কান একটু খাড়া রাখলেই তা টের পাওয়া যায়।

রায়সাহেবদের বাড়িতে ঢোলগোবিন্দ এই যে এতক্ষণ কাটাচ্ছে, বাইরে সেটা লক্ষ করবার লোকের অভাব নেই। এ বাড়ি থেকে বেরনো মাত্র কেউ না কেউ ধরবে। 'কী রে, হঠাৎ এদিকে ? গিয়েছিলি কোথায় ? তা তোকে গান গাইতে বলল ? আবৃত্তি ? শুধু তোরা, না আরও কেউ ছিল ওখানে ?'

ঢোলগোবিন্দ মনে-মনে হাসে। ওদের পরীক্ষায় এক আর অদ্বিতীয় প্রশ্নটা কিছুতেই ওরা মুখে আনবে না। জিজ্ঞেস করবে না, 'হ্যাঁ রে, তোর ছায়াদি কী করছিল রে ?' টোপের চারপাশে হয় বুড়বুড়ি কাটবে, নয় ঘাই মেরে দূরে পালাবে।

কাজেই ঢোলগোবিন্দ ওদের বুকে জ্বালা ধরাবার জন্যে ইচ্ছে করেই বলবে, 'ছায়াদি আমাকে লজেনচুস দিয়েছে।'

এই মিথ্যুক, লজেন্‌চুস তোকে মাসিমা দিয়েছে না?

চালের মণ আট টাকা উঠেছে।

শোনার পর থেকে বাবার মেজাজ চড়ে গেছে। খুব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাকে বাবা এমন বাক্যযন্ত্রণা দিয়েছেন যে, অভিমানে মা-র গলা দিয়ে আজ ভাত নামে নি।

ঠাকুরদা কোথায় এরকম সময়ে মা-র পক্ষ নিয়ে বড় ছেলেকে কিছু বলবেন, তা নয়। ওঁর তখন বেজায় আঠা গীতায়।

ওঁর আবার এক চ্যালা জুটেছে নতুন। ঠাকুরদা যা বলেন হাঁ করে গেলে। রেকর্ড আপিসে ঘুষখোর কেরানী ছিল। রিটায়ার করে হঠাৎ তার পরলোকের কথা মনে পড়ে গেছে।

সব আমাদের কানে যায়। কেননা একই জোড়াদেওয়া তক্তাপোশে বসে আমাদের পড়তে হয়।

চ্যালা জুটে যাওয়ার পর থেকে ঠাকুরদার ঠাটবাটও বদলে গেছে। গলার পৈতেটা রোজ রগড়ে রগড়ে ধোন। সাবানও লাগান। খুব সম্ভব ঠাকুরদার সেই চ্যালা খুব একটা উচ্চবর্ণের ছিল না। নইলে ঠাকুরদাকে প্রায়ই কেন 'আপনি ব্রাহ্মণের সন্তান', 'আপনি ব্রাহ্মণের সন্তান' বলে খামাখা অত তোল্লা দেবে।

ঠাকুরদা এমন ভাব দেখান যেন কত না সংস্কৃত জানেন। আসলে উনি পড়েন বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত। সেখানে সব শ্লোকেরই বাংলায় মানে দেওয়া আছে।

> "অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা তমবমোয় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চাবিড়ম্বনম্॥ যোং মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্। হিত্বাঽর্চাং ভজতে মৌঢ্যাস্তস্মান্যেব জুহোতি সঃ॥ অহমুচ্চা-চৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে। নৈব তুষ্যেঽর্চিতোঽর্চায়ং ভূতগ্রামা-বমানিনঃ॥ অথ মাং সর্বভূতেযু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্। অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥'

'অর্থাৎ কিনা, ভগবান বলছেন : আমি সব সময় সবার মধ্যে জীবাত্মা হয়ে বিরাজ করছি। সেভাবে না দেখে মানুষ যে আমার পুজো করে, সেটা তার অনর্থক দুর্ভাগ্যমাত্র। আমি তো সর্ব জীবের মধ্যে আত্মা হয়ে, ঈশ্বর হয়ে রয়েছি—তবে আর কেন বোকার মতো ভস্মে ঘি ঢেলে ভজন-পূজন করা ? জীবে যার অভক্তি, সে ভালো-মন্দ জিনিস দিয়ে এই ক'রে সেই ক'রে, হাজার পুজো-অর্চনা করেও আমায় তুষ্ট করতে পারে না। আমি সবার মধ্যে জীবাত্মা হয়ে ঠাঁই নিয়ে আছি। কাজেই বন্ধু-ভাবে সমান চোখে দেখে দিয়ে-থুয়ে সসম্মানে সকলের সেবা করো।

'মনে রেখো, গীতার এটাই হল সার কথা। জীবে প্রেম, পরকে আপন বলে ভাবা, সকলের সেবা করলেই ভগবানের পুজো করা হবে।'

ঢোলগোবিন্দ আর তার দাদা এসব শুনে মনে মনে হাসে।

সবচেয়ে বেশি হাসি পায় ঠাকুরদার চ্যালার গদগদ ভাব দেখে। আহা বেচারা ! যাক, এতদিনে ঠাকুরদা একজন সুবোধ শ্রোতা পেয়েছে।

বেলুড় মঠে দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে মা-বাবার সম্পর্কের তুলাদণ্ডে মা-র পাল্লা একটু ভারী হয়েছে। পুজোর আসনে বসে বাবার চোখ চাওয়া-চাওয়ি থেকে আর মাঝে-মাঝে ইশারায় কথা বলা থেকে বোঝাই যাচ্ছিল এসব জপতপ বাবার বেশিদিন সইবে না।

সেটা আরও বোঝা গেল, যখন পশুপতি দাদুর দোহাই দিয়ে বাবা একদিন বলেই ফেললেন, আসলে মালা জপার চেয়েও বড় কথা হল মনে মনে ঠাকুরকে স্মরণ করা। আপিসে বসে কাজ করতে করতেও তা করা যায়।

শুনে মা চুপ করে রইলেন। কিন্তু মা-র পশুপতি মামা তো আর শুধু নওগাঁর মুনসেফ নন, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মা-র কাছে তিনি হলেন সাক্ষাৎ হাইকোর্ট। পটল মহারাজের দাদা। সেখানে আগেভাগেই বাবা আপিলে জিতে বসে আছেন।

বাবা হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় মা-র পুজোআর্চার মাত্রাটা যেন

বেড়ে গেল। এর পেছনে হয়ত বাবাকে শিক্ষা দেবারও একটা ব্যাপার থেকে থাকতে পারে। তার ওপর শুরু হয়ে গেল প্রতি শুক্রবার মা-র সঙ্কটা। সারাদিন শুকিয়ে থেকে সন্ধেবেলা একটু ফলাহার।

বাবা বেশ ফাঁপরে পড়লেন।

মাও বোধহয় সেটাই চেয়েছিলেন।

মা সেবার কলকাতায় গিয়ে কালীঘাট থেকে কিনে এনেছিলেন পকেট সাইজের একটা বাংলা গীতা আর নরোত্তম দাসের শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম।

মা সুর করে করে পড়েন :

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর
কৃষ্ণচন্দ্র কর দয়া করুণাসাগর ॥
জয় রাধে গোবিন্দ গোপাল গদাধর
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারী।....
শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন।
যশোদা রাখিল নাম যাদু-বাছাধন ॥...

আমাদের বাড়িটাকে গানের বাড়ি বলা হত মাকে হিসেবের মধ্যে না এনে। মা-র গলায় সুর ছিল না বটে, কিন্তু নামকীর্তন করার সময় সুরের ঘাটতিটুকু পুষিয়ে দিত মা-র প্রাণের আবেগ। আবেগের চেয়েও বেশি ছিল কিসের যেন একটা ব্যগ্রতা। সংসারের বজ্র আঁটুনিতে কিছু ফসকা গেরো ছিল মা-র মুঠোর মধ্যে।

'নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার।...
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥'

ঢোলগোবিন্দ এখন বোঝে, একটা কিছুতে হেলান দিতে পারলে চোখ বোঁজাটা সহজ হয়।

নাম ছিল মা-র কাছে এই রকমের ঠেস দেবার একটা জায়গা।

বাবা নিজেকে ধরে রেখে বুদ্ধির রাস্তায় চলতে চান। মা চলেন হৃদয়ের তাড়নায় বিশ্বাসের রাস্তায়।

আর এ-দুইয়ের মাঝখান দিয়ে পা টিপে টিপে চলেন ঠাকুরদা।

ইস্কুলের মাঠ পেরিয়ে পশুপতি দাদুর বাড়ি যাওয়ার রাস্তায় শহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে নওগাঁর টাউন ক্লাব, পাবলিক লাইব্রেরি আর তার পেছনে বাঙালীর চিরন্তন কালীবাড়ি।

বাঙালী কথাটার এখানে বিশেষ একটা তাৎপর্য আছে।

উত্তর বাংলার প্রায় সব নতুন শহরের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা সকলেই বহিরাগত। রাজরাজড়া আর নবাবদের হাত-ধরা হয়ে এসে নিষ্কর জমি-জায়গা হাতিয়ে নিয়ে একদল আগে থেকেই প্রথমে ভূস্বামী এবং পরে জমিদার হয়ে বসেছিল।

আরও পরে তারা হয় গ্রামে গরহাজির খাজনাভোগী শহুরে সম্প্রদায়। পরে তাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের সঙ্গে চলে আসে নানা পেশার আরও বিস্তর লোকজন। কেউ গঙ্গা পেরিয়ে, কেউ পদ্মা পেরিয়ে।

বাঘ-ভালুকের সঙ্গে লড়ে জঙ্গল হাসিল করে তৈরি হয়েছিল এখানে ফসলের ক্ষেত। তারা কোণঠাসা হয়ে বাইরের জোয়ারে চাপা পড়ে আর মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

নওগাঁর বাবুসমাজের মধ্যে গ্রামের সেইসব সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগ ছিল একমাত্র আমার সেজোকাকার। ইস্কুলে পড়ানোর সুবাদে হপ্তার ছ-টা দিন গ্রামেই বাস করত বলে আঞ্চলিক কথ্য ভাষাটাও সেজোকাকা বেশ রপ্ত করে নিয়েছিল। মিশুক স্বভাবের মানুষ আর সেইসঙ্গে গানের গলা ভালো হওয়ায় সেজোকাকা অক্লেশে রাজবংশীদের হেঁসেলে ঢুকে গিয়ে চায়ের জন্য গরম জল আর পানদোক্তা চেয়ে আনতে পারত। গাঁয়ে মাস্টারবাবুদের ছিল সাতখুন মাপ।

পরের মুখের ভাষা নিয়ে হাসাহাসি করাটা আমাদের একটা রোগ। সব জাতেরই অল্পবিস্তর এ রোগ আছে। নওগাঁর বহিরাগতরা ঠোঁট

উলটে যাকে বলত বাহে ভাষা, সেজোকাকার মুখে শুনে ঢোলগোবিন্দ বুঝেছিল কী মিষ্টি সেই ভাষা।

'নিন্দালু-রে, রে-নিন্দালু! এইঠে আইসো। কোঠেকার অ্যাল্যায় বড় নোকের ছোয়া হইসে, বায় রে বায়।'....

'বাপো গেইসে হাট, মাও গেইসে হাট,
মাও আনিবে মোলার নাড়ু, বাপ আনিবে খাট।
ওই খাটত চড়িয়া যাম বিন্দাবনের হাট।
বিন্দাবনের হাটতে নাউ ফলিসে।
নাউর উপর ঢোঁড়া সাপ ফপ্পেয়া উঠিসে।
তুই কোণা পিতলের খুরি ভাসিয়া বেড়াসে।
একনা নিগিল ধরম ঠাকুর, একলা নিগিল টিহা
টিহার বেটি বিহাও হসে নাল খরিখান দিয়া
নাল খরিখান ঘোটোর মোটোর মোদ্দে আঙ্গার ডোর
প্যাট মাঙ্গিটা ফরফরাসে ভাতর নিগা তোর॥'

বড়-রাস্তায় পড়ার আগে টানা একফালি জমিটাতে শীতে ফি বারের মতো এবারও টোল ফেলেছে বেদেরা। বেদেনীদের কী সুন্দর যে দেখতে! কোলে বাচ্চাদের নাকে জল গড়ায়। কাঠকুটো পাতা জড়ো করে রেখেছে। একটু রাত হলে জ্বেলে নিয়ে আগুন পোয়াবে। কোর্ট-কাছারির লোকেরা বাড়ির পথে একটু দাঁড়িয়ে যায়। জরিবুটি বেচে। হাত দেখে। চোখে চোখে কথা হয়। ঘাঘরাগুলো পায়ের কাছে খসর-মসর করে। উড়তে চায়।

বাড়ি গিয়ে গিন্নিদের সবাই সাবধান করে। ঘরে খিল এঁটে রেখো। থালা-বাটি শাড়ি-জামা হুঁশিয়ার।

একদিন দেখা গেল, শুধু কিছু ছাইভস্ম পড়ে। লোকগুলো ভোঁ-ভাঁ। কেবল এর বাড়ি অমুকটা নেই, ওর বাড়ি তমুকটা নেই। চুরি করা নাকি ওদের জাতধর্ম। যুগ যুগ ধরে এটা হয়ে আসছে। লোকের মন থেকে চুরির সে দাগ সহজেই মুছে যায়।

শহরে যে ঢেঁঢরা পড়ে গেছে। রায়সাহেবের বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন।

অ্যাং যায় ব্যাং যায় খলসে বলে আমিও যাই।

আজ্ঞে না। শুধু বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র, শিবের ত্রিশূল, ব্রহ্মার অক্ষ, ইন্দ্রের বজ্র, বরুণের পাশ, যমের দণ্ড, কার্তিকেয়ের শক্তি, দুর্গার অসি। অষ্টবজ্রসম্মেলন যাকে বলে। শহরের বাছা-বাছা লোক। বিশেষ অতিথি বলতে আমি আর দাদা। একমাত্র ছানাপোনা।

মহকুমা হাকিম বলে কথা। তার বাড়ির গেটে সেপাই দাঁড়িয়ে। মাছি গলুক দেখি।

কেন, কী ব্যাপার—কেউ জানে না। কারো ফেয়ারওয়েল নিশ্চয় নয়।

দাদা বলল, দূর বোকা! ফেয়ারওয়েল হলে তো ক্যারিকেচার করতে দাড়িওলা পাঁচুবাবু আসতেন। আর রাজশাহী থেকে ঘোমটা-দেওয়া ক্যামেরা নিয়ে সেই মার্কামারা লোকটা আসত। ফেয়ারওয়েল নয়।

বিরাট বারান্দা ততক্ষণে লোকজনে ভরে গেছে।

টেকো-মাথা সরকারী ডাক্তার। তথৈবচ মুনসেফ মশাই। চোগা-চাপকান-পরা শুষ্কং কাষ্ঠং হেডমাস্টার মশাই। রসিকপুরুষ পশুর ডাক্তার। ছোকরা সার্কেল অফিসার। ব্যাঙ্কের ঘোড়েল ম্যানেজার। পুলিসের বড় দারোগা। স্যুটবুট পরে গাঁজার খেতাল এম-এল-সি। শহরের সব বাঘা-বাঘা উকিলমোক্তার। পাটচাষী কো-অপারেটিভের ম্যানেজার। ইস্কুলের কেষ্টবিষ্টুরা সবাই। সোডাকলের বোকা মালিক। সবাই হুজুরে হাজির।

দাদা চোখের ইশারা করে বলল, ত্যাখ্—

পাটভাঙা সাদা খদ্দরের ধুতি-চাদরে চিত্তকাকা ভিড়ের মধ্যে ঘুরঘুর করছে। একেবারে ভেতরে গিয়ে অরগানে টুং-টাং করে ফিরে আসছে।

চা-পর্বের পর ভেতরের হলঘরে ডাক পড়ল। মেঝেতে ফরাস পাতা।

ঘরের মধ্যে অরগান বা অন্য কোনো বাদ্যযন্ত্র না দেখে সবাই একটু ধাঁধায় পড়ল।

ঘরের একপাশে টেবিলের ওপর কী একটা বাক্সমতন জিনিস। তাতে লাগানো হরেক রকমের বিজলির তার। তারগুলো জানলা গলিয়ে বাইরে চলে গেছে। সেখানে ভটর-ভটর করে চলছে ভাড়া-করা একটা ডায়নামো। বাক্সটার মধ্যে থেকে থেকে জ্বলছে কী সব আলো।

রায়সাহেব ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একজনকে দেখিয়ে বললেন, আমার বড় জামাই। একজন মস্ত ইনজিনিয়র। ও রেডিও শোনাবে। সেই-জন্যেই আজ আপনাদের ডেকেছি।

হঠাৎ ঘর থেকে সমস্ত শব্দ কেউ যেন এক গণ্ডূষে শুষে নিল।

রেডিও? অসম্ভবকে সম্ভব করা সেই বেতার?

ঢোলগোবিন্দর শিরদাঁড়ায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। কাগজে পড়েছে সে। কলকাতা থেকে কাকিমা চিঠিতেও লিখেছে। টেলিফোন-টেলি-গ্রাফের চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার। বিনা তারে এক আজব বাক্সে দূরের শব্দতরঙ্গ ধরা পড়ে।

রায়সাহেবের জামাই জটিল কলকাঠি নেড়ে সমানে সেই চেষ্টাই করে চলেছেন।

গানের মতন একটা আওয়াজ মুহূর্তের জন্যে এসেছিল। হঠাৎ কেউ গলা টিপে ধরায় গোঁ-গোঁ করে যেন মূর্ছা গেল। পরের আওয়াজটা কুকুর-বেড়ালের মতন।

রায়সাহেবের জামাই পরিত্রাহি চেষ্টা করে চলেছেন যন্ত্রটাকে বাগে আনতে। এ-কানে মোচড় দিচ্ছেন, এটা খুলে সেটা লাগাচ্ছেন। কখনও কুঁই-কুঁই, কখনও কড়-কড়-কড়াৎ, কখনও যেন শাঁকচুন্নির ঝগড়া। কিছুতেই আর কিছু হয় না।

আস্তে আস্তে শ্রোতাদের আস্থায় চিড় ধরছে। গোড়ায় ফিসফিস করে, পরে সবাই সরবে নিজেদের মধ্যে গল্প জুড়ে দিয়েছে।

ঘণ্টাখানেক পরে প্রথমে একজন একজন করে, পরে দল বেঁধে লোকে

নানা রকমের ওজর দেখিয়ে উঠে পড়তে লাগল।

যারা স্বাধীন পেশার লোক, যেমন উকিল আর মোক্তার, তারপর ইস্কুল মাস্টার—এরাই আগে খসে। কিন্তু সবচেয়ে দেরিতে ওঠে সোডা-কলের মালিক। লোকটার এত টাকা, তবু সরকারি আমলাদের দেখলে আর জ্ঞান থাকে না। হাত কচলে হেঁ-হেঁ করে আর প্রভুভক্তের মতো ল্যাজ নাড়ে।

উকিলরাও তাই। জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদের পয়লা নম্বরের ধামাধরা।

দেখা গেল, কয়েকজন ধামাধরা মেরুদণ্ডহীন প্রাণী—তার মধ্যে একমাত্র সোডাকলের মালিকটি বাদে, রায়সাহেবের জামাইয়ের ব্যর্থতায় সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে।

যেতে যেতে ঘরের বাইরে থেকে তাদের উচ্চকণ্ঠের আলাপ আর হো-হো হা-হা শুনে ঢোলগোবিন্দ বেশ বুঝতে পারছিল যে, বিজ্ঞান ব্যাপারটাকেই ভুয়ো জিনিস বলে উড়িয়ে দিতে পেরে, হাকিমেরা যে কত মূর্খ তা ওই অপোগণ্ড জামাইটা প্রমাণ করে দিয়েছে বলে, ওরা সবাই মহা খুশি। কাল সারা শহরে ঢি-ঢি পড়ে যাবে। কিছু শিক্ষিত লোক বলবে, রেডিও হল ভূত নামানোর যন্ত্র। প্ল্যানচেটের সঙ্গে তফাত এই যে, এতে নিরক্ষরদেরও ডাকা চলে।

ঢোলগোবিন্দ আর তার দাদাকে মাসিমা না খাইয়ে ছাড়লেন না।

পড়ার ঘরে বসে ছায়াদি-কণাদির সঙ্গে অনেক গল্প হল। ঢোল-গোবিন্দ এই প্রথম বুঝল, দূর থেকে কাউকে ঠিক জানা যায় না। ছায়াদি মানুষটা যে কী ভালো, কাছে এসে তবে সে অনুভব করতে পারল।

চলে আসার সময় গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিল ছায়াদি।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ছায়াদি হঠাৎ ওর একটা হাত ধরে ফেলায় ঢোলগোবিন্দর সারা শরীরে যেন রক্ত নেচে উঠেছিল। ছায়াদি অনেক বড়। বার বার বলেও নিজেকে সেদিন কিছুতেই সে বোঝাতে পারে নি।

ছায়াদি টের পেয়েছিল নিশ্চয়।

গেটের কাছে এসে খুব আস্তে হাত ছেড়ে দিয়ে বলেছিল, 'তুমি অত লাজুক কেন? আবার এসো কিন্তু।'

সেদিন বোধহয় ছিল মা-র সঙ্কটার দিন।

সে সময়ে কোনো বাড়ির বউ রাস্তায় একা বেরত না। গিন্নিবান্নিরাও নয়।

বাড়িতে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো আমি। মা যাবেন কালীবাড়িতে পুজো দিতে।

আমাকেই মা-র সঙ্গে যেতে হয়। মাকে পৌঁছে দিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াই। কিছু করার না থাকলে উঠোনে একা একা লাট্টু ঘোরাই।

ইস্কুলের মাঠে সদ্য নতুন একটা সার্কাসের দল এসেছে। লোকজন লাগিয়ে বিশাল তাঁবু খাটানো হচ্ছে। বাইরে জন্তুজানোয়ারদের বড় বড় খাঁচা।

ছোট ছোট তাঁবুর বাইরের খেলোয়াড়রা খাটিয়ার ওপর বসে। রিং-মাস্টার আর জোকারদের দেখলেই চেনা যায়। ঘুরে ঘুরে ঢোলগোবিন্দ সব দেখে। সিড়িঙ্গে চেহারার মেয়েরা কেউ কেউ বিড়ি টানছে। দেখে ঢোলগোবিন্দর কষ্ট হয়। কিন্তু তার চেয়েও শক্ত হয় মুখ ঘুরিয়ে নিতে। তাকালেই ওদের শরীরের ঢেউগুলো ছেড়ে ওর চোখ নড়তে চায় না।

হঠাৎ চোখে পড়ে মাঠের একধারে বসে আছে হাবলুদা।

ঢোলগোবিন্দ পৌঁছুবার আগেই আরও কয়েকটা ছেলে এসে হাবলুদাকে ঘিরে ধরেছে। ব্যস, শুরু হয়ে গেল কবিতা। আজকেরটা নজরুলের :

> 'বাবুদের তালপুকুরে
> হাবুদের ডাল-কুকুরে
> সে কি, ব্যস, করলে তাড়া—'

হাবুলদা একেবারেই হাতমুখ না নেড়ে, শুধু গলার স্বরের ওঠাপড়ায় এমনভাবে নাটকীয়তা ফুটিয়ে তুলতেন যে, আমরা একবার তাঁকে পেলে আর ছাড়তাম না।

বলতে বলতে একেক সময় হাবলুদার চোখ দুটো স্থির হয়ে দাঁতে দাঁত লেগে যেত। তক্ষুনি শুইয়ে দিয়ে ভিড় সরিয়ে দেওয়া হত। বড়রা এসে আমাদের ধমক দিত। আমরা হতাম অপ্রস্তুতের একশেষ।

হাবলুদার ছিল মৃগী রোগ।

এরপর সেদিন আর আমি দাঁড়াই নি। একছুটে চলে গিয়েছিলাম কালীবাড়ি। সন্ধেও তখন প্রায় হয়ে এসেছে।

গিয়ে দেখি কালীমন্দিরের সামনে কার বাড়ির একজন বউ আছাড়ি-পিছাড়ি হয়ে কাঁদছে। আর বলছে, 'মা, তুমি এত নিষ্ঠুর। কত করে ডাকলাম, তবু আমার ভাইটাকে তুমি বাঁচালে না—'

তার কপালময় লেপটে গেছে সঁাথির সিঁদুর। হাতে শুধু লোহা আর শাঁখা।

আমার মাও কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে চেষ্টা করছে তাকে সান্ত্বনা দিতে।

সেদিন কালীবাড়ি থেকে ফিরতে আমাদের রাত হয়ে গিয়েছিল।

ফেরার পথে মা আমাকে বললেন, "কে জানিস? অনন্তহরি মিত্রর দিদি। কাল রায় বেরিয়েছে ওর ফাঁসি হবে।"

নওগাঁ থেকে একদল ছোকরা কাঁথি গিয়েছিল নুন তৈরি করতে। পুলিসের মারে আধমরা হয়ে যখন তারা ফিরে এল, সারা শহরে প্রচণ্ড উত্তেজনা।

ঢোলগোবিন্দ শুনল, এবার আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় 'সর্বসাধারণের জন্য' বিভাগে সুন্দরমত যে ছোকরাটি ফার্স্ট হয়েছিল সেই তপনদাকে স্ট্রেচারে করে স্টেশন থেকে সোজা বাড়িতে আনতে হয়েছে। পুলিসের কাঁটা-মারা বুটে তার সারা পিঠ নাকি ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

ওই বিভাগে সেও এবার নাম দিয়েছিল। বড়দের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে ঢোলগোবিন্দ সেকেণ্ড হওয়ায় সবাই ধন্য-ধন্য করেছে।

তপনদার একটা ছাপাখানা আছে। উকিলপাড়ায় থাকে। ঢোলগোবিন্দর মনে হল, ফার্স্টের পরেই যখন সেকেণ্ড, তখন এ শহরে সে-ই তপনদার সবচেয়ে কাছের লোক। ফার্স্টের যখন এমন একটা অবস্থা তখন একবার গিয়ে দেখা করে আসাটা সেকেণ্ডের কর্তব্যও বটে।

কিন্তু তপনদাদের বাড়ির গলির মুখটাতেই একদল ছোকরা ঢোলগোবিন্দকে আটকে দিল। ছেলেগুলোকে সে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করায় তারা ওর গলার কলার ধরে সরিয়ে দিল। তার চেয়েও বড় কথা, ভিড়ের মধ্যে কে যেন চেঁচিয়ে বলছিল—অরে চেনস না, ওই যে আবগারি দারোগার পোলা—সরকারি চাকুর্যার ব্যাটা।

ঢোলগোবিন্দর কান গরম হয়ে উঠল। আর তারপরই অপমানে দুঃখে রাগে তার কান্না পেল। সে সরকারি চাকুরের ছেলে—এটাই তার একমাত্র পরিচয় হল?

এক মুহূর্তে ঢোলগোবিন্দর কাছে বিস্বাদ হয়ে গেল এই শহরটা। ভিড় থেকে ঠিকরে সরে যেতে যেতে সে শুনল ফিসফিস করে একজন বলছে—সাবধান, টিকটিকি।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে ঢোলগোবিন্দর হঠাৎ মনে হল আগের নওগাঁ আর নেই।

এতদিন সে দেখেছে, পাতার মধ্যে গুটিসুটি মেরে থেকে হঠাৎ একদিন শুঁয়োপোকা প্রজাপতি হয়ে গেছে। এখন দেখছে উলটো জিনিস। রংচঙে ভারি সুন্দর একটা প্রজাপতি যেন ডিগবাজি খেয়ে কালোকুচ্ছিত শুঁয়োপোকা হয়ে যাচ্ছে।

এ শহরের বন্ধ দরজার তালা খুলে ঢোলগোবিন্দর মা একদিন তাদের বাড়ির বাইরে খোলা আকাশের নিচে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। বাবার জন্যে সে-দরজায় আবার নতুন করে তালা পড়ল।

বাইরেটা হঠাৎ পর হয়ে গিয়ে এক ধাক্কায় ঢোলগোবিন্দকে ঠেলে

ঘরে ঢুকিয়ে দিল। অনেকদিন পর ঘরটাকে তার এমন একটা নিরাপদ বলে মনে হল, যেখানে সে চেষ্টা করবে সেকেণ্ড থেকে ফার্স্ট হতে।

তল্পিতল্পা গুটিয়ে আমরা চলে এসেছি গাঁজাগোলার কোয়ার্টারে।

হোক টিনের ছাদ। স্যাঁতসেঁতে পুরনো বাড়ি। গাঁজাগুদামের বিটকেল গন্ধ।

পাশেই এস-ডি-ওর বাংলো। রায়সাহেব বদলি হয়ে চলে গেছেন। থাকলে ছায়াদিদের সঙ্গে রোজ দুবেলা দেখা হত। মাসিমা ভাঁড়ার খুলে কত কী খাওয়াতেন। ওঁরা গেছেন রানাঘাটে। রান্না নয় রে, পেটুক! রানা।

সামনেটা একেবারে ফাঁকা। হেঁটে অনেকখানি গিয়ে তবে বড় রাস্তা। গাড়ি-ঘোড়া লোকজন ভিড়। বারান্দায় বসলে দেখা যায়। কিন্তু হট্টগোল চিৎকার চেঁচামেচি কানে আসে না।

কোয়ার্টার বলতে একটাই।

বাঁ-পাশে গাঁজাগোলার প্রকাণ্ড গেট। গেটে সেপাই।

বড় রাস্তা ধরে বাঁ-হাতে একটু এগিয়ে গেলে দোকানপাট বাজার। কাছেই সোডাকল। ইস, মেজোকাকার সেই স্টেশনারি দোকানটা যদি থাকত! প্যাকিং বাক্সের ভেতরকার সেই সরু ফিতের মতো কুচি কুচি কাগজ। খড়ে-মোড়া কাঁচের চিমনি। কাপ ডিশ। নতুনের গন্ধ।

ট্রেজারি কাছেই। রাত হলেই থেকে থেকে তার ধার-কাছ থেকে ভেসে আসে 'হুকামদার' আওয়াজ।

নইলে একেবারে চুপচাপ। হাওয়া থাকলে শুধু সারাক্ষণ ঝাউয়ের পাতার হাহাকার।

ভেতরের উঠোন পেরিয়ে খিড়কি। তারপরই নদীতে নেমে গেছে বাঁধানো ঘাট। সেখানে ছলাৎ-ছল ছলাৎ-ছল।

এ বাড়িতে আগে কারা থাকত জানি না। উঠোনে আম আর কাঁঠাল ছাড়া কোনো গাছ নেই। দেয়ালের কলি ফেরানো হয় নি

কতদিন তার ঠিকঠিকানা নেই। মর্চে-পড়া টিনগুলো থেকে থেকে দমকা হাওয়ায় কাতরে ওঠে।

পুরনো পাড়াটার জন্যে মন কেমন করে না তা নয়। কিন্তু অতদূর ঠেঙিয়ে কে যায়?

মন কেমন করে পুকুরটার জন্যে। যখন-তখন ছিপ নিয়ে বসে পড়া যেত। উঁচু পাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়তে কী যে মজা লাগত বলার নয়।

এ বাড়ি নির্জন নিস্তব্ধ। ঝাঁকড়া গাছের জ্বালায় আকাশ দেখার জো নেই। চারদিক ছায়ার চাদর মুড়ি দিয়ে ঝিমিয়ে থাকে।

যে হাতছিপগুলো আনা হয়েছিল, সেগুলো ঘরের কোণে যেমন তেমনি পড়ে রয়েছে। তাতে মাকড়সার জাল পড়েছে। উঠোনে কেঁচোগুলো বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছিপ দিয়ে নদীতে মাছ ধরা যার-তার কর্ম নয়।

বাড়ি প্রায় ফাঁকা। সেজোকাকা রামনগর ইস্কুলে কাজ পেয়েছে। হোস্টেলে থাকে। মেজোকাকা কলকাতায়। জুট আপিসে একটা কাজ জুটেছে। মেজোকাকার কাছে থেকে ছোটকাকা বিদ্যাসাগরে পড়ছে। এক আছেন ঠাকুরদা। সামনের মাঠে টুকুস-টুকুস করে বেড়ান।

দাদার খুব পড়ার চাপ।

চিত্তকাকা মাঝে রানাঘাটে গিয়েছিলেন। কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার মতন কোনো ব্যাপার। চিত্তকাকার মুখটা খুব করুণ দেখায়।

এ বাড়িতে আসবার কথায় মন যে কী নেচে উঠেছিল বলার নয়। নদীর ঠিক ধারে। সারবাঁধা কোয়ার্টার নয়। বাড়ি বলতে একটাই। ভেতরে বড় উঠোন। সামনেটা উদোম ফাঁকা। বড় বড় ঘর। কত গাছগাছালি।

তখন কি ঢোলগোবিন্দ বুঝেছিল যে, লোকের মধ্যে থেকে থেকে তার স্বভাবের বারোটা বেজে গেছে? প্রকৃতির ভাষা না শেখার ফলে

এই ফাঁকার মধ্যে এসে সে এমন বোকা বনে যাবে ?

গোড়ায় চেষ্টা করেছিল নদীর সঙ্গে ভাব করতে। যার কোনো বাঁধন নেই, একটু স্থির হয়ে দুদণ্ড ছায়া বুকে করে নেওয়ারও যার সময় নেই, নিজের ধান্ধায় শশব্যস্ত হয়ে যে কেবল ছুটছে—তার সঙ্গে হয়ত অনেক-দিন ঘর করলে তবে ভাব হয়।

হঠাৎ একদিন জানা গেল, বাবা নাকি শীগগিরই কলকাতায় বদলি হচ্ছেন। বছর ঘুরবার দু-চার মাসের মধ্যেই।

আমরা চলে যাব তার আগে। আমরা বলতে ঠাকুরদা, দাদা, আমি আর লিলি। অ্যানুয়াল পরীক্ষা শেষ করে। যাতে নতুন সেশনের গোড়াতেই আমরা নতুন ইস্কুলে ভর্তি হয়ে যেতে পারি।

মা মাথায় হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিলেন—কাকিমার কাছে কয়েকটা মাস থাকবি। তারপরই তো আমরা এসে পড়ে সবাই একসঙ্গে ব্যারাকের বাড়িতে গিয়ে থাকব।

ধরা গলায় নওগাঁকে বলি : জীবনের পয়লা খেল্ খতম !